বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

রাঙ্গামাটি

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

রাঙ্গামাটি

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সমন্বয়কারী

শিশির কান্তি চাকমা

চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া

সংগ্রাহক

তুষার শুভ্র তালুকদার

বীর কুমার চাকমা

অশোক চাকমা

আনন্দ মিত্র চাকমা

অম্লান চাকমা

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
রাঙ্গামাটি
প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২১/ এপ্রিল ২০১৪

বাএ ৫২২৩

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য : দুইশত আশি টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SONSKRITI GRONTHAMALA : Rangamati (Present state of Folklore in Sherpur District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Sonskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore) Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 280.00. only. US$: 10.00

ISBN-984-07-5232-4

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়।

www.pathagar.com

তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *ময়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *ময়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের

www.pathagar.com

গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

www.pathagar.com

ছ. Milieঁ-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item-যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে “From the perspective of living community and to be specific, functionally”, ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল

www.pathagar.com

বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. **নামকরণের ইতিহাস :** কাহিনি, কিংবদন্তি॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর॥ মৃত্তিকার ধরন॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি)॥ নারী-পুরুষের হার॥ তরুণ ও প্রবীণের হার॥ শিক্ষার হার॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয়॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি)॥ শিল্প-কারখানা॥ ব্যবসা-বাণিজ্য॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি)॥ খাদ্যাভ্যাস॥ পোশাক-পরিচ্ছদ॥ পেশাগত পরিচয়॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ)॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. **বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ :** আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা,

www.pathagar.com

খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোণা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া মানিকগঞ্জ, আটপাড়া নেত্রকোনা), মানিক পির (সাতক্ষীরা), ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর উপজেলা, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোণা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়ে হলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস :** একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি,

www.pathagar.com

পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম :বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), রূপকথা (fairy tale) খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছডি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়ে হলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নিদের্শনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো

www.pathagar.com

পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা এবহৎব চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান রাঙ্গামাটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে রাঙ্গামাটির সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (interoduction of the district) ২৩-৬৬

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. বন ও বনজসম্পদ
ঘ. জলবায়ু ও ভূতত্ত্ব
ঙ. জনবসতির পরিচয়
চ. নদ-নদী, হ্রদ ও জলপ্রপাদ
ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্থান
জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি
ঝ. মুক্তিযুদ্ধ
ঞ. বিখ্যাত গায়ক, সাধক ও খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকসাহিত্য (flok literature/ folk narrative) ৬৭-১২৪

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা
চাকমা লোক কাহিনি
ত্রিপুরা রূপকাহিনি
তঞ্চঙ্গ্যা রূপকাহিনি
মারমা রূপকাহিনি
খিয়াংদের রূপকাহিনি
পাংখোয়াদের রূপকাহিনি
গুর্খাদের রূপকথা ও লোক কাহিনি
খ. কিংবদন্তি
গ. লোকছড়া

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১২৫-১২৮

লোকশিল্প

১. ওগোয়
২. আরি
৩. মেজাঙ
৪. পাক্কোন

www.pathagar.com

৫. হাল্লোং
৬. বারেঙ
৭. হুরুম
৮. হক্কেরেং

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume) ১২৯-১৩৪

চাকমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, তঞ্চঙ্গ্যাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, পাংখোয়াদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খিয়াংদের পোশাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন ধরনের অলংকার

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৩৫-১৩৮

মাটির ঘর, মাটির গুদামঘর, মজাঘর বা মাচাংঘর

লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad) ১৩৯-২২৬

ক. লোকসংগীত
চাকমা বারমাসি
লামাহ্ পালা বারমাস
মা-বাব : বারমাস
কলিযুগ পালাহ্
খ. রাধামন-ধনপুদি পালা

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ২২৭-২৩০

১. বাঁশি
২. ধুদুগ
৩. হেংগরং
৪. জান্দুরা
৫. শিঙা
৬. ঢোল
৭. চুমা
৮. বেলা

লোকউৎসব (folk festival) ২৩১-২৪৬

১. বিঝু, সাংগ্রাই, বিসু, বৈসু
২. রাজ পুন্যাহ্
৩. বিবাহ উৎসব
৪. পাংখোয়াদের অন্যান্য উৎসব

www.pathagar.com

লোকাচার (ritual) ২৪৭-২৭০

১. চাকমাদের কজই পানি লনা (শিশুর জন্মশুদ্ধি ও সামাজিক আচার)
২. মারমা শিশুর জন্মশুদ্ধি ও সামাজিক আচার
৩. তঞ্চঙ্গ্যা শিশুর জন্মশুদ্ধি ও সামাজিক আচার
৪. ত্রিপুরা শিশুর জন্মশুদ্ধি অনুষ্ঠান
৫. খিয়াং শিশুর জন্মশুদ্ধি ও সামাজিক আচার
৬. পাংখোয়া শিশুর জন্মশুদ্ধি ও সামাজিক আচার
৭. ব্যুহচক্র
৮. কঠিন চীবর দান
৯. গাড়ি টানা
১০. অন্যান্য লোকাচার

লোকখাদ্য (folk food) ২৭১-২৭৮

১. চাকমাদের লোকখাদ্য
২. তঞ্চঙ্গ্যাদের লোকখাদ্য
৩. পাংখোয়াদের লোকখাদ্য
৪. খিয়াংদের লোকখাদ্য

লোকনৃত্য (folk dance) ২৭৯-২৮০

১. ত্রিপুরাদের বোতল নৃত্য
২. তঞ্চঙ্গ্যাদের জাদি নৃত্য
৩. ত্রিপুরাদের গড়াইয়া নৃত্য

লোকক্রীড়া (folk games) ২৮১-২৮৬

১. গুদুহারা
২. ইজিবিজি হারা
৩. কভাজাং হারা
৪. পল্লাপল্লি হারা
৫. পুৎপুৎ হারা
৬. বুদ্ধিমান হারা
৭. পত্তি হারা
৮. ঘর চাক বাইর চাক হারা
৯. পোর হারা
১০. ঘিলা হারা
১১. নাদেঙ হারা

পাংখোয়াদের লোকক্রীড়া

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ২৮৭-২৮৮

১. ছুতার
২. তাঁতি (বেইন বা কোমর তাঁত)
৩. জেলে

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ২৮৯-২৯৮

ক. লোকচিকিৎসা
খ. তন্ত্র-মন্ত্র

ধাঁধা (riddle) ২৯৯-৩০২

প্রবাদ-প্রবচন/দাধ'কথা (folk sayings & proverb) ৩০৩-৩১২

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ৩১৩-৩২২

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৩২৩-৩২৬

১. বেইন বা কোমর তাঁত
২. দাবা
৩. শিকারের লোকপ্রযুক্তি
৪. মাছ ধরার লোকপ্রযুক্তি
৫. অন্যান্য লোকপ্রযুক্তি

জুম চাষ (Jhum cultivation) ৩২৭-৩৩২

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে প্রায় এক দশমাংশ জায়গা জুড়ে মূলত রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি এই তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে যে অঞ্চল তার নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। ভিন্ন ভাষা-ভাষী এগারটি আদিবাসী পাহাড়ি জাতিসত্তার পাশাপাশি বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর অনন্য সমাবেশ নিয়ে বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম।

এই তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, প্রাচীন এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত রাঙ্গামাটি আয়তনের দিক থেকে দেশের সর্ববৃহৎ জেলা। এশিয়ার বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ, দেশের একমাত্র ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র ও কর্ণফুলি পেপার মিল এই জেলাকে করেছে আরো সমৃদ্ধ ও বৈশিষ্টমণ্ডিত। অপেক্ষাকৃত দূষণমুক্ত, স্বাস্থ্যকর এই জেলাটি দেশের একমাত্র রিক্সাবিহীন শহর। এই জেলার মধ্যে বাঘাইছড়ি উপজেলা আয়তনে দেশের সর্ববৃহৎ সীমান্তবর্তী উপজেলা যার আয়তন ঢাকা জেলার চেয়েও বড়।

রাঙ্গামাটি সদর : রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার নামকরণ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন দলিল বা প্রমাণাদি পাওয়া যায়না। তবে জনশ্রুতি রয়েছে যে, এখানকার প্রবাহমান ছড়া/ ঝর্নার মাটির রং ঈষৎ লাল হওয়ার এ এলাকার নাম 'রাঙ্গামাটি' (অর্থাৎ রঙিন মাটি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮৩ সালে রাঙ্গামাটি সদর থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা করা হয়।

কাউখালী : কাউখালী উপজেলার নামকরণ নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু জানা না গেলেও প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, অতীতে এলাকার লোকজন অনেক স্থানে কুয়া বা গর্ত খনন করে সেই পানি খাবার এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করত। এ কূয়া বা গর্তেরও স্থানীয় নাম 'কাউ'। শুষ্ক মৌসুমে ঐ কাউ বা কূয়া অনেক সময় পানি শূন্য হয়ে যেত। যার স্থানীয় নাম 'খালি'। পরবর্তীকালে উল্লেখিত কূয়া এবং শূন্য অর্থাৎ স্থানীয় 'কাউ' এবং 'খালি' শব্দের সমন্বয়ে অত্র উপজেলার নামকরণ হয় কাউখালী। কাউখালী ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি জেলার তৃতীয় ক্ষুদ্রতম উপজেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

উপজেলার জনসংখ্যা ৪৯,৩২২ জন। এর মধ্যে ৬০%আদিবাসী ও ৪০% বাঙালি। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা এবং মার্মা (মগ) এ দু-গোত্রই প্রধান। তাছাড়া কিছু সংখ্যক ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যা বসবাস করে। উপজেলার জনগণ প্রধানত কৃষিকাজ, জুম চাষ এবং কাঠ ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে।

www.pathagar.com

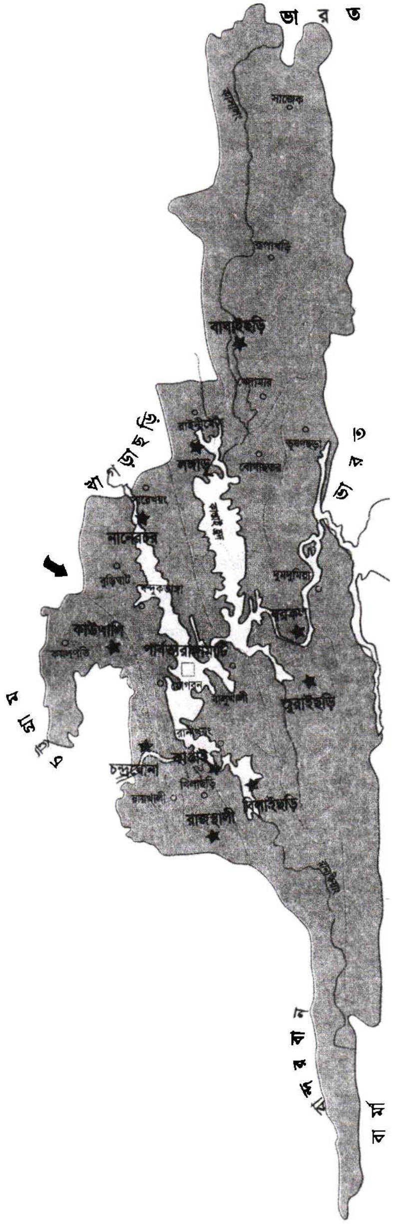

রাঙ্গামাটি জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

বরকল : রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ১০টি থানার মধ্যে প্রাচীনতম থানা বরকল। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯২৩ সালে এটি কর্ণফুলি নদীর তীরে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের সবচেয়ে খরস্রোতা নদী কর্ণফুলির পাড়ে বিস্তৃত ছোট বড় পাহাড়, ঝর্না ও ছোট নদীনালায় ঘেরা এই বরকল থানা। বরকল নামকরণের পেছনে জনশ্রুতি আছে যে, কর্ণফুলি নদীর এই স্থানে একটি খুবই বড় প্রবাহমান ঝর্না ছিল। পানি পড়ার শব্দ অনেকদূর হতে শোনা যেত। আর এই পানি পড়ার শব্দ শুনে মনে হত যেন কোন বড় যন্ত্র বা কলের শব্দ হচ্ছে। যার ফলে এই স্থানে বসবাসকারী পাহাড়ি লোকেরা এই জায়গার নাম দেয় বরকল।

জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য : এ উপজেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা, পাংখো ও তঞ্চঙ্গ্যা উল্লেখযোগ্য। বরকল উপজেলার অধিকাংশ লোকেরাই জুম চাষী। পাহাড়ি লোকজনদের জীবনযাত্রা অতি সাধারণ মানের। সূর্যাস্তের পর পরই সবাই নিজ নিজ ঘরমুখী হয়ে পড়ে। তুলনামূলকভাবে নারীরা খুবই পরিশ্রমী। যার যার পিনোন (পরিধেয়) নিজের হাতেই তৈরি করতে দেখা যায়। পাহাড়ি পথ অসমান উঁচু নিচু থাকায় পায়ে হেঁটে প্রত্যন্ত গ্রামবাসীরা যাতায়াত করেন।

রাজস্থলী : বোমাং রাজা দীর্ঘদিন এ জায়গায় অবস্থান করছিলেন বিধায় মারামাদের কাছে তাদের ভাষায় জায়গাটি মাংকইং নামে পরিচিতি লাভ করে। 'মাং' শব্দের অর্থ রাজা, 'কয়ং' অর্থ সমতল ভূমি। তখনকার মাংকায়ং শব্দকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তর করলে রাজার স্থল হয়। এরপর বর্তমানে শুদ্ধ বাংলায় রাজস্থলী নামে নামকরণ করা হয়।

প্রশাসনিক কাঠামোর দিক থেকে রাঙ্গামাটি জেলার অন্তর্ভুক্ত। আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক প্রতিনিধিত্বের প্রথা অনুযায়ী রাজস্থলী উপজেলা বোমাং সার্কেলের আওতাভুক্ত যার সদর দপ্তর বান্দরবান। ১৮৬০ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম (বর্তমান বান্দরবান রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা চট্টগ্রাম জেলার অবিচ্ছেদ্য প্রশাসনিক নামে এলাকা ছিল। ১৮৬০ সালের ১ আগষ্ট চট্টগ্রাম জেলা সদর থেকে আলাদা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে স্বতন্ত্র জেলা সৃষ্টি করা হয়। আবার ১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বান্দরবান কেন্দ্রিক বোমাং সার্কেল, রাঙ্গামাটি ভিত্তিক চাকমা সার্কেল এবং বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি ভিত্তিক মং সার্কেল নামে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করা হলে রাজস্থলী এলাকাকে বোমাং সার্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিলাইছড়ি : চাকমা আদিবাসীদের ভাষায় 'বিলাই' এর অর্থ বিড়াল আর 'ছড়ি' অর্থ পাহাড় হতে প্রবাহিত ঝর্না বা ছড়া। বিলাইছড়ি নামকরণ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়না। তবে এলাকার বয়োবৃদ্ধদের মতে বহু বছর পূর্বে কিছু পাহাড়ি লোক কাঠ কাটার উদ্দেশ্যে গভীর অরণ্য ঘেরা এ এলাকায় আসে। সেই সময় তারা এক বৃহদাকার বন বিড়ালের মুখোমুখি হয়। বিড়ালের ভাবমূর্তি হিংস্র মনে করে তারা তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করলে বিড়ালটিও তাদের আক্রমণ করে এবং উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি মেরে ফেলা হয়। পরে এ বিরাটকায় পাড়ায় নিয়ে আসা হয়।

www.pathagar.com

পাড়া প্রতিবেশীরা এতবড় বন বিড়াল দেখে অবাক হয় এবং বিরাট সামাজিক অনুষ্ঠান করে। এর পর থেকেই এলাকাটি বিলাইছড়ি নামে আখ্যায়িত হয়।

বিলাইছড়ি উপজেলা একটি দুর্গম পার্বত্য এলাকা অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়, সামান্য সমতল ভূমি এবং বহু পাহাড়ি ঝর্না তথা ছড়া নিয়ে এই উপজেলা গঠিত। এ উপজেলার পশ্চিমে রাজস্থলী ও কাপ্তাই উপজেলা, উত্তরে জুরাছড়ি ও রাঙ্গামাটি সদর, পূর্বে জুরাছড়ি উপজেলা ও ভারতের মিজোরাম, দক্ষিণে বান্দরবনের থানছি ও রোয়াংছড়ি। এই অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ু আদা, আনারস, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, তুলা ইত্যাদি চাষের বেশ উপযোগী। এছাড়াও এখানে, ধান, তিল, তামাক ও রবিশষ্যের চাষও হয়।

বাঘাইছড়ি : বাঘাইছড়ি উপজেলা এলাকা আগে রিজার্ভ ফরেস্ট ছিল। এর অধিকাংশ এলাকা কাচালং ও মাচালং এলাকা নামে পরিচিত। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ এর বাঁধের কাজ শেষ হওয়ার পর রাঙ্গামাটি শহরের আশেপাশের নিচু অংশের এবং রাঙ্গামাটি সদর, বরকল, লংগদু, জুরাছড়ি, নানিয়ারচর এবং কাপ্তাই এ সাতটি এলাকা অধিবাসীবৃন্দকে পাকিস্তান সরকার কাচালং নদীর দুই পার্শ্বে তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাচালং এলাকায় পুনর্বাসিত করে। সে কারণে ১৯৬৩ সালে প্রায় ১০,০০০ চাকমা অধিবাসী ভারতের বিভিন্ন অংশে চলে যায়। বাঘাইছড়ি এলাকার পূর্বে রামগড় মহকুমার দিঘীনালা থানার অধীনে ছিল। অত্র এলাকার অধিবাসীদের পায়ে হেঁটে দিঘীনালা যাওয়া-আসা অনেক কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ হওয়াতে ১৯৬৮ সালের ০৮ আগস্ট রাঙ্গামাটি সদর মহকুমার আওতায় বাঘাইছড়ি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালের ২৪ মার্চ তারিখে এ থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। এ উপজেলার কাচালং এলাকায় গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিল বলে এখানে বাঘের উপদ্রব বেশি ছিল, সাথে এ উপজেলায় বিভিন্ন পাহাড়ি ছড়া থাকায় এর নামকরণ করা হয় বাঘাইছড়ি।

জুরাছড়ি : পাহাড় পরিবেষ্টিত একটি দুর্গম অঞ্চলের নাম জুরাছড়ি। চাকমা ভাষায় 'জুরঅ' অর্থ ঠাণ্ডা, 'ছড়ি' অর্থ ছড়া। উপজেলা সদরের দক্ষিণে শলক নদীর উজানে 'জুরাছড়ি' নামক একটি ছড়া রয়েছে। এ ছড়ার পানি খুবই ঠাণ্ডা। এ 'জুরাছড়ি' ছড়ার নামেই এ উপজেলার নামকরণ হয়েছে জুরাছড়ি। পরবর্তীকালে জুরাছড়ি ইউনিয়নকে ৪টি ইউনিয়নে ভাগ করে ১৯৮৩ সালে মানোন্নীত থানা করা হয়।

লংগদু : লংগদু শব্দটির আভিধানিক কোন অর্থ নেই। তবে উপজেলার এই নামকরণের পেছনে ঐতিহাসিক একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেটি হল এই অঞ্চলে ব্রিটিশ আমলে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করত। তাদের দলপতির নাম ছিল লেংদু। সেই দলপতির নামে অত্র এলাকায় একটি খালের নামকরণ করা হয়। এই খালটি লংগদুর পশ্চিমে কালা পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে পূর্বে কাচালং নদীতে এসে মিলেছে। ধারণা করা হয় ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের সেই গোষ্ঠী প্রধানের নামনুসারে এলাকার নাম লেংদু> লাংগাড়> লংগদু করা হয়েছে।

www.pathagar.com

১৮৬০ সালে ঘোষিত হওয়ার পর পার্বত্য এলাকায় আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য ১৮৬১ সালে সর্বপ্রথম যে কয়টি থানা গঠিত হয় তারমধ্যে লংগদু অন্যতম। লংগদু থানা পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর উপজেলায় উন্নীত হয়।

নানিয়ারচর : জানা যায় ১৯২১ সালের পুর্বে নানিয়ারচর নামের উচ্চারণ ছিল নান্যাচার। মূলত এটি চেঙ্গী নদীর দ্বীপকন্যা নামে খ্যাত ছিল। এই চর এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে বাস করত হান্যা নামে এক ব্যক্তি। তারই নামানুসারে জায়গাটির নাম হয় হান্যাচর। কালক্রমে নান্যাচর নামটি সবার মুখে স্থান পায়। কিন্তু স্বাধীনতার কয়েক বছর পর নান্যাচর নামটি প্রশাসনিকভাবে পরিবর্তন হয়ে নানিয়ারচরে রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৫ সালে এটি উপজেলায় উন্নতি হয়।

কাপ্তাই হ্রদ বেষ্টিত ছোট বড় সারিসারি পাহাড়, ঘন অরণ্যরাজি সবুজ চাদরে ঢাকা পার্বত্য দুহিতা নানিয়ারচর। পাহাড় হ্রদেও জলরাশির এক লুকোচুরির অপরূপ সৌন্দর্যের আভা মেলে এখানকার প্রতিটি পরতে পরতে। মুখর পাখির কুজনে এখানে ভোর হয়। সূর্য ওঠে। নীড়ে ফেরা পাখির কলকাকলিতে সূর্য চলে যায় পাহাড়ের অপর দিগন্তে। এ সবকিছুকে সমৃদ্ধ করেছে এখানকার সহজ সরল পাহাড়ি জনগণ। পূর্ব হতে এখানে বাস করে আসছে চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা আদিবাসী জনগোষ্ঠী। বিভিন্ন জাতিসত্তার সমন্বয়ে আপন স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত এ নানিয়ারচর। চেঙ্গী নদী বিধৌত এ পাহাড় কন্যা সীমাহীন সুখে নূপুরের নিক্কন ছড়ায়। প্রকৃতির অপার দাক্ষিণ্যে জুম, ফল, কাঠ ও বাঁশ উৎপাদন করে এখানকার মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

জানামতে, ব্রিটিশ আমল হতে এ নানিয়ারচর জুম্ম জাতির আদি নিবাস। এক সময় পাহাড়ে হিংস্র বন্য জন্তুর সাথে লড়াই করে দিন কেটেছে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের। কালক্রমে এখানে এসেছে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান। দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে ভিন্নতার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এ বৈচিত্রপূর্ণ জীবনযাত্রা।

কাপ্তাই : কাপ্তাই উপজেলার নামকরণের উৎস সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া না গেলেও কারো কারো অনুমান 'কথয় খিয়ং' শব্দ থেকে কাপ্তাই নামের উৎপত্তি। এটি মার্মা শব্দ 'কথয়' শব্দের অর্থ 'কোমর'। 'খিয়ং' শব্দের অর্থ 'খাল'। জনশ্রুতি আছে যে, বর্তমানে কাপ্তাই খাল নামে পরিচিত খালটিকে স্থানীয়ভাবে কথয় খিয়ং নামে বলা হতো। খালে কোমর সমান পানি থাকতো বলে স্থানীয়রা এর নাম দিয়েছিল 'কথয় খিয়ং'। কালের পরিক্রমায় এই কথয় শব্দটি রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হয়ে কাপ্তাই রূপ ধারণ করেছে।

নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কাপ্তাই। সবুজ বনানী, সুউচ্চ পর্বতমালা বেষ্টিত প্রকৃতির এ মনোরম এলাকার মাঝখানে বয়ে গেছে কর্ণফুলি নদী "শান্ত, স্ফীত অথচ কল্লোলময়ী" যার রূপ। লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে এ নদী প্রবাহিত হয়ে মিলে গেছে বঙ্গোপসাগরে।

www.pathagar.com

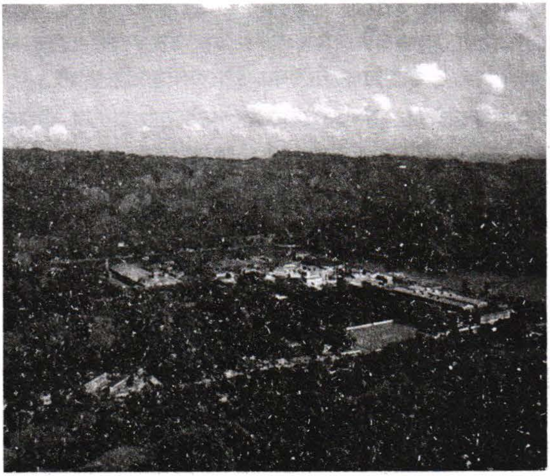

কর্ণফুলী পেপার মিল

পর্যটনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এ অঞ্চলটি। সকল শ্রেণির মানুষকে এর রূপ সুষমায় মুগ্ধ করেছে; অনুপম গর্বে ভরে উঠেছে ২৭৩ বর্গ কি.মি. এলাকার প্রায় ৭০ হাজার মানুষের হৃদয়। চন্দ্রঘোনা, রাইখারী, চিৎমরম, কাপ্তাই ও ওয়াগ্‌পা ইউনিয়ন নিয়ে এর বিস্তৃতি। মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, খিয়াং, পাংখোয়া প্রভৃতি আদিবাসীর নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এতদঞ্চলের জনজীবন গড়ে উঠেছে। সে সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজের দায়িত্ব নিয়ে আগত বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের সাথে একাত্মতা চলমান জনজীবনকে করে তুলেছে কর্মমুখর।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

রাঙ্গামাটি এক বিশাল ভূ-খণ্ড যা উঁচু নিচু পর্বতশ্রেণি পরিবেষ্টিত। পাহাড়গুলি সংকীর্ণ উপত্যকায় ভরপুর। কিছুবা বনরাজী, কিছুবা হামগুরি দিয়ে বেয়ে ওঠা লতায় আকীর্ণ। এক বুক চিরে চলেছে চিরযৌবনা কর্ণফুলি আর স্বচ্ছ নীল হ্রদের জল,এই হচ্ছে রাঙ্গামাটি। রাঙ্গামাটি জেলা ২১°২৫° থেকে ২৩°৪৫° উত্তর অক্ষাংশ ও ৯১°৪৫° থেকে ৯২°৫২° পূর্ব- দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। রাঙ্গামাটিতে উত্তর ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম দক্ষিণে বান্দরবান পূর্বে মিজোরাম ও পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি। পর্বতমালা চারটির প্রধান পর্বতমালা রাঙ্গামাটি জেলাকে বেষ্টন করে আছে। উত্তরের অংশে উত্তর-দক্ষিণ মুখী হাজার ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পাহাড়গুলি এই শ্রেণিতে পড়ে। পশ্চিমে ফুরামোন পর্বতমালা (সর্বোচ্চ ১৫১৮ ফুট)। এই পর্বতমালা দক্ষিণ-পূর্ব রামগড় পর্বতমালার অনুবৃত্তিক্রম। পূর্বে দোলা ঝিড়ি যা বেশ কিছু জলপ্রপাত সমৃদ্ধ। সর্ব উত্তরে মাইনী উপত্যকা (ভূয়াছড়ি রেঞ্জ উচ্চতা ২০০৩ ফুট)। আরো উত্তরে বরকল রেঞ্জ পর্যন্ত এই পর্বতমালা বিস্তৃত। বরকল রেঞ্জটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা কর্ণফুলি নদীতে মিশে গেছে অন্য শাখাটি ভারতের মিজো- হিলে মিশেছে।

www.pathagar.com

রাঙ্গামাটি সদরের ভৌগোলিক অবস্থান : রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা ২২°৩০° অক্ষাংশ হতে ২২°৪৯° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০°০৪° হতে ৯২°২২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ৫৪৬.৪৯ বর্গ কি. মি. বা ১,৩৪,৯৩৬ একর। উপজেলার মোট আয়তনের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে কাপ্তাই হ্রদের অবস্থান। উপজেলার উত্তরে নানিয়ারচর ও লংগদু উপজেলা, পূর্বে বরকল ও জুড়াছড়ি উপজেলা, দক্ষিণে কাপ্তাই ও বিলাইছড়ি উপজেলা এবং পশ্চিমে কাপ্তাই ও কাউখালী উপজেলা।

কাউখালীর ভৌগোলিক অবস্থান : কাউখালী উপজেলাটি ২২°২৯° হতে ২২° ৪৪° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯১°৫৬° হতে ৯২°০৮° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। কাউখালী উপজেলার উত্তরে নানিয়ারচর উপজেলা ও খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা, পূর্বে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, দক্ষিণে ও পশ্চিমে যথাক্রমে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া ও রাউজান উপজেলা।

বরকলের ভৌগোলিক অবস্থান : বরকল উপজেলা ২২° ৩৯° হতে ২৩°১৪° অক্ষাংশে এবং ৯২°১১° হতে ৯২°২৯° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ উপজেলার উত্তরে বাঘাইছড়ি, দক্ষিণে জুরাছড়ি, পশ্চিমে লংগদু ও রাঙ্গামাটি সদর এবং পূর্বে ভারত। এখানকার ভূমি উচ্চভূমি, তথা পাহাড়ি ভূমি এবং নিম্নভূমি তথা জলাভূমি। নিম্নভূমি কাপ্তাই হ্রদেও জলরাশি দ্বারা নিমজ্জিত। এখানে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় ছড়া। ছড়ার নাম অনুসারে বিভিন্ন স্থানের নামকরণ করেছে স্থানীয় পাহাড়ি লোকজন। উদাহরণ স্বরূপ– বরকলের বান্দরছড়ি, তুনদুরুংছড়া, পুরিহাট ছড়া, আগারছড়া, জীবনছড়া, উজ্জাংছড়ি, মরা উজ্জাংছড়ি, ডাইনের উজ্জাংছড়ি, গরগরিছড়ি। তদ্রুপ শুভলং- এ মিতিংগাছড়ি, মাইচছড়ি, হাজাছড়া, বরুনাছড়ি, দীঘলছড়ি ইত্যাদি। বরকলের পাহাড়গুলি বেশিরভাগ বেলে পাথরে গঠিত। উপরে মাটির স্তর থাকলেও ভিতরে পাথরের স্তর সারি সারি সাজানো। রাঙ্গামাটি জেলার বড় বড় পাহাড়গুলো এ অঞ্চলে অবস্থিত।

রাঙ্গামাটি সদর হতে বরকল উপজেলায় কোন সড়ক যোগাযোগ নেই। কাপ্তাই বাঁধ প্রতিষ্ঠার পূর্বে কর্ণফুলি নদীর আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে পথই ছিল একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম। কাপ্তাই বাঁধ তৈরির ফলে জল পথের এই যোগাযোগ আরও সুগম হয়েছে। জনগণ লঞ্চ ও নৌকায় চলাচল করে। এ উপজেলায় তেমন কোন পাকা রাস্তা তৈরি না হওয়ায় এখানে অধিকাংশ স্থানে যাতায়াতের জন্য জলপথ ব্যতীত কোন বিকল্প নেই। এছাড়া এই উপজেলায় এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা নেই। তবে ইদানিং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এ উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য যাচাই করছে।

রাজস্থলীর ভৌগোলিক অবস্থান : রাজস্থলী উপজেলা রাঙ্গামাটির দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এর সীমানা উত্তরে কাপ্তাই, পূর্বে বিলাইছড়ি, দক্ষিণে বান্দরবান সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলা। এ উপজেলা ২২°১৭° থেকে ২২°২৬° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°০৬° থেকে ৯২° ২ ° পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ছোট-বড়-নিচু অসংখ্য পাহাড় ও পর্বত এবং সামান্য কিছু পর্বত পাদদেশীয় পললভূমি নিয়ে গড়ে উঠেছে দুর্গম পার্বত্য উপজেলা রাজস্থলী। ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে রাজস্থলী উপজেলাকে প্রধানত দু'টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) পাহাড়ি অঞ্চল

www.pathagar.com

(খ) পাহাড়তলীর পললভূমি। উপজেলার মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৮৭.১ ভাগ তথা ১০,৯৩৫ হেক্টর জমি পাহাড়ভূমির পললভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

বিলাইছড়ির ভৌগোলিক অবস্থান : বিলাইছড়ি উপজেলা একটি দুর্গম পার্বত্য এলাকা। অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়, সামান্য সমতল ভূমি এবং বহু পাহাড়ি ঝর্না তথা ছড়া নিয়ে এই উপজেলা গঠিত। এ উপজেলার পশ্চিমে জুরাছড়ি উপজেলা ও ভারতের মিজোরাম, দক্ষিণে বান্দরবানের থানচি এবং রোয়াংছড়ি। এই অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ু আদা, আনারস, কাঠাল, কলা, পেঁপে, তুলা ইত্যাদি চাষের বেশ উপযোগী। এছাড়াও এখানে ধান, তিল, তামাক এবং রবিশষ্যের চাষও হয়।

বাঘাইছড়ির ভৌগোলিক অবস্থান : বাঘাইছড়ি উপজেলা বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণাংশের সর্ব উত্তরে সীমান্তবর্তী একটি উপজেলা। জেলা সদর হতে এর দূরত্ব ১৪৬ কিলোমিটার। এটি আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ উপজেলা। যার আয়তন ৭০৩ বর্গমাইল। এ উপজেলার উত্তরে ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য, পশ্চিমে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলা, দক্ষিণে রাঙ্গামাটির লংগদু উপজেলা। এর ০৬ টি ইউনিয়ন এলাকা উপত্যকা তথা সমতল, বাকি ৬০০ বর্গমাইলের সাজেক ইউনিয়নন উঁচু পাহাড় তথা সাজেক ভ্যালি নামে পরিচিত। সাজেক ভ্যালি এলাকায় বেশির ভাগ মানুষ জুম চাষীরা বাস করে। পূর্বে জেলা সদরের সাথে নৌপথই ছিল একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। বর্তমানে বাঘাইছড়ি- দিঘীনালা সড়ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সড়ক পথেও যোগাযোগ করা যায়। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ৩০ কি. মি, পাকা রাস্তা, ২০০ কি. মি, আধা পাকা রাস্তা। বর্তমানে বাঘাইছড়ি থেকে সাজেক পর্যন্ত সড়ক এবং অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। এটিকে পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এই দুর্গম এলাকার চিত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

জুরাছড়ির ভৌগোলিক অবস্থান : এ উপজেলার উত্তরে বরকল উপজেলা, দক্ষিণে বিলাইছড়ি উপজেলা, পশ্চিমে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা এবং পূর্বে ভারতের মিজোরাম। এই দুর্গম উপজেলায় জানুয়ারি হতে জুলাই মাস পর্যন্ত নৌ যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকে। তখন ব্যাপক এলাকা পানির নিচ থেকে জেগে ওঠে, তাতে জনগণ চাষাবাদ করে। আবার আগস্ট হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত কাপ্তাই হ্রদের পানি পরিপূর্ণ থাকায় জুরাছড়ি উপজেলার সাথে সদরের পুনঃ নৌ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। জুরাছড়ি সদর হতে মৈদং ও দুমদুম্যা ইউনিয়নের পাহাড়ি পথে যাতায়াতে কয়েকদিন সময় লাগে। যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম পায়ে হাঁটা পাহাড়ি পথ। জানুয়ারি হতে জুলাই মাস পর্যন্ত জুরাছড়ি থেকে রাঙ্গামাটি সদরে যাতায়াতে ৫৭ কি. মি, পথ অতিক্রমে নৌযান ছাড়াও পায়ে হেঁটে ৮/৯ কি. মি, পাহাড়ি পথ অতিক্রম করতে হয়।

লংগদুর ভৌগোলিক অবস্থান : ৩৬৮.৪০ বর্গ কি. মি, আয়তন বিশিষ্ট লংগদু উপজেলা রাঙ্গামাটি জেলা সদর থেকে ৭৬ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত। যার উত্তরে বাঘাইছড়ি এবং খাগড়াছড়ির দিঘীনালা, দক্ষিণে রাঙ্গামাটি সদর, পূর্বে বরকল এবং পশ্চিমে নানিয়ারচর ও খাগড়াছড়ির মহালছড়ি। উপজেলার অবস্থান। ১৯৬০ সালে

www.pathagar.com

কাপ্তাই হাইড্রোলিক প্রজেক্ট চালু হওয়ার পর উপজেলার বিশাল এলাকা জলমগ্ন হয়ে হ্রদে পরিণত হয়।

নানিয়ারচরের ভৌগোলিক অবস্থান : রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদর থেকে প্রায় ৪৫ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত এই নানিয়ারচর উপজেলা। এর আয়তন ৩২৯.৯৮ বর্গ কিলোমিটার। নানিয়ারচর উপজেলার উত্তরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়ি উপজেলা, দক্ষিণে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, পূর্বে লংগদু উপজেলা, পশ্চিমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা অবস্থিত।

কাপ্তাইয়ের ভৌগোলিক অবস্থান : রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার দক্ষিণ অংশে জেলা সদর থেকে ৩৫ কি. মি. দূরে কাপ্তাই উপজেলার অবস্থান। এর আয়তন ২৭৩.২৫ বর্গ কিলোমিটার। এই উপজেলার পূর্বে বিলাইছড়ি উপজেলা, পশ্চিমে রাঙ্গুনীয়া, উত্তরে কাউখালী উপজেলা ও রাঙ্গামাটি সদর, দক্ষিণে রাজস্থলী উপজেলা। এই উপজেলার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে খরস্রোতা লুসাই কন্যা কর্ণফুলি নদী। এই কর্ণফুলি নদীর মাঝখানে বাঁধ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র। উপজেলার জনগণ প্রধানত কৃষিকাজ, জুম চাষ এবং কাঠ ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে।

গ. বন ও বনজ সম্পদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস বেশি দিনের নয়। মাত্র দেড়শ বছর আগেও এ বনাঞ্চলের কোন সরকারী ব্যবস্থাপনা ছিল না। যথাস্থলে বন ছিল, ছিল বনজ সম্পদও। কিন্তু ছিলনা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা নামীয় ভৌগোলিক সীমানায় পরিচিতি স্বকীয় অবস্থান। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা দৃষ্টির দু'বছর পরে ১৮৬২ সালে বনজদ্রব্য হতে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে বনজ দ্রব্য পরিবহনের প্রধান প্রধান নদীপথে টোল স্টেশন স্থাপিত হয়। এভাবে শুরু হয় বন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া। এরপর ১৮৬৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন এলাকায় দায়িত্বে একজন সহকারী বন সংরক্ষক নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

১৮৭১ সালের এক ফেব্রুয়ারিতে ১৮৬৫ সালের VII নং আইনের ধারা মোতাবেক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন সৃষ্ট তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্গমাইল ভূমির মধ্যে ৫,৬৭০.০ বর্গমাইল ভূমিই সরকারী বন হিসেবে ঘোষিত হয়। ঐ বছরই মায়ানমার (বার্মা) হতে সেগুন বীজ আনয়ন করে কাপ্তাইস্থ সীতা পাহাড় এলাকায় প্রথম সেগুন বাগান সৃজন করা হয়। ঐসময় পদাধিকার বলে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকার বলে বন সংরক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন।

কাচালং সংরক্ষিত বন : এটা পার্বত্য চট্টগ্রামেরর সর্ব বৃহৎ সংরক্ষিত বন এলাকা। পুরাতন কাচালং এবং মাইনী নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকা জুড়ে এর বিস্তৃতি। নদীর প্রধান দুই শাখা শিলক ও গঙ্গারাম। এই সংরক্ষিত বনের দক্ষিণাংশ এবং মাইনীমুখ সংরক্ষিত বন কাপ্তাই বাঁধ সৃষ্টির কারণে ডুবে যায়। এছাড়া এই বাঁধ সৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনে বসতি স্থাপনের জন্য ৪৬,৪৭৬.০ একর সংরক্ষিত বনাঞ্চল

www.pathagar.com

উন্মুক্ত (Dereserved) করার কারণে বিশাল বন এলাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পুনর্বাসিতদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই রিজার্ভ এলাকার মূল আয়তন ছিল ৪,৪০,৩১৬.৮০ একর। বর্তমানে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৩,৯৩,৮৪০. ৮ একরে। এই বনে বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে 'গেমস স্যাংকচুয়ারী' অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৯৪,৫০৫.২০ একর।

রাইংখিয়াং সংরক্ষিত বন : রাইংখিয়াং নদীর উৎপত্তিস্থল (Head Water) বিশাল উপত্যকা জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই সংরক্ষিত বনের অবস্থান। দক্ষিণাংশে ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাওয়া রাইংখিয়াং উপত্যকা বেশ দীর্ঘ। থেগা নদীর বাম তীর এবং শুভলং অববাহিকা এই সংরক্ষিত বনের অংশ বিশেষ। এই বন পূর্ব-উত্তরে নাইচলথুম পাহাড়ের খাঁড়া প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত এবং এর পূর্ব প্রান্তে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানায় লুসাই পাহাড়। দক্ষিণ প্রান্তে মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ। এর আয়তন প্রায় ১,৮৮,৫৩৭. ৬০ একর।

সীতাপাহাড় সংরক্ষিত বন : সীতাপাহাড় সংরক্ষিত বন কাপ্তাই বাঁধের নিচে কর্ণফুলি নদীর দুই পাড় দিয়ে বিস্তৃত। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির কারণে বনের প্রধান এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিনষ্ট হয়েছে। এখানে উপমহাদেশের শতাব্দী প্রাচীন কৃত্রিম বন সৃজিত হয়েছিল। সমৃদ্ধি ছিল সেগুনসহ প্রাকৃতিক বনে। এর আয়তন ২২.৬৮ বর্গমাইল। কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০০ একর বাগান এলাকা উন্মুক্ত করা হয়েছে। বিশাল এলাকা জুড়ে এই কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প গ্রাস করেছে বনভূমি আর বিনষ্ট হয়েছে বিপুল পরিমাণ বৃক্ষরাজি।

বরকল সংরক্ষিত বনাঞ্চল : বরকল এলাকার কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে সু-উচ্চ একটি পাহাড় জুড়ে ক্ষুদ্র পরিসরে এই বনের অবস্থান। এ বন পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বনবিভাগের এবং এর আয়তন প্রায় ৫৮২.৪০ একর।

বনের প্রকৃতি ও প্রজাতি : পার্বত্য চট্টগ্রামের বন উষ্ণমণ্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন হিসেবে বিজ্ঞানীদের নিকট পরিচিত। বন বিজ্ঞানীদের মতে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই বন প্রধানত উষ্ণমণ্ডলীয় চিরহরিৎ এবং প্রায় চির হরিৎ শ্রেণিভুক্ত। বনে বৃক্ষ প্রজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গর্জন, সিভিট, চন্দুল, চম্পা।

বিজ্ঞান ভিত্তিক বিন্যাসে এতদাঞ্চলের বনকে নিম্নোক্ত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. চিরহরিৎ বন (Evergreen Forest) : এ বনকে আবার দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

১. উষ্ণমণ্ডলীয় চিরহরিৎ বন (Tropical Wet Evergreen Forest) : এ বনে পর্যাপ্ত প্রধান প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি- চাপালিশ, চন্দুল, তেলসুর, নারিকেলি ইত্যাদি।

২. উষ্ণমণ্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন (Tropical Mixed Evergreen Forest) : বৃক্ষ প্রজাতি-গর্জন, সিভিট, চন্দুল, নারিকেলি, তালি, পিটরাজ, শিমুল, তুন, ভাদি, জারুল ইত্যাদি।

www.pathagar.com

খ. পত্রমোচী বন (Deciduous Forest) :

১. উষ্ণমণ্ডলীয় আর্দ্র পত্র মোচী বিধৌত বন (Tropical Moist Deciduous Reverine Forest) : প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি - কদম, পিটালী, শিমুল, বান্দরহোলা।

২. উন্মুক্ত পত্র মোচী বন (Open Decidous Forest) : প্রধান বৃক্ষের প্রজাতি- করই, পিটালী, চিকরাশি, তুন, আমড়া, আমলকি ইত্যাদি।

গ. বাঁশ বন (Bamboo Brakes) : প্রজাতি হিসেবে মুলি , মিতিঙ্গা, ডলু, ওড়া প্রধান বাঁশ। কালিছরি, কালি/ বাজালি প্রজাতির বাঁশও বনে পাওয়া যায়।

ঘ. ছনখোলা ও খাগড়ার জঙ্গল (Savanah) : মূলত শন ঘাস (গড় উচ্চতা ৪ ইঞ্চি এর নিচে) নিয়ে গঠিত এই বনে কদাচিত বিক্ষিপ্ত অবস্থানে কিছু পত্র ঝরা কম উচ্চতার বৃক্ষ দেখা যায়।

বন্যপ্রাণী : পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তৃত বনাঞ্চলকে একসময় বন্যপ্রাণীর দ্বিতীয় বৃহত্তর আধার হিসেবে বিবেচনা করা হত। ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ ছিল এ বনাঞ্চল। অতীতের এক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, এ বনভূমিতে প্রায় ৭৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ১০০ প্রজাতির পাখি, ৭ প্রজাতির উভচর প্রাণী ও ২৫ প্রজাতির সরীসৃপের অবস্থান ছিল। এতদঞ্চলে এক সময় ব্যাপকহারে বন্যপ্রাণী শিকার করা হত। যার কারণে এ বনাঞ্চলের হাতি, হরিণ, সাম্বার, বানর, হাতি বন্য শুকর, বন ছাগল, নানান প্রজাতির পাখির সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেয়েছে।

ঘ. জলবায়ু ও ভূতত্ত্ব

জলবায়ু : রাঙ্গামাটির জলবায়ু উষ্ণ ও আদ্র যা আদর্শগতভাবে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে প্রধানত তিনটি মৌসুম জোরালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুমে সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শতকরা ৯০ ভাগ বর্ষণ এ সময় হয়। শীতকালে নভেম্বর মাসে আরম্ভ হয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল, কখনও কখনও সামান্য বৃষ্টি হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক- বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুব কমই থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কাল বৈশাখী' বলা হয়। এ সময় কিছু শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে। তবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তথা ঋতু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের কারণে সারা দেশের ন্যায় রাঙ্গামাটি জেলা তথা বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে এই চিরাচরিত নিয়মের ব্যত্যয় ইদানিং হরহামেশাই ঘটছে। তাপমাত্রার উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এখানে নিম্নতম তাপমাত্রা ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে পরিলক্ষিত হয়, যার গড় প্রায় ২০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চরম উষ্ণ তাপমাত্রা এপ্রিল মাসে ৩৬.৬ ডিগ্রি এবং চরম শতিল তাপমাত্রা জানুয়ারি মাসে ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। বৃষ্টিপাতের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শীতকালে গড় বৃষ্টিপাত ৮৬ মিলিমিটার যা ঐ সময়ের

www.pathagar.com

বাষ্পীভবনের বনভূমি ও গাছপালা পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। দীর্ঘ মেয়াদী পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বৎসরের শীত মৌসুমে দুই মাস প্রায় শুষ্ক থাকে। আবার বর্ষার মৌসুমে কোন কোন মাসে মাত্রাধিক বৃষ্টিপাত হয়।

ভূতত্ত্ব : রাঙ্গামাটি অঞ্চলটি একটি এ্যান্টিক্লাইরাল রীজের সমান্তরাল সমাহার যা মোটামুটি উত্তর-পশ্চিম- দক্ষিণ- পূর্ব নির্দেশ করে। শিলা স্তরগুলি বেশির ভাগই ধীর বেলে পাথর, বেলের শেল ও শুধু শেল যা টারশিয়ারী যুগের। এই স্তরগুলি তাঁজ, চ্যুতি জয়েন্টসহ অন্যান্য ভূ-তাত্ত্বিক চিহ্ন বিশিষ্ট রীজ ক্রেষ্টগুলি ১০০০-৩০০০ উচ্চতা বিশিষ্ট (৩০০০-১০০০ মিটার এমএসএল)। মূল রীজুগুলির মাঝখানের সিরক্লাইন (বা ট্রাফ) গুলি আনুপাতিক হারে নিচু যা ৮০০ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত। নদী এবং উপনদীর বিন্যাসগুলি মূলত ইনট্রিকেট। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলের মত রাঙ্গামাটি পর্যন্ত পর্বত শ্রেণির 'আরকান ইয়ামোর' বর্ধিত রূপ।

ঙ. জনবসতির পরিচয়

চাকমা

চাকমা পরিচিতি : পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী চাকমা জনগোষ্ঠী তিন পার্বত্য জেলাতে কম বেশি বসবাস করে। তিন পার্বত্য জেলায় এই জনগোষ্ঠী পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় সংখ্যা গরিষ্ঠতার শীর্ষে অবস্থান করছে। আদিবাসী চাকমারা মঙ্গোলীয় জাতিভুক্ত একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। একজন চাকমা নিজকে চাঙমা হিসেবে পরিচয় দেন। ইতিহাসে চাকমাদের 'চাকোমা' নামে আরও একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

মূলত (এক) জন্মগতভাবে যিনি চাকমা তথা চাকমা পরিবারে ও সমাজে জন্মগ্রহণকারী, (দুই) পিতা চাকমা জনগোষ্ঠীর সদস্য, (তিন) চাকমা পিতা-মাতার অবৈধ সন্তানও চাকমা বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা : নিজেকে চাকমা হিসেবে পরিচয় দান করে, এরূপ একজন চাকমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করলে সেই ব্যক্তি চাকমা পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করেন। অর্থাৎ একজন চাকমাকে চাকমা নামে পরিচিত হতে হলে কোনো চাকমা জাতিসত্ত্বার কোনো একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তবে তার মাতাকে চাকমা নারী হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

চাকমা নামের উৎপত্তি : একজন চাকমা নিজেকে চাঙমা হিসেবে পরিচয় দেন। ইতিহাসে চাকমাদের 'চাকোমা' নামে আরও একটি পরিচয় পাওয়া যায়। আবার চট্টগ্রাম জেলার লোকেরা চাকমাদের নাম চাম্মা, চাম্মোয়া উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু চাকমারা অতীতে কখনও নিজেদেরকে চাকমা হিসেবে পরিচয় দিতেন না। চাঙমা হিসেবেই পরিচয় দিতেন। চাঙমা নাম'কে চাকোমা, চাম্মোয়া ইত্যাদি বিকৃত রূপকে শুদ্ধ করে পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় চাকমা নাম বা শব্দের উদ্ভব হয়েছে। নথিপত্রেও চাঙমা নাম'কে 'চাকমা' এরূপ লেখা শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত চাকমা নামটাই ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। আর আজ তাই চাঙমারা চূড়ান্ত পরিচয়ে চাকমা।

www.pathagar.com

চাকমা জনগোষ্ঠি

ভাষা ও বর্ণমালা : চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। চাকমা ভাষাতেই চাকমাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। কিন্তু স্কুল পর্যায়ে চাকমা ভাষায় পড়ানোর কোনো সুযোগ না থাকায় চাকমা বর্ণমালায় ভাষা ও সাহিত্য চর্চারও সুযোগ নেই। ভাষাটার শুধু মুখে মুখেই চর্চা আছে।

ধর্মীয় বিশ্বাস : চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাই চাকমারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে। মহাযান ও হীনযান নামে বৌদ্ধ ধর্মের যে মতবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে চাকমারা শেষোক্ত মতবাদেই বিশ্বাসী। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হলেও চাকমাদের একটা বড় অংশ নানাবিধ দেব-দেবী ও অপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, যদিও শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে সেই বিশ্বাস ও পূজার্চনা দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে।

চাকমারা নিজেদেরকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দাবী করলেও তারা যে যুগ যুগ ধরে বৌদ্ধ ধর্ম অনুসরণ করে আসছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। বিগত ৫০ বছর আগেও পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ক্যাং ছিল না বললেই চলে। উল্লেখিত অবস্থা থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, চাকমারা আগে থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের আচার-আচারাণাদি চর্চা করছিলেন।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : শারীরিক গঠন প্রকৃতি/কাঠামো যথা : উচ্চতা, গায়ের রঙ, মুখাবয়ব, চোখের আকার, আয়তন ইত্যাদি দিক বিচারে চাকমাগণ মঙ্গোলীয় জাতিভুক্ত একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। চাকমাদের মুখমণ্ডল গোলাকার, নাক চেপ্টা।

www.pathagar.com

মারমা নারী ও পুরুষ

মারমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী জনগোষ্ঠী মারমা। তিন সার্কেলে বিভক্ত পার্বত্য জনপদে তারা বসবাস করে। তাদের বৃহৎ অংশটি বোমাং সার্কেলের (সমগ্র বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আংশিক) আওতাধীন। অপর অংশের অবস্থান খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মং সার্কেলে। চাকমা সার্কেলেও (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ও খাগড়াছড়ি জেলার আংশিক) মারমা জনগোষ্ঠীর একটি অংশ বসবাস করে। মারমা জনগোষ্ঠী মূলত মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত জাতি। মারমা জনগোষ্ঠীর ভাষা টিবোটো-বার্মেন পরিবারের বর্মী দলভূক্ত একটি ভাষা। মারমা শব্দটি 'ম্রাইমা' শব্দ থেকে উদ্ভূত। ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতির দিক থেকে বর্মী ও আরাকানীদের সঙ্গে মারমাদের লক্ষ্যণীয় সাদৃশ্য এবং ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে।

তঞ্চঙ্গ্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে চতুর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো তঞ্চঙ্গ্যা। আদিবাসী তঞ্চঙ্গ্যারা মূলত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত। তাদের ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত, যার চাকমা ভাষার সাথে উচ্চারণগত সামান্য পার্থক্য থাকলেও অনেকাংশে মিল রয়েছে। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় যথাক্রমে চাকমা সার্কেল ও বোমাং সার্কেলের অধীনে তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর বসবাস।

www.pathagar.com

তঞ্চঙ্গ্যা রমণী

ত্রিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো ত্রিপুরা। ত্রিপুরা সমাজ মূলত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর টিবোটো-বার্মেন শাখার বোড়ো শ্রেণিভুক্ত ভাষাভাষি একটি দল। পার্বত্য তিন জেলা বা তিন সার্কেলের মধ্যে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় (মং সার্কেল) বসবাস করে। বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাতেও (বোমাং ও চাকমা সার্কেল) তাদের বসবাস রয়েছে। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর উসুই ও রিয়াং-এ দু'টো শাখাসহ তিন পার্বত্য জেলায় এদের জনসংখ্যা আনুমানিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার। তন্মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাসরত উসুই ও রিয়াংদের সংখ্যা আনুমানিক ৩০ হাজার। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর উপভাষা ভিত্তিক মোট ৩৬টি গোত্র ও প্রতি গোত্রে ৪/৫টি উপ-গোত্র রয়েছে। বাংলাদেশে তাদের ১৬টি গোত্রের বসবাস রয়েছে।

www.pathagar.com

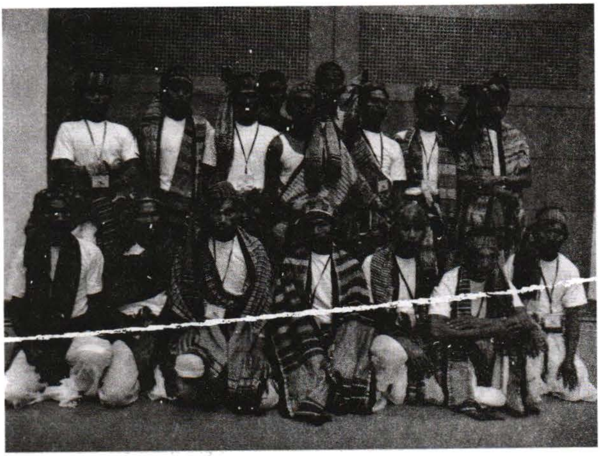

ত্রিপুরা

পাংখোয়া

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দশম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো পাংখোয়া। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত বাঘাইছড়ি উপজেলায় দুর্গম সাজেক অঞ্চলে, বরকল উপজেলায় বড় হরিণা, কলাবন্যা, দুমদুম্যা, সাইচাল ও শুভলং বনাঞ্চল, জুরাছড়ি উপজেলার ফকিরাছড়া, বিলাইছড়ি উপজেলার সাক্রাছড়ি ও ফারুয়া এবং রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়ন এসব এলাকায় পাংখোয়ারা বসবাস করে। পাংখোয়া জনগোষ্ঠী মূলত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত এবং টিবেটো-বার্মেন শাখার কুকী-চীন দলের অন্তর্গত ভাষাভাষি সম্প্রদায়।

পাংখোয়া নারী ও পুরুষ

www.pathagar.com

খিয়াং

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অষ্টম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো খিয়াং। আদিবাসী খিয়াং সমাজ মূলত কুকি-চীন ভাষাভাষি দক্ষিণ কুকি-চীন মতান্তরে টিবোটো-চীন দলের অন্তর্ভুক্ত। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী, কাপ্তাই উপজেলা এবং বান্দরবান সদর, রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় খিয়াং জনগোষ্ঠীর বসবাস। খিয়াংদের জনসংখ্যা তাদের নিজস্ব জরীপ মতে আনুমানিক তিন হাজার ছয়'শ, পরিবারের সংখ্যা আনুমানিক সাতশ'য়ের অধিক।

খিয়াং নারী ও পুরুষ

বম

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বম জনগোষ্ঠী মূলত বান্দরবান পার্বত্য জেলা সদর, রুমা ও থানচি উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়ি উপজেলায় বসবাস করে। তিন পার্বত্য জেলার ষষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠ বম জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা আনুমানিক দশ হাজার। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সিনোটিবেটান পরিবারের টিবেটো বার্মেন শাখার কুকি-চীন দলের মধ্যে কুকি-চীন উপদলের অন্তর্গত ভাষাভাষি হলো বম জনগোষ্ঠী। ইন্দো মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে কুকি-চীন উপদল একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

মূলত ১. জন্মগতভাবে যারা বম তথা বম পরিবারে ও সমাজে জন্মগ্রহণকারী, ২. পিতা বম জনগোষ্ঠীর সদস্য, ৩. একজন বম পুরুষের ঔরসজাত ও একজন বম মহিলার গর্ভজাত ভূমিষ্ট অবৈধ সন্তানও বম বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

বম

ব্যাখ্যা : নিজেকে বম হিসেবে পরিচয় দান করে, এরূপ একজন বম এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করলে সেই ব্যক্তি বম পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করে। অর্থাৎ একজন বমকে বম নামে পরিচিত হতে হলে কোনো বম জাতিসত্তার কোনো একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তবে তার মাকে বম নারী হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহে সামাজিক বাধ্যবাধকতা : বম জনগোষ্ঠী তাদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনটি অধ্যায়কে সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজসিদ্ধ করেছে। এসব রীতি ও আচার-অনুষ্ঠানকে বম সমাজে অলঙ্ঘনীয় করা হয়েছে।

শিশু জন্মের পর সামাজিক আচার : বম সমাজভুক্ত কোনো পরিবারের সন্তান ভূমিষ্ট হবার সময় ধাত্রীসহ উপস্থিত মহিলাদেরকে সন্তান জন্মের ৭ দিন পর নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। নবজাত শিশুর নামকরণ পর্ব পরিবারের মধ্যে সম্পন্ন হবার পর গির্জা বা চার্চে গিয়ে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও বম সামাজিক প্রথা : আদিবাসী বম জনগোষ্ঠী এককালে জড়োপাসক ছিল। জড়োপাসক বমদের সৃষ্টিকর্তাকে বলা হতো 'পাথিয়ান'। 'খোজিং' হলো বমদের প্রধান দেবতা। এককালে তাদের মধ্যে পশুবলির প্রচলন ছিল। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল মানুষ মৃত্যুর পর তার আত্মা বড় একটি পাহাড়ে চলে যায়। পূণ্য কাজের ফলে মৃত ব্যক্তি নূতন দেহে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে দেবতা খোজিং এর অনুগ্রহে। জড়োপাসক বম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভূত প্রেত, ঝাঁড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র, ওঝা-বৈদ্য, জ্যোতিষবিদ্যার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ছিল। ১৯২৭ সাল হতে বম জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়াতে এদের ধর্ম বিশ্বাসে পরিবর্তনের সাথে সাথে পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। তারপরেও বম

www.pathagar.com

সমাজের প্রাচীন প্রথা ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে বম সমাজের নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে ১৯৮৫ সালে বম সোশ্যাল কাউন্সিল গঠন করে। এই কাউন্সিলের লিপিবদ্ধ প্রথা অনুযায়ী সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে আধুনিক খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত প্রটেষ্টান বম সমাজে ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে মদ পান নিষিদ্ধ। বম সমাজে বর্তমানে মদপানের অপরাধে সমাজচ্যুত করা হয় এবং মদপানকারীকে সমাজের ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বম সমাজের বর্তমান ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সমাজের প্রাচীন প্রথা ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলা বম সোশ্যাল কাউন্সিল দ্বারা তাদের সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি এবং প্রথাকে সামাজিকভাবে আইনী স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে জন্মসূত্রে একজন বম যতক্ষণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে ঘোষণার মাধ্যমে কিংবা আচার-আচরণ দ্বারা এই ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সামাজিক কৃষ্টি এবং রীতিনীতি পরিত্যাগ না করেন; ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বম হিসেবে গণ্য হবেন।

গুর্খা

গুর্খা পরিচিতি : গুর্খা জাতির উৎপত্তি নিয়ে নানা মতবাদ রয়েছে। কেউ কেউ বলে থাকেন গোর্খা নামক স্থানের নামানুসারে গুর্খাদের নামকরণ করা হয়েছে। বিষয়টি সঠিক নয়- আসলে গুর্খাদের নামানুসারেই গোর্খা নামক স্থানের নামকরণ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। গুর্খারা তাদের নাম গ্রহণ করেন ৮ম শতাব্দীর বীর আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ গুরু গোরকনাথ থেকে। কথিত আছে রাজস্থানের রাজপুত্র কিশোর বাপ্পা রাওয়াল ওরফে রাজকুমার কালভোজ/সৈলাদিশ, মেওয়ার রাজবংশের স্থপতি এক গহীন জঙ্গলে শিকার কালীন গুরু গোরকনাথকে ধ্যানমগ্ন দেখতে পান। গুরু গোরকনাথের প্রতি ভক্তির কারণে বাপ্পা রাওয়াল তার সেবায় রত হন। ধ্যান ভাঙার পর গুরু গোরকনাথ বাপ্পা রাওয়ালকে দেখতে পান ও তার ভক্তির কারণে তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং খুশি হয়ে বাপ্পা রাওয়ালকে খুকরি (ঐতিহ্যবাহী গুর্খা ছুরি) প্রদান করেন। তিনি এই মর্মে ভবিষ্যতবাণী/আর্শিবাদ প্রদান করেন যে এখন খেকে বাপ্পা রাওয়াল এবং তার বংশ ও অনুসারীরা তাঁর শিষ্য ও গুর্খা নামে পরিচিত হবে ও তাদের বীরত্বগাথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। পরবর্তীকালে গুর্খারা বর্তমান নেপালের পূর্বাংশের একটি স্থান দখল করে ও তাদের গুরুর নামানুসারে উক্ত স্থানের নামকরণ করে গোরখা। অতপর তারা দখল করে নেয় অন্যান্য স্থান যা বর্তমানে নেপাল হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে গোরখা নেপালের ৭০টি জেলার একটি।

বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের গুর্খারা প্রতিবছর শ্রীশ্রী সংসারী মায়ের তথা গঙ্গা মায়ের পূজা করে থাকে। সাধারণতঃ এপ্রিল মাসের পূর্বে গ্রামের সর্বস্তরের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য পশু বলির মাধ্যমে এ পূজা করা হয়। গ্রামের সকলের সাধ্যমত প্রদেয় অর্থ ও ভোজ্য সামগ্রী দিয়ে প্রসাদ রান্না করে পূজা করা হয় ও পূজা শেষে গ্রামের সকলে (মহিলা ছাড়া) প্রসাদ গ্রহণ করে আগামী দিনের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করে থাকে। বর্তমানে এই আচার অনুষ্ঠানে গ্রামের তথা জেলরোড, মাঝি বস্তি ও আসামবস্তির সকল সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দদের যোগ দিতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

পূজার জন্য উৎসর্গ করা পশুটিকে খর্গ দিয়ে এক কোপে কাটতে হয়, যদি এক কোপে মাথা ধর হতে বিচ্ছিন্ন না হয় তবে পূজায় ত্রুটি হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয় ও অমঙ্গলের আশংকা করা হয়।

২. খাওয়া দাওয়া করার সময় কেউ তাকিয়ে থাকলে এবং খাওয়ার পর পেট ব্যথা পায়খানা ইত্যাদি হলে অনেকে বলে থাকেন নজর লেগেছে। অথবা আপনার ছোট্ট সোনামনিকে দেখে কেউ কোলে নিয়ে বললো বা বেশ সুন্দর তো- যেই না বলা পর দিনই আপনার সোনামনি অসুস্থ হয়ে পড়লো অথবা আপনার সুন্দর মুখশ্রী দেখে কেউ বললো তোমার চেহারা যা সুন্দর- দেখলেন তার পর দিনই আপনার মুখে ব্রন ওঠা আরম্ভ হয়ে গেলো। এসবই হলো নজর লাগা। এসব ক্ষেত্রে গুর্খারা নজর ফেলার আয়োজন করে। বোটা সহ ৭টি লাল শুকনা মরিচ হাতে নিয়ে এক দমে নজর লাগা শিশুর মাথা হতে পা পর্যন্ত ছুইয়ে সাত বার মন্ত্র পড়ে জলন্ত আগুনে ফেলে দিতে হয়, স্বাভাবিক মরিচ পোড়ার গন্ধের চাইতে যদি কম গন্ধ লাগে তবে বুঝতে হবে কাজ হয়েছে।

৩. পারিবারিক ভাবে শিশু জন্মের সময় ধাত্রী ও বয়োজ্যেষ্ঠ সহকারীদের মদ ও কাপড় চোপড় দিয়ে শিশুর বাবা ও মাকে মাফ চাইতে হয়, কারণ শিশুকে জন্মদানের সময় তারা মায়ের পা সহ অন্যান্য অংগ ছুয়েছেন। কারণ গুর্খা সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠদের অত্যন্ত সন্মান করা হয়ে থাকে।

৪. পাড়ায় রাতে বা দিনে যদি কুকুর সুর করে ডাকে বা কাঁদে তবে পাড়ায় অমঙ্গল আশংকা করা হয়। কাক ও কুকুরের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভবিষ্যত গণনা করার বিষয়টি গুর্খা সমাজে প্রচলিত। সে কারণে ইতোপূর্বে কাক ও কুকুরের পূজা করা হতো বলে জানা যায়।

৫. গুর্খা সমাজে গরুর মাংশ খাওয়া নিষেধ। গাই গরুর দুধকে মাতৃদুধের সাথে তুলনা করে গুর্খারা গরুকে মান্য করে থাকে।

অহমিয়া

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে অহমিয়া জনগোষ্ঠীকে স্থানীয়ভাবে 'আসাম' হিসেবে বলা হয়ে থাকে। ভারতে ' অসম' নামেও অভিহিত করা হয়। এই জনগোষ্ঠী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলায় বিশেষত আসামবস্তি, মাঝেরবস্তি, গর্জনতলী এলাকায় বসবাস করে। এছাড়াও বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় গুটিকয়েক অহমিয়া পরিবার বসবাস করে। সরকারি পরিসংখ্যানে বা আদমশুমারিতে তিন পার্বত্য জেলায় অহমিয়া জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা সম্পর্কে কোনকিছুই উল্লেখ নেই। তবে অহমিয়ারা মনে করেন যে, তিন পার্বত্য জেলায় তাদের জনসংখ্যা ২,০০০ থেকে ২,২০০- এর মতো হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আসাম রাজ্যের আদি অহমিয়ারাও মূলত পাহাড়ি আদিবাসী এবং মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীভুক্ত। অধিকাংশ জনগোষ্ঠী শহরতলী এলাকায় বসবাস করার ফলে তাদের কোন ধানী জমি এবং পাহাড় ভূমি (গ্রোভল্যান্ড) নেই বললেই চলে। বর্তমানে অহময়িাদের অধিকাংশ পেশায় দিনমজুর ও বেকার।

www.pathagar.com

অহমিয়া সমাজে পৈতৃক সম্পত্তি পুত্র সন্তানই পেয়ে থাকে। তবে পিতা জীবিতকালে কোনো সম্পত্তি কন্যা সন্তানের নামে উইল করে গেলে কন্যাসন্তানেরাও পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পেয়ে থাকে।

ধর্ম : অহমিয়ারা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী হলেও যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মেয়েকে বিবাহ করেছেন কালে-ভদ্রে তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়ে গেছে। কেউ বা তাদের সনাতনী ধর্মকে ধরে রাখতে পেরেছে এবং কেউবা খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী হয়েছে। এসবের কারণে অহমিয়ারা নৈনিতালে পরিণত হয়ে ভাষা, সংস্কৃতি সামাজিক কাঠামোয় অবক্ষয় ঘটে এবং এ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব হয়ে উঠে।

লোক সংস্কৃতি ও ভাষা : কাছারি ভাষা তিব্বতি ভাষা পরিবারভুক্ত। রাঙ্গামাটি তথা বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের অহমিয়ারা মূলত কাছারি ভাষায় কথা বলে না। কালের আবর্তে অন্য জনগোষ্ঠীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে তারা তাদের মূল ভাষা মাতৃভাষা হারিয়ে ফেলেছে। আসমেও কাছারি জনোগোষ্ঠীর মাত্র ৩০% লোক মূল ভাষায় কথা বলে। অবশিষ্টরা বর্তমান অহমিয়া ভাষায় কথা বলে। বর্তমান অহমিয়া ভাষা হচ্ছে ইন্দো- এ্যারিয়ান ভাষার পরিবারভুক্ত।

চ. নদ-নদী, হ্রদ ও জলপ্রপাত

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অন্যতম প্রধান নদী হচ্ছে রাঙ্গামাটির কর্ণফুলি। এই নদী ভারতের লুসাই পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে রাঙ্গামাটির উত্তর- পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ঠেগা নদীর মোহনা হয়ে এ অঞ্চলে প্রবেশ করে। এটি বরকল, শুভলং ও কাপ্তাইয়ের তিনটি পর্বত শ্রেণিকে অতিক্রম করে চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। বরকল এবং উঠানচাতারাতে দু'টি জলপ্রপাত আছে। কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টির আগে এই বরকল জলপ্রপাত অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। কর্ণফুলি নদীর উপনদীগুলো হলো কাচালং, চেঙ্গী, ঠেগা, বড়হরিণা, শুভলং, রাইনক্ষ্যং ও কাপ্তাই। এই উপ-নদীগুলো বর্ষাকালে যথেষ্ট খরস্রোতা থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতাসহ পানির পরিমাণ প্রায় থাকে না বললেই চলে।

রাঙ্গামাটির হ্রদ সমূহ

রাইনক্ষ্যং হ্রদ : কর্ণফুলি নদীর বামতীরের শাখা নদী রাইনক্ষ্যং কাপ্তাই বাঁধের দু'মাইল উজানে কর্ণফুলির সাথে এসে মিলেছে। এই নদীর উৎপত্তি স্থলে রাইনক্ষ্যং হ্রদের অবস্থান।

কাপ্তাই হ্রদ : কর্ণফুলি জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য কর্ণফুলি নদীর কাপ্তাইয়ে বাঁধ নির্মাণের ফলে কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এই হ্রদের আয়তন ১৫৬ বর্গমাইল এবং এর জল বৃদ্ধি পেলে ৪০০ বর্গমাইল পর্যন্ত এর আয়তন বিস্তৃত হয়। এই হ্রদের দৈর্ঘ্য কাপ্তাই থেকে মারিশ্যা (বর্তমান বাঘাইছড়ি) ও কাপ্তাই থেকে মাইসছড়ি পর্যন্ত আনুমানিক ৯০ মাইল এবং প্রস্থে মগবান ও বড় কাউলী এলাকায় আনুমানিক ৯০ মাইল। কাপ্তাই বাঁধটির দৈর্ঘ্য মুল স্থানে ২২০০ ফুট এবং বাঁধের গোড়ায় প্রস্থ ৮০০ ফুট এবং বাঁধের চূড়ায় ২৫ ফুট। ১৯৫৪ সালে বাঁধের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ১৯৬০ সালে শেষ হয়।

www.pathagar.com

জলপ্রপাত

জলপ্রপাত : কর্ণফুলি নদীতে বরকল উঠানচাতারাতে দু'টি জলপ্রপাত আছে। কাপ্তাই বাঁধের পর বরকল জলপ্রপাতটি হ্রদের জলে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তবে রাঙ্গামাটি থেকে নৌপথে শুভলং- এ গেলে পথিমধ্যে কর্ণফুলি নদীর দুই তীরে বেশ কয়েকটি সুন্দর ঝর্না চোখে পড়ে।

ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থান

বীরশ্রেষ্ট মুন্সী আবদুর রউফ স্মৃতিসৌধ : একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট নামক এলাকায় বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুল রউফ ১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল তারিখে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত করে এই নানিয়াচরের মাটি। রাঙ্গামাটি থেকে জলপথে এই উপজেলায় প্রবেশ পথে সবাইকে স্বাগত জানায় এই বীর সেনানীর স্মৃতি সৌধটি। ১৯৯৭ সালে তাঁর সমাধিস্থলে স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করা হয়।

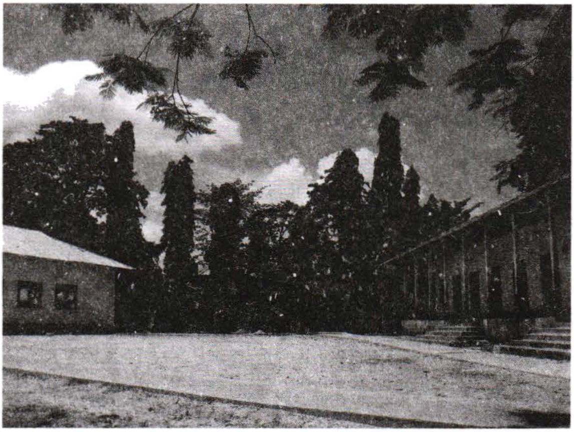

রাঙামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়

www.pathagar.com

রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় : বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচয়ে প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ হচ্ছে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়। 'জ্ঞানই শক্তি' এই অমোঘ বাণীকে ধারণ করে এটি ১৮৯০ সালে এটি চালু হয়। এটি এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রথম উচ্চ বিদ্যালয় বিধায় এমন কোন দেশি ঐবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব নেই যাঁরা এখানে শিক্ষা লাভ করেননি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এই বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ২০০০ সালে ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীসহ এতে যোগদান করেন দেশি বিদেশি অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি এবং এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীগণ।

রাঙামাটি সরকারী কলেজ

রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ : এই মহাবিদ্যালয়টিও পার্বত্য এলাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন থেকেই তিন পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য এই কলেজে ছাত্র ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আসেন। পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি তথা এখানকার জনমানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়ানোর পিছনে এই মহাবিদ্যালয়টির অনেক অবদান রয়েছে। বিশেষত ষাটের দশকে কাপ্তাই বাঁধের ফলে এখানকার বাসিন্দাদের অর্থনীতির শক্ত ভীতটি নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষা গ্রহণই এখানকার আদি বাসিন্দাদের জন্য অনেকটা বিকল্প অবলম্বন হিসেবে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়।

বড় মহাপ্রুম উচ্চ বিদ্যালয় : পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম স্কুলটি প্রতিষ্ঠার ৪১ বছরের ব্যবধানে ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় স্কুলটি স্থাপিত হয় মাওরুম (বর্তমান নাম মহাপ্রুম) নামক স্থানে। বর্তমানে নানিয়ারচর উপজেলার রামহরি পাড়া নামক স্থানে স্কুলটির অবস্থান।

www.pathagar.com

রাজবন বিহার

রাজবন বিহার

www.pathagar.com

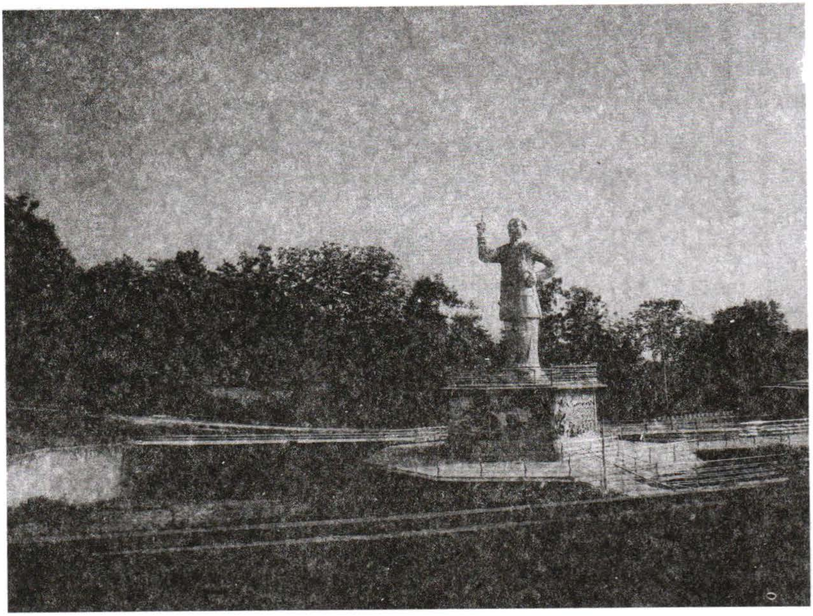

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ভাস্কর্য্য

বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য : রাঙ্গামাটি শহরের প্রবেশ মুখে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা পরিষদ কার্যালয় (সিও অফিস) সংলগ্ন এলাকায় সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাস্কর্য। বর্তমানে এর প্রায় ৭০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি থেকে এই ভাস্কর্যটির উচ্চতা ৭১ ফুট। আর শুধুমাত্র মূল ভাস্কর্যটির উচ্চতাই ৪১ ফুট যা বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এই ভাস্কর্যটিকে ঘিরে চারিদিকে দেয়ালে অঙ্কনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক মুহূর্ত আর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহকে।

রাঙ্গামাটিবাসী তথা সারাদেশের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব ভূমি রাঙ্গামাটি শহরে স্থাপিত এই ভাস্কর্যটি অদূর ভবিষ্যতে দেশ বিদেশের সব মানুষকে আরো আকৃষ্ট করবে।

ঐতিহাসিক স্থান : দেশের বিখ্যাত স্থান সমূহের মধ্যে কাপ্তাই উপজেলা বিভিন্ন কারণে এখনো পর্যটকদের কাছে একটি আর্কষণীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত। কাপ্তাই উপজেলার আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানসমূহের মধ্যে কয়েকটি খুবই মনোমুগ্ধকর। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর পিকনিক স্পটের কথা। এছাড়াও বর্তমানে সেখানে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত লেকশোর সেনা রিসোর্ট। আরো রয়েছে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে আরো

www.pathagar.com

কয়েকটি পিকনিক স্পটের কথা। এছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে কয়েকটি পিকনিক স্পট। এরমধ্যে বনশ্রী, জুম রেস্তোরাঁ এবং পাহাড়িকা উল্লেখযোগ্য। জুম রেস্তোরাঁর উল্টোদিকে নদীর অপর পাড়ে রয়েছে ওয়াগ্গাছড়া চা বাগান। কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে সেখানেও পিকনিক করা যায়।

এছাড়া এখানে রয়েছে কর্ণফুলি পেপার মিল, চা শিল্প (ওয়াগ্গা টি লিমিটেড), কাঠ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ও বাংলাদেশ টিম্বার নামে রাঙ্গামাটি জেলার উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান।

বরকলের ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান : শুভলং এ ছোট বড় ৮টি পাহাড়ি ঝর্না রয়েছে। এগুলো ভ্রমণ প্রত্যাশী দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের সমাগমে মুখর হয়ে উঠে। ফালিতাঙ্যাচুগ এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। যার উচ্চতা প্রায় ১,৮৬৮ ফুট। এই শৃঙ্গেও পাদমূলে উপজেলা কমপ্লেক্স অবস্থিত। এই পর্বত শৃঙ্গ হতে রাঙ্গামাটি জেলা সদর ও ভারতের মিজোরাম রাজ্যটি দৃষ্টিগোচর হয়।

জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

কামিনী মোহন দেওয়ান : কামিনী মোহন দেওয়ান ১৮৯০ সালের ৮ মার্চ রাঙ্গামাটি সদর থানার ১০৭ নং মৌজার বরাদমে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এন্ট্রাস পাশ করেন। ১৯১৩ সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ভাইবোনদের পক্ষে এতদ্ঞ্চলের ৬টি মৌজার শাসনভার তাঁর উপর বর্তায়। পাশাপশি প্রায় দুই হাজার একর পার্বত্য জেলার জমিদারি ও রাঙ্গুনিয়া কালেক্টরি এলাকাস্থ শতাধিক দ্রোন জমির পরিচালনা কার্য তাঁর উপর বর্তায়। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। এ সময় তিনি সরকারী বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতেন করার লক্ষ্যে ১৯১৪ সালে সর্বপ্রথম জনসমিতি গঠন করেন।

উপমহাদেশ বিভাগোত্তরকালে পার্বত্যবাসীদের অধিকার ন্যায্য আদায়ের লক্ষ্যে জনসমিতির পক্ষে ভারত উপমাহাদেশের তৎকালীন শীর্ষ নেতা মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, তৎকালীন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কৃপালিনী, তৎকালীন স্বরাষ্টমন্ত্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ বাহাদুর, বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাজনৈতিক কারণে জনসমিতি নিষিদ্ধ করা হলে তিনি ১৯৫০ সালে 'হিলট্রেক্ট পিপলস্ অর্গানাইজেশন' নামে আরো একটি সমিতি গঠন করেন।

১৯৫৪ সালে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন সামন্ত প্রভু হয়েও তিনি আজীবন সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। 'পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের কাহিনি" নামে তাঁর একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫৪-৫৫ সালে তাঁর উদ্যোগে চট্টগ্রামে উপজাতীয় ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৯৭৬ সালে পরিণত বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

www.pathagar.com

কামিনী মোহন দেওয়ান

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : তিনি ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর নানিয়ারচর উপজেলার ছোট মহাপ্রুম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম কলেজ হতে সমাজ কল্যাণ বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বি.এড এবং ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে এলএলবি পাশ করেন। তিনি ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে বার এসোসিয়েশনে যোগদান করেন।

তিনি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পাহাড়ি ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে পাকিস্তান সরকার গ্রেপ্তার করে। দুই বছর পর ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কারামুক্ত হন। তিন ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বারের মত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সাংসদ নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডন সফর করেন। তিনি ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট পটপরিবর্তনের পর আত্মগোপন করেন। পরবর্তীকালে জনসংহতি কতিপয় বিপথগামী সদস্যের গুলিতে তিনি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর শহিদ হন।

www.pathagar.com

ঝ. মুক্তিযুদ্ধ

একাত্তর সালে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা রাঙ্গামাটি, রামগড় ও বান্দরবান এই তিনটি মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল। যুদ্ধের দামামা যখন সারা দেশে বাজতে শুরু করে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীরাও স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা সদর রাঙ্গামাটি জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোতধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে একাত্মা হয়ে গিয়েছিল। এখানকার বাঙালিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আদিবাসী জাতিসমূহও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে মুক্তির সংগ্রামে সামিল হয়।

রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের তৎকালীন ছাত্রনেতা গৌতম দেওয়ান এবং সুনীল কান্তি দে এর নেতৃতে ৭১ এর মার্চে রাঙ্গামাটি জেলা সদরে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে ১৬ মার্চ রামগড় মহকুমার কাজী রুহুল আমিনকে আহবায়ক এবং সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরাকে যুগ্ম আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। খাগড়াছড়িতে দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরীর নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তখনকার সময় ঘোষিত রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন, রাজপথে মিছিল- শ্লোগান, আন্দোলন, প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

রাঙ্গামাটিতে ২৭ মার্চ বর্তমান রাঙ্গামাটি স্টেশন ক্লাবের মাঠে মুক্তিযুদ্ধের অস্থায়ী ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়। তৎকালীন জেলা প্রশাসক হোসেন তৌফিক ইমাম (এইচ.টি ইমাম- মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা) স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতির মুক্তি আন্দোলনে শরীক হন। রাঙ্গামাটিতে উক্ত ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপনে জেলা প্রশাসক এইচ. টি ইমাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আব্দুল আলী আর রাঙ্গামাটির অগণিত স্বাধীনতাকামী মানুষ এগিয়ে এলেন প্রাণঢালা অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে। দেয়া হয় রাইফেল ট্রেনিং এবং ছাত্রদের ককটেল বানানোর প্রশিক্ষণ। জেলা প্রশাসকের সম্মতিক্রমে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের বিজ্ঞানাগারে রসায়ন বিভাগের যাবতীয় কেমিক্যাল ব্যবহৃত হলো এই কাজে।

স্থানীয়ভাবে যখন মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল তখনই রাঙ্গামাটিতে এলেন মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন কাদের, ক্যাপ্টেন শওকত ও ক্যাপ্টেন করিম। তাঁদের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসকের সরকারী বাংলোতে স্থানীয় রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পচিালনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। এতে রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ আরো বেশি অনুপ্রাণিত ও সুসংগঠিত হন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণ নেয়ার জন্য ২৯ মার্চ রাঙ্গামাটি হতে ছাত্র যুবকের ৬০ জনের একটি দল ভারতে রওনা হয়। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় কর্মরত ইপিআর এর বাঙালি অফিসার ও জোয়ানরা এলেন রাঙ্গামাটিতে। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে তাঁরা চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। রাঙ্গামাটির আলম ডক ইয়ার্ডে তাঁদের জন্য রসদ সরবরাহ, যানবাহনের ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে গড়ে ওঠে মুক্তি বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এখানেই খাবার রান্না করা হত।

www.pathagar.com

ওয়ারলেস সেন্টার স্থাপন করে এখান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা এবং চট্টগ্রামে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হত। রাঙ্গামাটির নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্র নেতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলেন– শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কালুঘাটে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রসদ সরবরাহ করা হল রাঙ্গামাটি থেকে। রাঙ্গামাটিবাসীরা উদার মুক্তিযোদ্ধদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য এগিয়ে এলেন।

রাঙ্গামাটি হতে ভারতে যাওয়া প্রথম মুক্তিযোদ্ধা দলটি এক সপ্তাহের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে ক্যাপ্টেন আব্দুল কাদেরের নেতৃত্বে রামগড় সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ১০ এপ্রিল। রামগড় মহকুমা তখন মুক্ত অঞ্চল ছিল। সেখানে ৪ দিন অবস্থানের পর তাঁরা ৩টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে মহালছড়ি হয়ে রাঙ্গামাটি শহরের দিকে এগিয়ে যায় ১৫ এপ্রিলে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্থানীয় কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ঐ দিনই পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী রাঙ্গামাটিতে এসে অবস্থান নেয় চুপিসারে- যা মুক্তিযোদ্ধাদের জানা ছিলোনা। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল জেলা প্রশাসকের বাংলোর কাছাকাছি এলে সেখানে অবস্থানরত পাকবাহিনী তাঁদের অস্ত্রসহ ধরে ফেলে। এই দলে ছিলেন বীর মুক্তিযুদ্ধা এসএম কামাল, শফিকুর রহমান, ইফতেখার, ইলিয়াস, আব্দুল বারী, মো. মামুন ও আবুল কালাম আজাদ। ধৃত অন্যদের পাকবাহিনী নির্মমভাবে অত্যাচার চালিয়ে রাঙ্গামাটির মানিকছড়িতে নিয়ে হত্যা করে। কালাম নৌকা চালকের ভূমিকায় অভিনয় করে পাকসেনাদের ফাঁকি দিয়ে কোন মতে প্রাণে বেঁচে যান। মুক্তিবাহিনীর অপর ২টি দলের মধ্যে ১টি দল রাঙ্গামাটি আলম ডক ইয়ার্ডে ওঠে। সেখানকার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাঁরা সেখানে অবস্থান নেয় এবং অপর দলটি রাঙ্গামাটি শহরে পাক সেনাদের চলাফেরা টের পেয়ে রাঙ্গামাটি হ্রদে অবস্থান গ্রহণ করে। পরে দলসমূহ রাঙ্গামাটি শহর ছেড়ে বাকছড়িতে অবস্থান গ্রহণ করে এবং পরদিন বাকছড়ির অবস্থান থেকে টহলরত পাকবাহিনীর উপর হামলা চালায়। ২ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হোসেন তৌফিক ইমাম রামগড় মহকুমা সদরে আসেন। তিনি সঙ্গে করে প্রচুর অর্থ নিয়ে আসেন এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের হাতে তুলে দেন। রামগড় মহকুমাতে তিনি বাংলাদেশ সরকারের অধীনে প্রশাসনিক কার্যপরিচালনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি রামগড় সীমান্ত অতিক্রম কওে ভারতের ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমাতে চলে যান এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় রাঙ্গামাটিতে এসে পুলিশ, আনসার, ও ইপিআরদের সশস্ত্র অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা নেন। তাঁর নির্দেশেই এডিসি সামাদ বরকল সীমান্ত পার হয়ে ভারতের দেমাগ্রীতে গিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে মহকুমা প্রশাসক আব্দুল আলী রাঙ্গামাটিতে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতেন। পরবর্তীকালে ভারতের উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটি ত্যাগের সময় তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর নামানুসারে কায়দে আজম মেমোরিয়াল একাডেমীর নাম পরিবর্তন করে শহিদ আব্দুল আলী একাডেমী নামকরণ করা হয়। বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় শহিদ আব্দুল আলীর একটা স্মৃতি স্তম্ভ রয়েছে।

www.pathagar.com

প্রয়াত মং রাজা মংপ্রু সাইন চৌধুরী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য মানিকছড়ি রাজবাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে যান এবং পার্বত্য এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করেন। তিনি সর্বপ্রথম বিপ্লবী সরকারের হাতে বৈদেশিক মুদ্রা তুলে দেন।

পাকবাহিনী রাঙ্গামাটি জেলা সদর হতে ১৫ এপ্রিল দখল করার পর পরই বান্দরবান মহকুমার দখল করে নেয়। ২৭ এপ্রিল খাগড়াছড়ি ও ২ মে রামগড় মহকুমার সদও এলাকা দখল করে।

পাকবাহিনী ২০ এপ্রিল বুড়িঘাট- নানিয়ারচর হয়ে মুক্তিবাহিনীর মূল প্রতিরক্ষা কেন্দ্র মহালছড়ির দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা চালায়। এ সময় ৮ম ইস্ট বেঙ্গলের একটা অংশ এবং তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ এর কিছু সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। ঐদিন ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ বুড়িঘাট অঞ্চলের চিংড়ি খালের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। পাকবাহিনীর ২য় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সদস্যরা সেদিন মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা এলাকায় ঢুকে পড়ে। মুক্তিবাহিনীকে দেখামাত্র শত্রু সৈন্যরা ৩ ইঞ্চি মর্টার ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে গোলাবর্ষণ শুরু করলে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। একমাত্র মুন্সী আব্দুর রউফ তাঁর নিজের অবস্থান থেকে মেশিনগান দিয়ে শত্রুর উপর গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখেন- যার ফলে শত্রুর ২টি লঞ্চ ও ১টি স্পীড বোট পানিতে ডুবে যায় এবং প্লাটুন শত্রু সৈন্য সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। অক্ষত নৌযানগুলোতে অবশিষ্ট শত্রু সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করে। শত্রুর প্রবল গোলাবর্ষণের মুখেও মুন্সী আব্দুর রউফ তাঁর মেশিনগান দিয়ে নিজের অবস্থানে স্থির ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই বিপক্ষের মর্টারের গোলা তাঁর অবস্থানে আঘাত করলে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তার অসীম বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ফলে পাকবাহিনী মহালছড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের মূল প্রতিরক্ষা বুহ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধা জানাতে ১৯৯৭ সালে নানিয়ারচর বুড়িঘাটে তাঁর সমাধির উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

পাকবাহিনী ২৭ এপ্রিল পুনরায় রাঙ্গামাটি থেকে মহালছড়ি অভিমুখে জলপথে অগ্রসর হয়। তখন মহালছড়িতে মেজর মীর শওকত এর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীরা প্রতিরক্ষাবুহ্য গড়ে তুলেছিল। সেখানে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মুক্তিবাহিনীর ক্যাপ্টেন আবতাবুল কাদের গুলিবিদ্ধ হন। তিনি ৭ পাক সেনাকে ঘায়েল করেন। বীর উত্তম খেতাবপ্রাপ্ত কাদেরকে রামগড়ে নেবার পথে শহিদ হন। তাঁকে রামগড়ে কবর দেয়া হয়। মহালছড়ি দখল করার দিনই পাকবাহিনীরা খাগড়াছড়িও দখল করে।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই রামগড় মহকুমা সদর হয়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের পীঠস্থান। মেজর জিয়াউর রহমান ৪ এপ্রিল রামগড়ে আসেন এবং রামগড় মহকুমা সদর পতনের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। রামগড়ে এসে তিনি রামগড় উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন করেন। মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ট্রেনিং চলার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ অভিযানও পরিচালিত হয়। রামগড় পোস্ট অফিসের দ্বিতীয় তলা ছিল তাঁর আবাসস্থল। অফিস ছিল রামগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয়ে। তৎকালীন ভারতের সীমান্ত

www.pathagar.com

এলাকায় অবস্থিত রামগড় সদর থেকে তখন চট্টগ্রাম, শুভপুর, মহালছড়ি এবং অন্যান্য ঐ এলাকায় পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা হত। ১ মে পর্যন্ত রামগড় সদর ছিল মুক্ত এলাকা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিশালী ঘাঁটি।

বর্বর পাক বাহিনীরা রামগড় দখল করার জন্য ত্রিমুখী আক্রমণ পরিচালনা করে। তৎকালীন সময়ে করেরহাট থেকে রামগড় পর্যন্ত ৩০ কি. মি, সরাসরি পাকা রাস্তা বিদ্যমান ছিল এবং এ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সুদৃঢ় অবস্থান ছিল। চট্টগ্রামের করেরহাট হয়ে রামগড় দখল করতে পাক বাহিনীর ৭ দিন সময় লাগে। পাকবাহিনীর এ সড়কে সাজোয়া বহর ও ট্যাংক ব্যবহার করে। তাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। পাকবাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধের জন্য মুক্তিবাহিনীরা করের হাট- রামগড় সড়কের মাঝপথে একটি পাকা সেতু উড়িয়ে দেয়। অবশেষে ২ মে বিকাল ৪টায় রামগড় মহকুমার পতন ঘটে। পাকবাহিনীরা রামগড় পুলিশ স্টেশন, রামগড় মহকুমা হাসপাতাল বাজার এবং সীমান্ত এলাকার সমস্ত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস সাধন করে। তারা রামগড়ে দখল করার পর জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে এবং রামগড় হতে ভারতের পথে চলাচলের সুবিধার্থে নির্মিত সংযোগে ব্রীজটি ভেঙ্গে দেয়।

পাকবাহিনীরা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদর রাঙ্গামাটি ও মহকুমা রামগড় এবং বান্দরবান দখল করার পর বিভিন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ঘাঁটি স্থাপন করে এবং ঘাঁটিসমূহ সুদৃঢ় করে নেয়। তারা বিভিন্ন এলাকায় শান্তি কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় হানা দিয়ে বর্বর অত্যাচার চালায় ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। পাকবাহিনীরা রামগড়, গুইমারা, মানিকছড়িসহ বিভিন্ন ক্যাম্পে পাহাড়ি নারীদের জোর করে নিয়ে অমানবিকভাবে ধর্ষণ করে এবং ক্যাম্পে উলঙ্গ অবস্থায় বন্দি করে রাখে।

১ নং সেক্টরের আওতায় সর্বপ্রথম ৫ মে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করা হয়। এই দল গঠনে নেতৃত্ব দেন হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা। এটি পরবর্তীকালে একটি পূর্ণাঙ্গ কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। শ্রী ত্রিপুরাকে কোম্পানি কমান্ডার নিযুক্ত করে। এই কোম্পানির অধীনে গ্রুপ নং- ৯১, ৯২, ৯৩. ৯৪ এবং ৯৫ সংযুক্ত করা হয়। উক্ত গ্রুপগুলির ট্রেনিং ছিল অম্পি নগর এবং ১ নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার হরিণা। ১ নং সেক্টরের অধীনে হরিণা থেকে ৩০ কি. মি, দূরবর্তী সীমান্ত এলাকা ভারতের বৈষ্ণবপুরে আগস্ট মাসের প্রথম দিকে সাব-সেক্টর স্থাপন করা হয়। সেখানে অবস্থানরত গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। পার্বত্য এলাকায় অবস্থানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের চলাচলের সুবিধা, শত্রুপক্ষের ঘাঁটি আক্রমণ এবং পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্গত নাকাপা, কুমারীপাড়া, পাগলা পাড়া, মানিকছড়ি, ডাইনছড়ি, যোগাছলা ও গাড়িটানা এলাকার গহীন অরণ্যে মুক্তিবাহিনীর গোপন ক্যাম্প বা আশ্রয়স্থল করা হয়। এই সমস্ত গোপন গেরিলা ক্যাম্পে ঐ এলাকার হেডম্যান কার্বারীসহ সকল স্তরের জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পাকবাহিনীর গতিবিধি এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করত।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের হাফলং এর বিএসএফ ট্রেনিং প্রাপ্তদের একটি দল মুক্তিযুদ্ধ গ্রুপ কামন্ডার নাজিম উদ্দিনের নেতৃত্বে ৯ ডিসেম্বর কাউখালী উপজেলার অন্তর্গত বেতবুনিয়া ও বালুখালীতে গেরিলা অপারেশন পরিচালনা করে। এ যুদ্ধে গ্রুপ কমান্ডার নাজিম উদ্দিন এবং মুক্তিযুদ্ধ মোহাম্মদ জাফর শহিদ হন। ১১ ডিসেম্বর মাহবুব আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে (বর্তমান জেলা ইউনিট কমাণ্ডার) বেতবুনিয়াস্থ চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কের উপর অবস্থিত কালভার্টের উপর অতর্কিত পাকবাহিনীর জীপের উপর গেরিলা আক্রমণ চালানো হলে ঘটনাস্থলে গাড়ির ড্রাইভারসহ ২ জন অফিসারের মৃত্যু ঘটে। উক্ত গেরিলা যুদ্ধে কমান্ডার মাহবুব আলম চৌধুরী বাম পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়িতে অবস্থিত ফারুয়া ও শুকনাছড়ির মোহনায় পাক-সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। সেখানে পাঞ্জাবি, রাজাকার, আলবদরসহ ২৫০ জন সৈন্য অবস্থান করত। সেখানে পাক সেনাবহিনীর কয়েকটি স্টিমার ও গানবোটও ছিল। আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে পাইলট মান্নানসহ মুক্তিবাহিনীর একটি দল পাহাড়ি এলাকার ক্যাম্পের অভ্যন্তরে এসে পড়ে। তারা চাকমাদের সহায়তায় নৌকায় করে শুকরছড়ি এলাকায় নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যায়। জানা যায়, ফারুয়া এলাকায় কয়েকশত মুক্তিযোদ্ধা পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়লে তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ফারুয়া জারিয়াপাড়া নামক স্থানে সুলতান আহম্মদ কুসুমপুরীর নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীরাও পাকবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা যায়। পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে সুবেদার টি.এম আলী এখানেই শহিদ হন। এই যুদ্ধে সুবেদার আবু ইসলাম দোহাজারী ও সুলতান আহম্মদ কুসুমপুরী আহত হন। পরবর্তীকালে মিত্র মুক্তিবাহিনীরা ফারুয়া পাকবাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে বিনা রক্তপাতে ফারুয়া দখল করে নেয়। সেখানে অবস্থানরত রাজাকার, আলবদর সাদা পতাকা উত্তোলন করে মিত্র মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

বর্তমান রাঙ্গামাটি জেলার বরকলে পাকবাহিনীর সামরিক অবস্থানের উপর ১৪ ডিসেম্বর সকাল ১০ টায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ২টি বিমানযোগে আক্রমণ চালায়। সেখানে ৭৫০ জন পাক সেনার সুদৃঢ় অবস্থান ছিল। অন্যদিকে মিত্র মুক্তিবাহিনীরা জৈলানন্দ সিং এবং সুলতান আহম্মদ কুসুমপুরীর নেতৃত্বে প্রায় ৫০০ জন মুক্তিযোদ্ধা বরকল অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। ঐ দিন ফারুয়ায় অবস্থানরত ছদ্মবেশী পাঞ্জাবিরা জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে টহলরত গানবোট যোগে ফারুয়া থেকে বরকলের দিকে এগোনোর সময় মুক্তিবাহিনীর মহিউদ্দিন গ্রুপের উপর আচমকা আক্রমণ করলে এখানে বেশ কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাৎ বরণ করেন। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা আক্রমণে পাঞ্জাবিরা পালিয়ে যায়। ১৫ ডিসেম্বর মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ভোরবেলায় বরকলে পাকবাহিনীর অবস্থানের উপর আক্রমণ শুরু করে। যৌথবাহিনীর রকেট লাঞ্চার ও এলএমজি থেকে অনবরত গুলি চালিয়ে যেতে থাকে। পাঞ্জাবিরাও যৌথ বাহিনীর উপর সেরিং করতে থাকে। সকাল বিকাল ৩টা পর্যন্ত উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ চলে। এতে যৌথবাহিনী ত্রিমুখী আক্রমণ পরিচালনা করে। যৌথবাহিনীর আক্রমণে

www.pathagar.com

টিকতে না পেরে পাঞ্জাবিরা রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে স্টিমারযোগে বরকল ত্যাগ করে। অন্যদিকে তাদের অনুসারী বাঙালি রাজাকার, আলবদর ও বেলুচ সৈন্যদের যুদ্ধরত সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলে। ফলে ঐদিন সন্ধ্যার পর বেশ পূর্বে পাকবাহিনীর সাদা পতাকা উত্তোলন করে যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বরকলে পাঞ্জাবিদের শক্তিশালী ঘাঁটি এইভাবে মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে আসে। এই যুদ্ধে অনেক পাঞ্জাবি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা পড়ে। জানা যায়, এই ঘাঁটি দখল করতে ভারতীয় মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর অনেক সদস্য শহিদ হয়েছেন। এই ঘাঁটি দখলের পর মিত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল সুজন সিং ওভান বরকল পরিদর্শন করেন। ১৫ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী রাঙ্গামাটি দখল করে নেয়। সর্বস্তরের রাঙ্গামাটিবাসীরা মিত্র ও মুক্তিবাহিনীদের প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানান। রাঙ্গামাটিতে তারা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। রাজমাতা বিনীতা রায় সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যর্থনা জানান। ১৭ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল সুজন সিং ওভান ও শেখ ফজলুল হক মনি ভারতীয় হেলিকপ্টারযোগে রাঙ্গামাটির পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং মাঠে অবতরণ করেন। এখানে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান তৎকালীন ছাত্রনেতা গৌতম দেওয়ান, আব্দুর রশিদ, মো. ফিরোজ আহম্মদ, মনীষ দেওয়ান (পরবর্তীকালে কর্ণেল) ও হাজারো ছাত্র জনতা।

জেলার মুক্তিযোদ্ধা তালিকা : সরকারের সর্বশেষ নীতিমালা অনুসারে জেলার মুক্তিযোদ্ধাগণের তালিকাটি নিম্নরূপ :

সদর উপজেলা : নিরঞ্জন দাশ, অনিল কুমার দাশ, বাবুল চন্দ্র বিশ্বাস, কানু চন্দ্র বিশ্বাস, চিত্ত রঞ্জন দাশ, মো. নাজমুল হক, প্রীতি কান্তি ত্রিপুরা, নুরুল হক, বিজয় কুমার ত্রিপুরা, আবুল কালাম আজাদ, শহিদ আব্দুল শুক্কুর, সুকুল রতন বড়ুয়া, সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া, অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মো. আব্দুর শুক্কুর, বসন্ত কুমার ত্রিপুরা, রণ বিক্রম ত্রিপুরা, পুলিশ ইন্সপেক্টর খগেন্দ্র লাল চাকমা, ত্রিপুরা কান্তি চাকমা, গৌতম দেওয়ান, কর্নেল (অব.) মনীষ দেওয়ান, কৃপা সুখ চাকমা, গোপাল কৃষ্ণ দেওয়ান, রমনী রঞ্জন চাকমা, বিমলেশ্বর দেওয়ান, অশোক মিত্র চাকমা, কোকনাদক্ষ রায়, উৎপলাক্ষ রায় এবং তাঁর দুই পুত্র তরুণ রায় ও স্বপন রায় পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে নিহত হন।

চন্দ্রঘোনা থানা : দিলীপ কুমার দাশ, প্রভুধন চৌধুরী, চিংহলা মং চৌধুরী মারী, ডা. এম এস চৌধুরী, রবার্ট রোনাল্ড পিন্টু।

বাঘাইছড়ি উপজেলা : মো. আব্দুল হালিম, মো. আব্দুস সবুর, মো. হোসেন আহাম্মদ, মো. এস্তাজ আলী, আজিজুর রহমান, মৃত আব্দুল হামিদ, মো. মুজিবুর রহমান, মফিজুর রহমান, আবুল কালাম, ফরিদ আহম্মদ, ইদ্রিস আসলাম, আব্দুল মতিন, মো. নুরুল ইসলাম, মো. শামসুদ্দিন, আমীর আহাম্মদ, মো. কামাল উদ্দীন, আব্দুস সামাদ, প্রফুল্ল কুমার চাকমা, প্রীতিশ কান্তি ত্রিপুরা, অনিল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা।

কাউখালী উপজেলা : মাহবুব আলম, মনোরঞ্জন দাশ, মিলন কান্তি পালিত, বাবুল চন্দ্র দাশ, আব্দুস সালাম, মো. মোস্তফা।

www.pathagar.com

কাপ্তাই উপজেলা : মো. ব্বুল কাশেম, ননী গোপাল বিশ্বাস, মো. বেলাল হোসেন, মো. মোফাজ্জেল হোসেন।

লংগদু উপজেলা : মীর শাহনেওয়াজ চৌধুরী, রবীন্দ্র জলদাশ।

রাজস্থলী উপজেলা : মনোরঞ্জন দাশ

বরকল উপজেলা : করুণা মোহন চাকমা, মো. নুরুল আমিন।

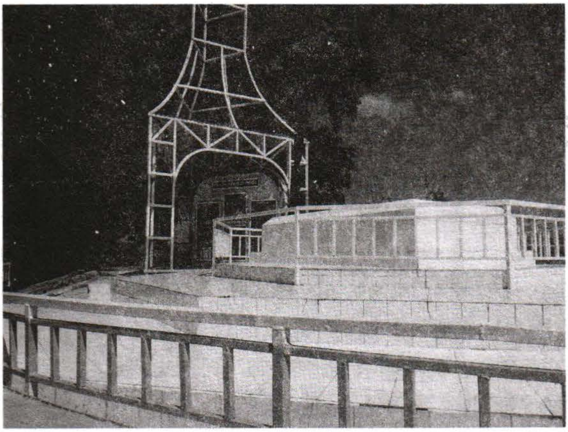

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ স্মৃতিসৌধ

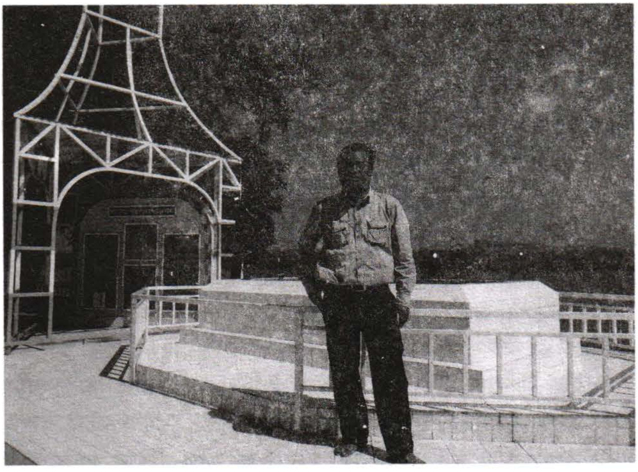

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ স্মৃতিসৌধে সংগ্রাহক তুষার শুভ্র তালুকদার

www.pathagar.com

ঞ. বিখ্যাত গায়ক, সাধক ও খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

চাকমাদের আদি কবি শিবচরণ চাকমা : তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে এক কিংবদন্তি চরিত্র। তিনি চাকমা সাহিত্যের আদি কবি ও সাধক। এই জনপ্রিয় সাধক কবি কাপ্তাই উপজেলার কর্ণফুলীর নদীর উপনদী শিলকের তীরে 'উয়ারা ওয়াহ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও বাংলা ১১৮৪ এবং ইংরেজি ১৭৪০-১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বলে অনুমান করা যায়। তাঁর পিতার নাম ধুংঙ্গী চাকমা ও মাতার নাম ধর্মবী চাকমা। পিতা-মাতার দুই সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ। শৈশব কালেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। সে সময় পরিবারে গুরুদায়িত্ব নিতে হয় জ্যেষ্ঠ ভাই কালিচরণকে। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন সংসারের প্রতি উদাসীন ভাবুক প্রকৃতির। সে সময় তিনি পৃথিবী নিয়ে নানা কিছু ভাবতেন। পৃথিবীতে কেন এসব হয়, কীভাবে হয়, কারা করেন? এসব ভাবতেন। শিবচরণের বিদ্যাশিক্ষার হাতে খড়ি হয় তাঁর মাতুল সম্পর্কীয় 'হরমনি'র কাছে। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে হরমনির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে ফেলেন। শিবচরণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর মা ও জ্যেষ্ঠ ভাই উৎসাহ যোগাতেন। শিবচরণ যখন কৈশোরে পদার্পণ করেন তখন তার মধ্যে সংসার বিমুখতা প্রবল হয়ে ওঠে এবং গভীর অরণ্যে নির্জন স্থানে গিয়ে ধ্যান করতেন। শিবচরণের এই সংসার বিমুখতা দেখে তাঁর মা তাঁকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। জনশ্রুতি আছে যে, একদিন তাঁর মা বেইন বা তাঁত বুনার সময় শিবচরণকে সংসারী হতে বলেন। তখন শিবচরণ তাঁর মাকে বলেন- "মা আমাকে যদি ধরতে পার? ধরতে পারলে তোমার জয় হবে"। তখন তাঁর মা তাঁকে ধরলে গেলে দেখেন যে, শিবচরণ অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তাঁর অদৃশ্য হওয়া দেখে তাঁর মা খুবই আশ্চর্য হয়ে যান। তখন তাঁর মা বেইন বুনা বন্ধ করে কুত্তি (মাটির তৈরি জল পাত্র) থেকে জলপান করতে গেলে দেখেন যে সেই কুত্তির ছোট নলের মধ্যে শিবচরণ পুতুলের মত বসে আছেন। তখন তাঁর মা আরও আশ্চর্য হয়ে যান এবং ছেলেকে বলেন যে তিনি আর কোনদিন তাঁকে সংসারী হতে বলবেন না। তখন শিবচরণ ওখান থেকে বের হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। এক পর্যায়ে শুল্ক প্রদানের বিষয়ে বিরোধের জের ধরে তৎকালীন ব্রিটিশদের সঙ্গে চাকমা রাজা শুকদেব রায় দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লে শুকদেব রায়ের সেনাপতি রুনু খাঁর সাথে ব্রিটিশদের বেশ কয়েকবার যুদ্ধ সংগঠিত হলে চাকমারা শিলক নদীর তীর ত্যাগ করে বাপ-দাদার বাস্তুভিটা ছেড়ে মাতামুহুরী নদীর তৈনছড়ির তীরে চলে যেতে বাধ্য হন। সেই সাথে শিবচরণের পরিবারও তৈনছড়ির তীরে চলে আসেন। সেখানে শিবচরণ তাঁর ভাবশিষ্য চিত্তঙ্যা ওরফে চিধংকে সঙ্গী হিসেবে পান। এতে তাঁর সাধনা আরও বেড়ে যায় এবং তিনি দিন রাত যে কোন সময় ধ্যানের জন্য বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যাওয়া শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি মর্ত্যলোক থেকে অন্তর্ধান করেন। আর কোনদিন ফিরে আসেননি। তবে অন্তর্ধানের আগে এক সন্ধ্যায় বন্ধুদের ডেকে তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থ 'গোঝেনলামা' অর্থাৎ 'ঈশ্বর নামা' পড়ে শোনান এবং কাব্যটি তাদের হাতে তুলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁর রচিত 'গোঝেনলামা' এতদঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়।

www.pathagar.com

কৃষ্ণ কিশোর চাকমা : কৃষ্ণ কিশোর চাকমা নান্ন্যেচরের মোনতলা নামক গ্রামে ১৮৯৫ সালে ১৮ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে স্নাতক পাশ করার পর ১৯২০ সালে অস্থায়ীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেন এবং ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে বিএবিটি পাশ করেন। তিনি একজন মহান শিক্ষাবিদ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত ছিলেন। তিনি পার্বত্যঞ্চলের সামন্তবাদী নেতৃত্বের সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তাঁর ধ্যান-ধারণা, দৃঢ় সংকল্প, দূরদর্শিতা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেন। উল্লেখ্য যে, এতদঞ্চলে তিনিই সর্বপ্রথম সকল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিদ্যালয় স্থাপন, শিশুদের স্কুলে পাঠাতে উদ্বুদ্ধকরণ, স্কুলের মঞ্জুরী, সরকারী সাহায্য আদায় ও শিক্ষক নিয়োগ, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন। মহাপ্রুম এমই স্কুল, খাগড়াছড়ি এমই স্কুল, রামগড় এমই স্কুল, পানছড়ি এমই স্কুল, দিঘীনালা এমই স্কুল ও তুলাবান এমই স্কুল স্থাপিত হয়। এসবের পাশাপশি তিনি জনগণকে সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করেন। ১৯১৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি গঠনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষায় অবদান রাখার জন্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক তাঁকে 'সম্মাননা ২০০১' প্রদান করা হয়। তিনি ১৯৩৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

কৃষ্ণ কিশোর চাকমা

বিরাজ মোহন দেওয়ান

www.pathagar.com

বিরাজ মোহন দেওয়ান : চাকমা সমাজের এই বরেণ্য ব্যক্তির জন্ম ১৯০১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। ১৯৫৯ সালে 'সরোজ আর্ট প্রেস' প্রতিষ্ঠা করে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকাশনা জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। ১৯৮০ সালের আগ পর্যন্ত সেটাই ছিল অত্র অঞ্চলের একমাত্র প্রেস। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর প্রেস থেকে মাসিক 'পার্বত্য বাণী' প্রকাশ করেন যা ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত চালু ছিল। তিনি সেই পত্রিকার ধারাবাহিকভাবে 'চাকমা জাতির প্রাচীন সভ্যতা', 'চাকমা জাতির পরিচয়', 'চাকমা জাতির প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস' প্রভৃতি ধারাবাহিক প্রবন্ধসমূহ লিখেছিলেন। বিরাজ মোহন দেওয়ান রচিত 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' চাকমাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের অন্যতম দলিল। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

চিত্রশিল্পী চুনিলাল দেওয়ান : তিনি ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১১ সালে পৈতৃক কর্মস্থল দীঘিনালা থানায় জন্ম এবং ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ সালে পরলোক গমন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র চাকমা সমাজে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী। তিনি ১৯৩৪ সালে গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট এন্ড ক্রাফট, কলকাতা ভারত হতে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, কবি, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেন। তাঁকে চাকমা ভাষায় প্রথম আধুনিক কবিতা রচনার পথিকৃৎ বলা যায়। জীবদ্দশায় বিভিন্ন সময়ে তিনি আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছিলেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ভারতের একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীক্ষাকালে তাঁরা ঘনিষ্ঠ হন। তাঁরা দুজনে যৌথভাবে বেশ কয়েকটি ছবিও এঁকেছিলেন বলে জানা যায়। ১৯৫৭ ও ১৯৯২ সালে তাঁর অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি নানিয়ারচর উপজেলার ৬০নং ছয়কুড়ি বিল মৌজা ও ৬১নং মাইচ্ছড়ি মৌজার হেডম্যান এবং নানিয়ারচর বাজারের বাজার চৌধুরী ছিলেন।

চিত্রশিল্পী চুনিলাল দেওয়ান

চিত্ত কিশোর চাকমা

www.pathagar.com

চিত্ত কিশোর চাকমা : ১২ ডিসেম্বর ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে নানিয়ারচরের ছোট মহাপ্রুম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে মহামুনি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি মহাপ্রুম এসই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি মাষ্টার দা সূর্য সেনের সহযোদ্ধা ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদনে তাঁর ভূমিকা ছিল। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'চাকমা জাতির জীবন স্মৃতি'। তিনি ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে উপসম্পদা গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু শীলবান ও ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষু ছিলেন। তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রী বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান : শ্রী বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান আনুমানিক ১৯১৯ সালে রাঙ্গামাটি জেলার বুড়িঘাটের মহাপ্রুমে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ম্যাট্রিকুলেট ছিলেন। চাকমা সাহিত্যে তিনি একজন শক্তিমান লেখক। নিরলস সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের আসন পাকাপোক্ত করেছেন। তিনি মূলত গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। তাঁর অসংখ্য গল্প, রূপকথা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি চাকমা রূপকথা ও লোককাহিনিগুলো সংগ্রহ করে তা পাঠকের কাছে তুলে ধরে চাকমা লোক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। দীর্ঘ কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রম করে তিনি একটি চাকমা অভিধান রচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি কয়েক হাজার চাকমা শব্দ সংযোজন করেছেন। সেই অপ্রকাশিত অভিধানটির পাণ্ডুলিপি স্বনামখ্যাত লেখক প্রয়াত ডা. ভগদত্ত খীসার কাছে ছিল। কিন্তু ডা. খীসার বাড়িটি নব্বইয়ের দশকে আগুনে পুড়ে গেলে সেই মূল্যবান অভিধানটিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অভিধানটি প্রকাশ করা সম্ভব হলে চাকমা শব্দ ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হতো। তাঁর 'চাকমা রূপকথা' এবং 'চাকমা জাতীয় বিচার পদ্ধতি ও চাকমা উত্তরাধিকার প্রথা' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ১৯৯১ সালের ২৫ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রী বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান

শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথের

শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথের : রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথের ১৯২০ সালের ২৩ নভেম্বর বিলাইছড়ির কুতুবদিয়ায় সম্ভ্রান্ত তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে ত্রিপিটক বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য বার্মা গমন করেন। রেঙ্গুনের কাসাইহেডা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পালি সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি অর্জন

www.pathagar.com

এবং ত্রিপিটক বিশারদ হিসেবে উপাধি লাভ করেন। ১৯৫৪-৫৬ সালে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে অন্যতম সংগীতকারক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে তৎকালীন চাকমা রাজা কর্তৃক রাজগুরু পদে বরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালে শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভান্তেকে উপসম্পদা প্রদানের সময় তাঁর নেতৃত্বে কর্ম্মবাচ্য পাঠ করা হয়। ষাটের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। আমেরিকা, ইউরোপ ও রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ৯৫ বছর বয়সে দীর্ঘ ৬৯ বছরের সফল প্রবজ্যা জীবন শেষে ৫ জানুয়ারি, ২০০৮ রাত ৯.৩০ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির : সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভান্তে ১৯২০ সালের ২৩ নভেম্বর মর্ত্যধামে আবির্ভূত হন। তিনি 'বনভান্তে' নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর গৃহী নাম ছিল রথীন্দ্র চাকমা। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সংসার জীবনের প্রতি উদাসীন এবং দুঃখমুক্তির অন্বেষায় ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রামের নন্দরকানন বৌদ্ধ বিহারে প্রবজ্যা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করে সত্যের সন্ধানে ব্যর্থ হন। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, লোকালয়ে অবস্থান করে দুঃখমুক্তি সম্ভব নয়। একই বছরে তিনি রাঙ্গামাটি সদরের আওতাধীন থনপাদাতে ফিরে আসেন এবং তথায় শীল- সমাধি-প্রজ্ঞা সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ধনপাতায় দুর্ভেদ্য বনাশ্রমে তপস্যাকালে তিনি 'রথীন্দ্র শ্রমণ' নামে নামে পরিচিত ছিলেন এবং সে সময় থেকেই তার লোকত্তর ধ্যান সাধনা হেতু পার্বত্যাঞ্চলের ধর্মরাজ্যে এক কিংবদন্তির সৃষ্টি করেন। কাপ্তাই বাঁধের জলে তাঁর বনাশ্রম নিমজ্জিত হওয়া পর্যন্ত তিনি ধনপাদাতেই অবস্থান করেন। এরপর ১৯৬০ সালে তিনি মাইনীর দীঘিনালায় চলে যান। ১৯৭১ সালে চলে আসেন লংগদুর তিনটিলায়। তিনি ১৯৭৬ সালে বর্তমান রাঙ্গামটির রাজবন বিহারে চলে আসেন। তাঁর সাধনালব্ধ লোকোত্তর আচরণ, ত্রিকালের সীমানায় কালাতীত ঋদ্ধির বহিঃপ্রকাশ, অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর প্রতি অবারিত কৃপা বিতরণ, ভক্তাবাঞ্ছা কল্পতরুর ন্যায় সকলের কামনা পূরণ এবং অহর্নিশ লোকোত্তর ভূমিতে অতলস্পর্শী সমাধিতে নিমগ্ন থাকা– এসব তাঁর অরহত্বের পরিচায়ক। এতদঞ্চলে তিনিই সর্বপ্রথম চিরাচরিত ধর্ম আচরণের বদলে তথাগত গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত লোকোত্তর সাধনার ধারা প্রবর্তন করেন। গত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে সকল ভক্ত, অনুসারী তথা সারাবিশ্বের ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে তিনি ইহলোক (পরিনির্বাণ লাভ) ত্যাগ করেন।

অশোক কুমার দেওয়ান : অশোক কুমার দেওয়ান ১৯২৬ সালে বর্তমান মগবান ইউনিয়নের বড়াদাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্নাতক (বি.এ) পাশ করার পর ১৯৫৪ সালে নিজ গ্রামে জুনিয়র হাই স্কুলে সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ১৯৫৫ সালে খাগড়াছড়ি হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি তৎকালীন উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (উসাই) এ পরিচালক পদে যোগদান করেন। সেখান থেকে ১৯৮৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি চাকমা জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করেন। এ যাবতকালের

www.pathagar.com

চাকমা সমাজে প্রচলিত চাকমা জাতির বিভিন্ন তথ্য ও সূত্রগুলির দুর্বলতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে তিনি প্রথম সন্দেহ পোষণ করেন।

চাকমাদের ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য ভাষার বিবর্তন ও বিশ্লেষণের উপর জোর দেন। 'চাকমা জাতির ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক' এবং 'চাকমা ভাষার শব্দকোষ' এবং নৃ-তত্ত্বের আলোকে 'পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি' শীর্ষক প্রবন্ধ উসাই-এর গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৮ ও ১৯৮২ সালে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হলো 'চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার' এবং 'চাকমা ভাষার শব্দকোষ'। আদিবাসী ভাষা বিশেষত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ভাষায় শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। লেখালেখি গবেষণার পাশাপাশি তিনি সমাজ হিতৈষী কাজের সাথেও জড়িত ছিলেন। সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে আর্থসামজিক উন্নয়নের জন্য খাগড়াছড়ির খবংপুরিয়ায় স্বনির্ভরগ্রাম গড়েছিলেন। এজন্য তিনি ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি পদকেও ভূষিত হন। তিনি ১৯৯১ সালে ৯ জুলাই মৃত্যু বরণ করেন।

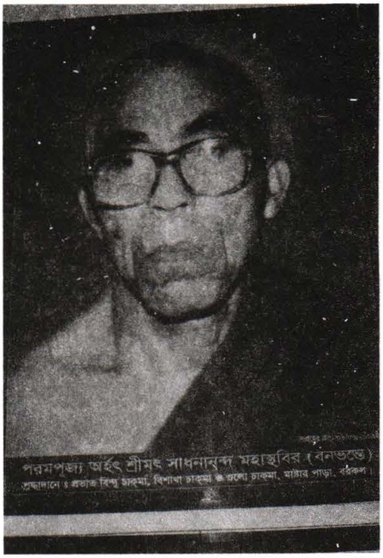

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভান্তে

সলিল রায়

সলিল রায় : সলিল রায় ১৯২৮ সালের ২৭ জুন পুরাতন রাজবাড়ি এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৫১ সালে চাকমা রাজার কার্যালয়ে ম্যানেজার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি Times of India পত্রিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে সহকারী ব্যবস্থাপক এর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তারও পরে ১৯৬২ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরি করেন।

www.pathagar.com

তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, নাট্যকার ও গবেষক ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী চুনীলাল দেওয়ানের পর তিনিই আধুনিক কবিতা লেখেন। যদিও তিনি খুব বেশি চাকমা কবিতা লেখেননি তাঁর লেখা সেই সময় বিভিন্ন বিদেশি পত্র পত্রিকায়ও ছাপা হয়। তাঁর রচিত বিভিন্ন নাটক বেতারে প্রচার ও মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে। তিনি ১৯৮১ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

বকুল বালা দেওয়ান : বকুল বালা দেওয়ান ১ জানুয়ারি ১৯২৮ সালে রাঙ্গামাটি জেলার ঝগড়াবিল মৌজায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিকুলেশন ও ১৯৮৪ সালে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করেন। তিনি ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষিকা পদে যোগদান করেন। তিনি একই বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি অবসর গ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে তিনি প্রথম ইন্টামেডিয়েট পাশ করা নারী। তাঁকে অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে অনেক আদিবাসী নারী সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন। শিক্ষায় অবদান রাখার জন্য তাঁকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ২০০১ সালে সম্মাননা ২০০১ প্রদান করা হয়। তিনি রাঙ্গামাটি জেলার অন্যতম খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব প্রয়াত শান্তিময় দেওয়ান এর সহধর্মিনী এবং প্রাক্তন উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান এর মাতা। তিনি ২০ জুলাই ২০০৮ সালে রাঙ্গামটিতে দেহত্যাগ করেন।

বকুল বালা দেওয়ান

শহীদ শুক্কুর আলী

বিমলেন্দু দেওয়ান : বিমলেন্দু দেওয়ান চল্লিশের দশকে রাঙ্গামাটির ঝগড়াবিল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত Rehabilitation বিভাগে Welfare Officer হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিমলেন্দু দেওয়ান চাকমা সংগীতের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। সত্তরের দশকে তিনি অনেক চাকমা গান রচনা ও সুরারোপ

www.pathagar.com

করেন। চাকমা সংগীতের প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী শ্রী বিমলেন্দু দেওয়ান ধলাচান নামেই অধিক পরিচিত। এ বিরল প্রতিভাধর শিল্পী ১৯৮০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পরলোকে পাড়ি দেন।

বিপুলেশ্বর দেওয়ান : শিক্ষানুরাগী এই ব্যক্তির জন্ম ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর বর্তমান জুরাছড়ি থানাধীন বনযোগীছড়ায়। তিনি ১৯৩৫ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর ১৯৩৭ সালে জয়েন্ট বেঙ্গল বোর্ড এর অধীনে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করেন। বিপুলেশ্বর দেওয়ান ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম কলেজ হতে বিএ (অনার্স) পাশ করেন। অতঃপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এমএ পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। পরে এই পরীক্ষায় আর তাঁর অংশ গ্রহণ করা হয়নি। ছাত্রজীবন সমাপ্ত হলে তিনি দিল্লীর মিলিটারি হেড কোয়ার্টার, কলকাতা কাস্টমস্, সিভিল সাপ্লাই বিভাগে চাকুরি করেন। ১৯৪৫ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৪৭ সালে তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করে। চাকুরি থেকে বরখাস্ত হবার পর জীবিকার তাগিদে তিনি বিভিন্ন ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। পরে তিনি ব্যবসা ছেড়ে ছাত্রছাত্রী পড়ানোর (প্রাইভেট টিউশন) কাজে নিয়োজিত হন। তাঁর কাছ থেকে পাঠ নেওয়া অনেক ছাত্র-ছাত্রী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত উপেন্দ্র লাল চাকমা, ড. নিরু কুমার চাকমা (ঢাবি), প্রাক্তন এডিশনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার অমলেন্দু বিকাশ চাকমা, কানাডার ওয়েস্টার্ন অন্টারিও ইউনি ভার্সিটি এর ভাইস চ্যান্সেলর ড. অমিত চাকমা, ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা (ঢাবি), প্রাক্তন উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান, চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক প্রশান্ত ত্রিপুরাসহ আরো অনেকে। একসময় তিনি লেখালেখিও করতেন। ছাত্রজীবনে 'প্রগতি' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন (১৯৩৭/৩৮)। এ নিভৃতচারী শিক্ষাগুরু বার্ধক্য জনিত নানান রোগে জর্জরিত হয়েও দীর্ঘদিন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অনুরোধে প্রাইভেট টিউশন অব্যাহত রাখেন। এ শিক্ষায় অবদান রাখার জন্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক তাঁকে 'সম্মাননা ২০০১' প্রদান করা হয়। ২০05 সালের ২৫ মে ৮৯ বছর বয়সে নিজ বাসভবনে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার দক্ষিণ কালিন্দিপুরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাংতোয়াজল পাংখোয়া (কার্বারী) : সাংতোয়াজল পাংখোয়া আনুমানিক ১৯৩০ সালে বর্তমান জুরাছড়ি থানাধীন লোংজিয়াক পাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। অল্প শিক্ষিত হলেও পাংখোয়া সমাজের জন্য তাঁর অবদান খাটো করার নয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ১৯৬৭ সালে নিজ উদ্যোগে তিনি নিজের গ্রাম লোংজিয়াক পাড়াতে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজ থেকে তিনি

www.pathagar.com

বেতন পরিশোধ করতেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনা। তিনি একটি সাংস্কৃতিক দলের নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর দল ঢাকাতে বহুবার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে।

যামিনী রঞ্জন চাকমা : কর্ণফুলি হ্রদে তরিয়ে যাওয়া লংগদু তুলাবান গ্রামে চাকমা সাহিত্যের এই খ্যাতিমান লেখক ১৯১৩ সালে ৭ ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তুলাবান গ্রামের প্রথম বৃত্তিধারী (১৯৩২), প্রথম মেট্রিকুলেশান (১৯৩৬), প্রথম সরকারী চাকুরিজীবী (১৯৪২), প্রথম গেজেটেড অফিসার (১৯৬৮) ও প্রথম সরকারী পেনশনার (১৯৬৯) ছিলেন। তাঁর লেখা বহু কথিকা চট্টগ্রাম বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে শিবচরণ, কালিন্দি রাণী, রাজর্ষি, সাধেংগিরি, লক্ষী পালা, চাকমা সমাজে বৌদ্ধ ধর্মেও প্রভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রধান সাহিত্য কর্ম 'চাকমা দর্পন' চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর অনেক লেখা অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়ে গেছে। সমাজ সচেতন এই লেখক তাঁর জীবনের পুরোটা সময় ব্যয় করেছিলেন চাকমা সমাজের সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজে। আদিবাসী সমাজের প্রচলিত নানাবিধ কু-সংস্কার আর অসঙ্গতি তিনি তাঁর চমৎকার লিখনশৈলীর মাধ্যমে সব সময় তুলে ধরেছেন। ধর্ম আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল তার প্রভূত অবদান আর উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই গুণী মানুষটি ২৫ অক্টোবর ১৯৯৭ সালে তাঁর রাঙ্গামাটির নিজ বাসভবনে মৃত্যু বরণ করেন।

শহিদ শুক্কুর আলী : মুক্তিযুদ্ধে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা তথা বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে শহিদ শুক্কুর আলী এক বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম। ১৯৫০ সালের ১০ মার্চ তিনি রাঙ্গামাটি সদরের তবলছড়ি এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি খেলাধুলা ও নান্দনিক কাজের প্রতি প্রবল আগ্রহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তিনি রাঙ্গামাটির ঐতিহ্যবাহী শাহ্ উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে নিজের পরিচিতি তুলে ধরেন। তার পিতা মরহুম দেলোয়ার হোসেন পার্বত্যাঞ্চলে নৃত্য ও যন্ত্রসংগীতের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রথমে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সীমানা পেরিয়ে ভারতে চলে যান। প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে এসে তিনি সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি বেশকিছু যুদ্ধে দুঃসাহসিকতার সাথে পাকিস্তানি সৈন্যদের মোকাবিলা করেন। এধরনের একটি সম্মুখযুদ্ধে ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ মহালছড়িতে হানাদার বাহিনীর গুলির আঘাতে তিনি শহিদ হন। মুক্তিযুদ্ধে তার অনন্য অবদানের স্বীকৃতি আর তাঁর স্মৃতিকে চির জাগরুক করে রাখাতে তার বন্ধু, সহযোদ্ধারা প্রতিষ্ঠা করেন ঐতিহ্যবাহী শুক্কুর ক্লাব। রাঙ্গামাটি শহরের রিজার্ভ বাজার এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পার্শ্বে এটি অবস্থিত। রাঙ্গামাটির মানিকছড়িতে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তার নামে স্মৃতি ফলক স্থাপন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তথ্যসহায়ক

১. বাংলাদেশের আদিবাসী : এথনোগ্রাফিয় গবেষণা, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ৬২ প্রবাল হাউজিং, রিংরোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, গবেষণা ও সম্পাদনা : মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খবশী, পল্লব চাকমা, মংসিংঞো মারামা ও হেলেনা বাবলি তালাং
২. রাঙ্গামাটি : বৈচিত্র্যের ঐকতান, জেলা প্রশাসন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, প্রকাশ কাল- পহেলা বৈশাখ ১৮১১. চৌদ্দ এপ্রিল ২০০৪
৩. চাকমা জাতি, শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ
৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, সুগত চাকমা, প্রকাশনায়- গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা, প্রকাশ কাল- ২০০৯, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি
৫. চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, লেখক- বিরাজ মোহন দেওয়ান
৬. মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম, শরদিন্দু শেখর চাকমা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৬
৭. মি. সুনীল কান্তি দে, পার্বত্যাঞ্চল প্রতিনিধি, দৈনিক সংবাদ ও সভাপতি, রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাব
৮. মি. আব্দুল মামুন, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, রাঙ্গামাটি
৯. মি. তসলিম উদ্দিন, উপজেলা শিক্ষা অফিস, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি
১০. এড. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, বিশিষ্ট আইনজীবি ও প্রাক্তন সদ্য স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি
১১. মি. সুনীতি বিকাশ চাকমা, সমাজ কর্মী, রাঙ্গামাটি
১২. মি. প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, প্রাক্তন উপ সচিব, রাঙ্গামাটি
১৩. প্রফেসর মংশানু চৌধুরী, বিশিষ্ট লেখক ও উন্নয়ন গবেষক
১৪. মি. তারা চরণ চাকমা, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, রাঙ্গামাটি

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

চাকমা লোককাহিনি

ধ'বি আর ক'বি : অনেক অনেকদিন আগে, এক ছিল বুড়ো আর এক ছিল বুড়ি। তাদের ছেলে নেই, একটি মাত্র মেয়ে। মেয়েটি পরীর মতই সুন্দর ফুটফুটে চেহারা। অনেকদিন পর বুড়ো বয়সে যখন মেয়েটি কোলে এল তারা খুব খুশি। আদর করে মেয়েটির নাম রাখল ধ'বি।

বুড়ো আর বুড়ি জুম করে। মেলাই ধান ফলে জুমে। তারা খেয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া তিল, কার্পাস, কুমড়ো, মারফা, চিনার এ সব ফল ফলাদি তো আছেই। এক কথায় বুড়ো বুড়ির খুব সুখের সংসার। কিন্তু সেই সুখ তাদের কপালে আর জুটলো না। বুড়ো বুড়ির সংসারে হঠাৎ একদিন কালো মেঘ দেখা দিল। নেমে এলো তাদের দুঃখের দিন।

বুড়ো বুড়ি একদিন জুমে গেছে নিড়ানি দিতে। ধানের চারাগুলো সবে সবুজে ভরে উঠেছে। এ সময়টায় একবার ভালভাবে নিড়ানি দিতে পারলে পরে জুমে আর আগাছা বাড়তে পারবে না। আর ধানের ফলনও হবে বেশি।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বুড়ো আর বুড়ি জুমে আগাছা পরিষ্কার করে। চারিদিকে খাঁ খাঁ রোদ্দুর। আশেপাশে কোথাও ছায়াটুকু পর্যন্ত নেই। যে কটা গাছ জুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, সে গুলোর একটা পাতা পর্যন্ত নেই। জুম পোড়ার সময় সব পাতা পুড়ে গিয়ে মাটিতে ঝরে পড়েছে। পাতা গজাতে এখনও অনেক দেরি।

বুড়ি বলে বুড়োকে, চল না একটু জল খেয়ে আসি। ভারী তেষ্টা পেয়েছে।

বুড়ো বলে... আরে একটু সবুর কর! এ পাশটা একটু পরিষ্কার করে নিই আগে। দেখছো না কি রকম আগাছা বেড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করতে না পারলে ধানের চারাগুলো যে বেড়ে উঠবে না।

বললে কি হবে? এদিকে বুড়োর নিজেরই খুব তেষ্টা পেয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করে ছুটলো তারা একটু জলের খোঁজে।

কিন্তু কোথায় জল! জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঠ ফাটা রোদ্দুরে ছোট ছোট ছড়া নালার জল সব শুকিয়ে আছে। অন্যান্যদিন তারা ঘর থেকে 'কত্তি'তে (কত্তি হচ্ছে মাটির তৈরি জগ) ভরে খাবার পানি নিয়ে আসে। আজ আনা হয়নি তাই মহা ঝামেলা হয়েছে।

খুঁজতে খুঁজতে একসময় বুড়ি দেখতে পেল একটা ঠাণ্ডা মত জায়গা। মনে হয় আগে ওখানে জলাধারই ছিল। আশে পাশে হরিণের অনেকগুলো পায়ের ছাপ, আর

www.pathagar.com

কিছুটা জল জমে রয়েছে সেগুলোর খাঁজে খাঁজে। ভীষণ তেষ্টায় বুড়ি ঐ জলটাই শুষে খেয়ে নিল। কিন্তু তাতে তার গলাটা পর্যন্ত ভিজল না। তেষ্টা মেটানো তো দূরে থাক বরং তাতে আরো তেষ্টা দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

এদিকে বুড়ো খুঁজে পেয়েছে একটা কাঁকড়ার গর্ত। ভেতরে বেশ পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি। মহা খুশিতে বুড়ো আঁজলা ভরে জল খেতে যাবে, এমন সময় বুড়ি এসে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল... বুড়ো আমাকে একটুখানি খেতে দাও না!

তখন বুড়োর নিজেরই তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এসময় বুড়ি এসেই বাগড়া দিতেই বুড়ো আচমকা চেঁচিয়ে উঠল... "দুর হ! দুর হ! দুর হ!"

চাকমা ভাষায় 'দুর' বললে কচ্ছপকেই বোঝায়। তখন সময়টা ছিল 'সত্যকাল' মানে সত্যযুগ, তখন মুখের কথা সত্যি হয়ে ফলে যেত। আর তাই বুড়ো 'দুর হ' বলার সাতে সাথেই অবাক কাণ্ড! দূরে যাওয়ার বদলে সত্যি সত্যি বুড়ি এক মস্ত বড় 'দুর' অর্থাৎ কচ্ছপ হয়ে গেল। তখন ঐ কচ্ছপটা জলের খোঁজে যেতে যেতে তাদের বাড়ির পাশের নদীতেই চলে গেল।

বুড়ো আর জল খাবে কি! তার মুখের বাক্যি বন্ধ হয়ে গেল, চোখের সামনে এতবড় একটা তাজ্জব ঘটনা ঘটতে দেখে। কি বলতে কি ঘটে গেল চোখের পলকে! ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বুড়ো কপাল চাপড়ে বুড়ির শোকে ডুকরে কেঁদে উঠলো... হায়! হায়! এ কি করলাম...

বুড়িকে হারিয়ে বিলাপ করতে করতে একসময় বুড়ো নিজের বাড়িতে ফিরে গেল। এদিকে বাবাকে একা ফিরে আসতে দেখে মেয়েটি দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল... বাবা! মা কই?

মেয়ের কথা শুনে আবার দ্বিগুণ শোকে জ্বলে উঠল বুড়োর বুক। ছোট্ট মেয়েটি কখনও মায়ের কাছ ছাড়া হয়নি কোনদিন। এখন বুড়ো মেয়েটিকে কিভাবে বোঝাবে? মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে পাষাণে বুক বাঁধল বুড়ো। ছল করে মেয়েকে বলল, আসবে রে আসবে! তোর মা বিকেলে আসবে।

মেয়েটি আশ্বস্ত হলো বটে, কিন্তু মাকে কাছে না পেয়ে সারাদিন উসখুস করে কাটাল। বেচারি ঘন ঘন বাইরে তাকাতে যায় সারাক্ষণ, এই বুঝি মা এল! ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, কিন্তু মা আর ফিরে আসে না।

মেয়েটি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। বাবার কাছে গিয়ে বাবার পিঠে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বাবাকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কখন মা আসবে?

এদিকে মেয়ের দুঃখ দেখে বাবাও চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না। পরম স্নেহে মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে বার বার বোঝাতে লাগল মেয়েকে, কাঁদিস না মা! কাঁদিস না! তোর মা নিশ্চয় আসবে কাল সকালে। বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে কোনরকমে মেয়েকে শান্ত করল বুড়ো। আনারি হাতে রান্না করে মেয়েকে খাওয়াল আর নিজেও কিছু মুখে দিল। তারপর মেয়েটিকে বুকে নিয়ে শুতে গেল বিছানায়।

পরদিন সকাল না হতেই আবার বায়না ধরল মেয়েটি মা'র কাছে যাবে বলে। নিরুপায় হয়ে অবশেষে মেয়েকে নিয়ে নদীর ঘাটে চলে গেল বুড়ো। তারপর এক এক

www.pathagar.com

করে খুলে বলল মেয়েকে সব কথা। শেষে বলল, দেখ! তোর মা কচ্ছপ হয়ে আছে এই নদীর জলে সে আর কখনও ফিরবে না। পানিতেই থাকতে হবে তাকে।

বাবার কথা শুনে মাটিতে আছড়ে পড়ল মেয়েটি। হু হু করে কাঁদতে লাগল মায়ের শোকে। মেয়ের কান্না শুনে হঠাৎ ভু-স করে ভেসে উঠল কচ্ছপটি। পানির উপর গলা বাড়িয়ে মেয়েকে ডেকে বলল, কাঁদিস না মা! কাঁদিস না! কপালের লিখনে আমি কচ্ছপ হয়ে আছি, ঘরে ফেরার কোন উপায় নেই, মিছেমিছি কেঁদে নিজেকে দুঃখ দিস না। তোর যখনি আমাকে দেখতে ইচ্ছে করবে, ঘাটে এসে হাততালি দিলে আমি যেখানেই থাকি তোকে দেখতে আসব। মায়ের কথায় শান্ত হয়ে মেয়েটি ঘরে ফিরে এল। সেই থেকেই মেয়েটি মায়ের কথা মনে পড়লে নদীর ধারে এসে হাততালি দেয়, আর সাথে সাথে কচ্ছপটি ভেসে ওঠে জলের উপর। তীরের কাছে এসে দেখা দিয়ে যায় মেয়েকে, এবং নানা উপদেশ দিয়ে যায়।

এমনি করে দিন চলে যেতে লাগল।

বুড়িকে হারিয়ে বুড়ো একেবারে একলা হয়ে গেল। একা একা জুম করা আর হলো না। বড় কষ্টে পড়ে গেল মেয়েটিকে নিয়ে। তবে বেতের কাজ ভালোয় জানত বুড়ো। যেমন করেই হোক কাজ একটা করে খেতেই তো হবে। তাই বন থেকে বাঁশ কেটে বেত বানিয়ে কুলো, টং, থুরুং ইত্যাদি তৈরি করে সারা গাঁয়ে ফেরি করে বিক্রি করতে লাগলো।

ভাত দিবে জরা জরা,
তোন দিবে থরা থরা
টং, কুলো লভানি মা বোন পাড়া?
(ভাত দিও মুঠো ভরা,
তরকারি দিও থোরা থোরা
টং, কুলো নেবে কি...
মা বোন পাড়া?)
বাবা মেয়েকে নিয়ে এভাবে দিনাতিপাত করতে লাগল।

ভিন্‌গাঁয়ে থাকত এক বুড়ি। অনেক দিল হলো তার স্বামী মারা গেছে। একটি মাত্র মেয়ে নিয়ে তারও দিন গুজরান চলছে কোনমতে। মেয়ের নাম ক'বি। বুড়োর মেয়ে ধ'বি'র প্রায় সমান বয়সী। বুড়ো যখন ফেরী করার জন্য তাদের গ্রামে গেল, ঐ বুড়ির খুব পছন্দ হয়ে গেল বুড়োকে। কি করে বুড়োর মন ভোলানো যায়, সেই চেষ্টা করতে লাগলো বুড়ি তখন থেকেই। সেই রাস্তা দিয়ে বুড়োকে যেতে দেখলেই তার ঘরে ডেকে বসায় বুড়ি। ঠাণ্ডা জল এবং নানারকম খাবার খাওয়ায়। পাশে বসে পাখায় বাতাস করতে করতে সুখ দুঃখের গল্প করে দুদণ্ড সময় কাটায় তার সঙ্গে। বুড়ি বলে... আহা বুড়ো! তোমার তো ভীষণ কষ্ট! তোমার ঘরে আমার মত একটা বুড়ি থাকলে নিশ্চয় আসতে দিত না এই ভর রোদ্দুরে।

আর কোন কোন দিন বুড়ি বলে,– আহা বুড়ো! তোমার কষ্ট আর চোখে সয় না। সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে ভারী ধকল গেছে শরীরে. সন্ধ্যেও ঘনিয়ে এল, আজ না হয় থেকেই যাও এখানে!

www.pathagar.com

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে,– না না আজ থাকবো না। আমার অবুঝ মেয়েটা বাড়িতে একলা আছে। দিনে যাই হোক সন্ধ্যে হলেই কেঁদে ভাসিয়ে দেবে।

আরেকদিন বুড়ি একেবারেই চেপে ধরল বুড়োকে তার বাড়িতে রাখার জন্য। অন্যান্য দিনের মত বুড়ো আপত্তি জানাতে বুড়ি তাকে বলল,– মেয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাকে। এইতো পাশাপাশি গ্রাম, আমারও তো একটা মেয়ে আছে। এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমার মেয়েকে তোমার মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য। এ দিন বুড়োর কোন আপত্তিই আর টিকলো না। বুড়োর টং, কুলো যেগুলো বিক্রি হয়নি, একেবারে ঘরের ভিতর নিয়ে লুকিয়ে রাখল বুড়ি। যাতে বুড়ো পালাতে না পারে। তারপর বুড়ি মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিল বুড়োর মেয়েকে আনতে।

রাতে খাবার জন্য একটা মুরগি জবাই করে দিল বুড়ি। তারপর ভাল করে রান্না করে খুব যত্ন করে বুড়ো এবং তার মেয়েকে খেতে দিল বুড়ি। মেয়েকে নিয়ে নিজেও খেল। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, বুড়ি চুপিসারে নিজের কাপড়ের সাথে বুড়োর কাপড়ে একটা গিট্টা দিয়ে দিল, তারপর বুড়োর পাশে শুয়ে পড়ল। এদিকে ভোর না হতেই কি করে জানি বুড়ির কাণ্ড টের পেয়ে বাড়ির মোরগটা ডানা ঝেড়ে ডেকে উঠল,–

"কক্ ক্ রে কক্!
বুজ্যালোই বুড়ি জদন বান্যনদে জক্ রে জক্"
(কক্ রে কক্!
বুড়ো আর বুড়ি গিট্টা বেঁধেছে দেখ রে দেখ!)

ঘুম ভাঙতেই কপট রাগে বুড়ি মোরগটাকে শাসাল,– পাজি মোরগ, দাঁড়া! ভোর হলে তোকে জবাই করছি। এদিকে বুড়োরও তখন ঘুম ভেঙেছে। ঘুম থেকে উঠে বুড়ো দেখে সত্যি সত্যি বুড়ির সাতে তা গাট্টা বাঁধা হয়ে আছে। আর বুড়িও যেন আকাশ থেকে পড়ল একেবারে বলল,– ও মা! একি কাণ্ড বুড়ো! গাট্টা বাঁধল কে? ছি! ছি! ছি! এখন বিয়ে না হলে গামে মুখ দেখায় কি করে? আর মেয়ে দুটোই বা বলবে কি? ফাঁদে পড়ে বাধ্য হয়ে বুড়িকে বিয়ে করতে হল বুড়োর। বিয়ে করে বুড়ো একেবারে নিজ বাড়িতেই নিয়ে এল বুড়িকে।

এরপর শুরু হলো বুড়োর মেয়ের আসল দুঃখের দিন। বুড়োর বাড়িতে আসতেই নিজের আসল মূর্তি ধারণ করল বুড়ি। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেতে লাগল বুড়ির হিংসুটেপনা। বুড়োর মেয়ে তো সতীনের মেয়ে। বিষ নজর পড়ে গেল বুড়োর মেয়েটির উপর। তাকে দিয়ে সংসারের সব ধরনের কাজ করাতে লাগলো বুড়ি। জল আনা থেকে শুরু করে হাঁড়ি কুঁড়ি এঁটো বাসন মাজা পর্যন্ত। কাজে একটু গাফিলতি দেখলে মারমুখি হয়ে শাঁসিয়ে উঠে বুড়ি। এ যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কষ্ট হলেও বুড়োর মেয়ে কাজ করে যায় প্রাণপণে। বুড়ির ভয়ে তার কষ্টের কথা বাবাকেও কিছুই বলতে পারে না। যখন খুব বেশি অসহ্য লাগে তখন নদীর ঘাটে গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে বসে। আর অমনি তার কান্না শুনে ভু-স করে জলের উপর ভেসে ওঠে তার কচ্ছপ মা, এবং কুলের পাড়ে এসে মেয়েকে বোঝায়, – কাঁদিস না মা! কাঁদিস না! সহ্য করে যা! এ সবই কপালের লেখন, বলে ডুব দিয়ে আবার পানি গভীরে চলে যায় তার কচ্ছপ মা।

www.pathagar.com

এক সময় বুড়ি জানতে পারে তার সতীনের কথা, তার সতীন এখনও কচ্ছপ হয়ে বেঁচে আছে নদীতে। নদীর ধারে গিয়ে বুড়ো আর তার মেয়ে ডাকলে পরে জলের উপর ভেসে উঠে তাদেরকে দেখা দিতে আসে। এ সব জানতে পেরে হিংসায় জ্বলে যায় বুড়ি। আর সতীনে মাংস চিবিয়ে খাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। কচ্ছপটাকে ধরার জন্য নানারকম ফন্দি ফিকির আটল বুড়ি। লোকজন লাগিয়ে নদীর উজানে পেতে রাখল সারি সারি সব চাঁই। ভাঁটিতে বসাল একসার টেরা, আর নদীর দুধারে ফেলে রাখল মেলাই বঁড়শির টোপ। বুড়ির মতলব বুঝতে পেরে বুড়োর মেয়ে ধ'বি এক ফাঁকে গিয়ে আগে ভাগে মা'কে হুশিয়ার করে দিল এভাবে,–

ও..ও.. মা!
উগুরেদি গেলে চেইয়্যত্ বাঝিবে,
লামন্যে গেলে টেরাত্ বাঝিবে,
কুলো কায় এলে বজ্জিত্ বাঝিবে,
মধ্যে মধ্যে থাক।
(হেই...ই মা!
উজানে গেলে চাঁই তে পড়বে,
ভাঁটিতে গেলে টেঁরায় আটকাবে,
কূলের কাছে আসলে বঁড়শীতে গাঁথবে,
নদীর মাঝখানে থাকো।)

সময় মত মেয়ের হুঁশিয়ারী পেয়ে কচ্ছপটি আর ধরা পড়ে না। এমনি করে নিরাশ হতে হতে বুড়ি আরো একবারেই ক্ষেপে রইল। কচ্ছপটি না যেতে পারে উজানে, না ভাটিতে, কূলের পাড়ে গেলেও মহাবিপদ। সবসময় ধরা পড়ার ভয়। চড়ে বড়ে খাওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল তার। কিন্তু এমন করে আর কাঁহাতক না খেয়ে থাকা যায়। বেশ কিছুদিন না খেয়ে থাকার পর ক্ষিধের জ্বালায় একদিন কুলের কাছে চড়তে এল কচ্ছপটা। আর অমনি টুপ করে বঁড়শিতে গেঁথে গেল। তখন বুড়ির খুশি আর কে দেখে। এতদিনে শত্রু ধরা পড়েছে। হুড়মুড় করে সে কচ্ছপটাকে ডাঙায় টেনে তুলে বাড়িতে বয়ে নিয়ে এল, আর বুড়োর মেয়েকে হুকুম দিল, আগুনে পুড়ে পরিষ্কার করে কেটেকুটে আনতে।

বুড়োর মেয়ে এসব দেখে একেবারেই থ বনে গেছে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। সৎমার হুকুম, না বলারও কোন উপায় নেই। শেষে বাধ্য হয়ে মেয়েটি আগুন জ্বালাল উঠোনের একপাশে, আর কচ্ছপটাকে পোড়াতে নিয়ে গেল সেখানে। আর এদিকে বুড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল মহা আহলাদে। মেয়েটি পড়ে গেল মহাবিপদে, কচ্ছপ হলেও তার মা, ভেবে পায় না কোনদিক থেকে পোড়াবে! পিটের দিকটায় একটু শক্ত বেশি কিন্তু সেদিকটা আগুনে দিতে গেলে সবার আগে মুখটা চোখে পড়বে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে প্রথমে বুকের দিকটায় আগুনে দিল মেয়েটি। তাপ লাগার সাথে সাথে উঁ-হু-হু করে ধড়ফড়িয়ে উঠে মেয়েকে বললো কচ্ছপটি,–

www.pathagar.com

ও... ও... মা!
এ বুগ'তুন দুধ হাবেনেই তরে দাঙর গোজ্জ্যং,
তুই ম' বুক্কো কিত্যেই আগুনোত দোর?
(হেই...ই মা!
এই বুকের দুধ খাইয়ে তোকে বড় করেছি,
আমার বুকটা কেন পোড়াচ্ছো?)

শিউরে উঠে মেয়েটি তাড়াতাড়ি কচ্ছপটাকে উল্টে দিল তার পিঠের দিকে। এবারও কচ্ছপটা ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে মেয়েকে বললো,–

ও... ও... মা!
এ পিধিত্ বুগিনেই তরে কধক লোই বেরেয়্যং
ম' পিত্তান কিত্যেই আগুনোত দোর?
(হেই... ই.. মা!
এই পিটে করে তোকে কত ঘুরিয়েছি,
আমার পিটটা কেন পোড়াচ্ছো?)

কচ্ছপটার কাতরানি সইতে না পেরে মেয়েটি একবার এপিট একবার ওপিট করে পোড়াতে পোড়াতে একসময় ছটপট করে মরে গেল কচ্ছপটি। এই ছটপটানি দেখে বুড়িতো মহাউল্লাসে হেঁসে কুটিকুটি মনে মনে বলে হোক না কচ্ছপ, সতীন তো সতীনই, শত্তুর। মরুক! শত্তুরকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। মেয়েটি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে কেটেকুটে ভাল করে ধুয়ে কচ্ছপটির মাংস এনে দিল বুড়ির কাছে। বুড়ি মহাখুশিতে রান্না করার জন্য মাংসটিকে উনুনে দিল। তাপ পেয়ে মাংসের ঝোল তখন টগবগিয়ে ফুটছে। অমনি হাঁড়ির ভেতর থেকে হাঁড়ি গলা করে কে যেন বলে উঠলো,–

ববগ্ ববগ্ সদিনো মাধা হাং,
ববগ্ ববগ্ সদিনো মাধা হাং।
(টগবগ্ টগবগ্ সতীনে র মাথা খাই।)

এ কাণ্ড দেখে বুড়ি ভয়ে আঁতকে উঠলো! চোখ কপালে উঠে গেল। কি অলুক্ষুণে কাণ্ড! মরে গিয়েও সতীন তাকে খেতে চাচ্ছে! রান্না করা কচ্ছপের মাংসটা আর খেতে সাহস করলো না বুড়ি। না জানি কি হয়ে যায়? ভয়ে মাংসটা সে ফেলে দিয়ে এল আস্তাকুঁড়ে। কিছুদিন চলে যেতেই দেখা গেল একখানা লাউশাকের চারা গজিয়েছে সেখানে। বুড়োর মেয়ে সেটাকে খুব যত্ন সহকারে পরিচর্যা করতে লাগলো। দেখতে দেখতে সেই লাউশাকের চারাটি আরো ভালভাবে বেড়ে উঠে পুরো রান্নাঘরের চালটি ঢেকে ফেললো। ফুল ফুটলো, লাউয়ের কুড়িও দেখা দিল। একসময় লাউ হয়ে সেটা বাড়তে বাড়তে ঘরের চালা থেকে দরজার ঠিক মাঝখানে ঝুলে পড়লো। দিনে দিনে সেটা বাড়তে থাকলো। রোজ সকালে বুড়ি যখন ঘর থেকে বেরুতে যায় তখন বুড়ির মাথার সাথে ঠিক কপালের মাঝখানে বারি খায়, এবং ভেতরে ঢোকার সময়ও এভাবে বারি খায়। বুড়ি তখন গাল মন্দ দিয়ে বলে,– হতচ্ছারা লাউ! ধরবার আর জায়গা পেলিনে, থাক আর কয়েকদিন তোকে না খেয়ে ছাড়ছি না।

www.pathagar.com

কিছুদিন যেতেই বেশ বড় হয়েছে লাউটা, বুড়ি সেটা তুলে এনে কুচি কুচি করে কেটে রাধতে গেল। উনুনের তাপ পেয়ে ঝোলটা যখন টগবগিয়ে ফুটছে তখন আগের মত হাঁড়ি গলা করে বলে উঠলো,–

ববগ্ ববগ্ সদিনোর মাধা হাং,
ববগ্ ববগ্ সদিনোর মাধা হাং।
(টগবগ্ টগবগ্ সতীনের মাথা খাই)

এবার বুড়ি আরো বেশি ভয় পেয়ে ভীমরি খাওয়ার যোগার। সব্বনাশ! এ তো সেই আগের গলা! কি জানি কি হয়? এই ভেবে এবার সে তরকারিটা খেলো না, হাঁড়িসুদ্ধ তরকারিটা ফেলে দিয়ে এল ঢেঁকিশালের তুষের গাদায়। বেশ কিছুদিন যেতেই দেখা গেল সেখানে একটি বট গাছের চারা গজিয়েছে। অল্প দিনেই বেশ বড় সড় হয়ে উঠেছে গাছটি, আর ডাল পালা মেলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরিখ গাছটি। বুড়োর মেয়ে ধ'বি-কে পাঠায় বুড়ি ধান ভানতে। বেচারী একা একা ধান ভানে ভর দুপুর রোদে, রোদের তাপে আর গরমে দরদর করে ঘাম বেয়ে ঝরে যায় সারা শরীর বেয়ে। গাছটা সে সময় পরম স্নেহে ছায়া দেয় ধ'বি-কে, ডালপালা দুলিয়ে হাওয়া করে। মায়ের মতই পরম আদরে তার সব ক্লান্তি মুছে দেয়।

বুড়োর মেয়েকে অতখানি কষ্টের মধ্যে রেখেও বুড়ির সাধ যেন মেটে না। সতীনের মেয়েকে সদা নানাভাবে কষ্ট দেয়ার চিন্তায় থাকে শয়তানী বুড়ি। এক সময় বুড়িকে হাড় ভাঙা, চাড়া ভাঙা রোগে পেয়ে বসল। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা তো করতে হবে। এই রোগের ঔষধ হিসেবে বুড়িকে নাকি বাঘের দুধ খেতে হবে। কিন্তু গভীর জঙ্গল থেকে মাদী বাঘ খুঁজে কে আনবে বুড়ির জন্য বাঘের দুধ? সব ব্যবস্থা বুড়িই করল। সন্ধ্যেবেলায় বুড়োর মেয়ে ধ'বি আর বুড়ির মেয়ে ক'বি ই যাবে বাঘের দুধ আনতে।

এদিকে দুপুর বেলায় বুড়ি নিজের মেয়ে ক'বি কে বেশ কিছু দুষ্টবুদ্ধি শিখিয়ে দিল। বুড়ি তার মেয়েকে বললো,– আজ বিকেলে বাঘের দুধ আনতে যাবার সময় সিঁড়ি হতে পা পিছলে তুই নিচে পড়ে যাবি এবং কোমরে ব্যথা পাওয়ার ভান করবি। তুই যেতে না পারলে ধ'বি-কে বনে গিয়ে একাই বাঘের দুধ আনতে যেতে হবে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ধ'বির চোখে মুখেও আধার নেমে এলো। বুড়ি ধ'বি আর ক'বি কে বনে গিয়ে বাঘের দুধ আনতে বললো।

তখন দুই সৎবোন মিলে বাঘের দুধ আনতে বনে যাবার জন্য তৈরি হলো। বুড়ির কথামত ক'বি মাচাঘরের সাঙু বা সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় আছাড় খাওয়ার ভান করে মাটিতে পড়ে গেল। ফলে বুড়োর মেয়ে ধ'বি-কে একাই বনে যেতে হল বাঘের দুধ আনতে। ধ'বি একাকী বনের মধ্যে প্রবেশ করলো। বনের হিংস্র জীবজন্তুর ডাক শুনে গা ছমছম করতে লাগলো। সে মনে মনে ভাবে বাঘ ভালুকেরা আজ তাকে নিশ্চিত খেয়ে ফেলবে। সে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগুচ্ছে, অমনি হঠাৎ ইয়া বড় এক বাঘিনী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধ'বি-কে দেখে হালুম বলে তার দিকে তেড়ে এল বাঘিনী। ধ'বি তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বাঘিনীকে বললো,–

ঝু ঝু! মুঝি ঝু!

www.pathagar.com

খেলে খা দেলে দা,
খেলে তর ভুগ জুরেব'
মরও ভারী দুগ ফুরেব'।
(প্রণাম মাসী প্রণাম তোমায়!
খাইলে খাও যা খুশি চাও,
খাইলে তোমার ভোগ জুড়োবে,
আমারও সব দুঃখ ফুরোবে।)

ধ'বি র কথা শুনে বাঘিনী মানুষের গলায় বলে উঠলো,– ভাল তো ভালোই! ভাগ্যিস মাসী ডেকেছিস, নইলে এতক্ষণে তোকে খেয়ে ফেলতাম। তা কা'দের বাছা রে তুই? আহা হা! মুখখানা যে শুকিয়ে কাট হয়ে আছে!

ধ'বি বলল– মাসী! আমার সৎমা'র 'হাড়ভাঙা চাড়াভাঙা' ব্যামো হয়েছে, ভারি শক্ত ব্যামো। ঔষধের জন্য খানিকটা বাঘের দুধ চাই, নইলে আর বাঁচবে না।

বাঘিনী সদয় হয়ে বললো– ও..মা তাই নাকি? তাহলে নে বাছা নে! হাজার হোক মাসী বলে ডেকেছিস! তখন কি আর তোকে না দিয়ে পারি? তাছাড়া আরো ঔষধ বলে কথা।

বাঘিনী একটু করে ফাঁক করে দাড়াতে মাই থেকে অমনি ঝর ঝর করে দুধ ঝড়ে পড়তে লাগলো মাটিতে। ধ'বি তাড়াতাড়ি একটা বাঁশের চোঙায় খানিকটা দুধ ভরে নিল। যাবার আগে বাঘিনী ফের বললো– আ..হা! তোকে দেখে মনে হচ্ছে ভারী দুখী মেয়ে তুই। দাড়া! আমার কাছে মেলাই কাপড় চোপড় আছে, নিয়ে যা! তোকে দিয়ে দিচ্ছি, সেগুলো পরবি আর তোর এই বাঘিনী মাসী কে মনে রাখবি কেমন?

সেই আদিকাল থেকে কত মানুষ এই বাঘিনীর পেটে গেছে, তাদের সেই রকমারি পোষাক আশাক স্তুপ হয়ে পড়ে আছে একধারে। ধ'বি-কে সেখানে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে দিল বাঘিনী। এখন এতসব কাপড়ের পাহাড় তার মত বাচ্ছা মেয়ে কি একা বয়ে নিয়ে যেতে পারে? তাই সে বেছে বেছে রেশমের তৈরি খালি কয়েক জোড়া পিনোন খাদি বেঁধে নিল পুটলীতে আর সব পড়ে রইল সেখানে।

বাঘিনী মাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধ'বি ফিরে চললো বাড়িতে। তার একহাতে বাঘের দুধ অন্যহাতে কাপড়ের পুটলীটি, খুশিমনে হাটতে লাগলো সে, হঠাৎ তার মাথায় একটা ভাবনা এসে গেল। যা সে নিয়তই দেখছে, এসব নিয়ে বাড়িতে গেলে তার সৎমা না আবার সব কেড়ে নেয়। অমনি চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল তা মাথায়। সন্ধ্যা হতেই যখন সে পৌঁছে গেল তাদের গাঁয়ে, বাড়িতে ঢোকার আগে সে গিয়ে হাজির হলো ঢেঁকিশালে বিরিখ গাছটার (বড় বটগাছ) কাছে। গাছটার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বলল– হে দয়াবান বিরিখ গাছ! তুমি যদি সত্যযুগের গাছ হয়ে থাক, তাহলে ফাঁক হয়ে যাও! ধ'বি র কথাশুনে গাছটা সত্যি সত্যি ফাঁক হয়ে গেল। তারপরে সে তাড়াতাড়ি কাপড়ের পুটলিটা সেখানে রেখে বাড়িতে চলে গেল।

এদিকে আগের রাতে ধ'বি বাড়িতে ফিরে না আসায় তার বুড়ো বাপের চোখে ঘুম নেই। বুড়ি কিন্তু মনে মনে খুব খুশি। বুড়োর হা হুতাশ দেখে বুড়িও কপট কান্নার ভান

www.pathagar.com

করলো। পরেরদিন সন্ধ্যেয় ধ'বি-কে জীবিত অবস্থায় ফিরতে দেখে বুড়ি রেগে আগুন, বুড়ি বলে– পাজি মেয়ে কোথাকার। গতরাতে কোথায় গিয়েছিলে? নিশ্চয়ই তুই বনে যাসনি, কারো বাড়িতে গল্প গুজব করে সময় কাটিয়ে ঘরে ফিরে এলি! কিন্তু ধ'বি যখন সত্যি সত্যি বাঘের দুধ বুড়ির হাতে তুলে দিল তখন শয়তান বুড়ি মনের রাগ মনে চেপে চুপসে গেল। আর ওদিকে বুড়ো বাপ তার মেয়েকে ফিরে পেয়ে মহাখুশি, মেয়েকে আদরে আদরে ভরে তুললো। বুড়িও কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। কিছুদিন পর বুড়ির আবার সেই হাড়ভাঙা চাড়াভাঙা রোগটি বেশি করে পেয়ে বসল। এবারে তার ঔষধ হল সাপের দুধ। এবারও আগের মত বুড়ির মেয়ে ক'বি মাচাঘরের সাঙুতে আছাড় খেল, ফলে ধ'বি-কে এবারও একা বনে যেতে হলো সাপের দুধ আনতে। এবারেও ধ'বি বনে গিয়ে বিরাট একটা সাপকে দেখে পিসী ডেকে প্রণাম জানালো। এবারও আগের মত সাপটি এক চোঙ্গা দুধ দিয়ে দিলো ধ'বি-কে। তারপর সাপটি বললো– তোকে দেখে ভারী দুঃখী বলে মনে হচ্ছে! দাড়া! আমার কাছে মানুষের গয়না পত্তর মেলাই পড়ে আছে, তোকে দিচ্ছি, সেগুলো নিয়ে যা। এইগুলো সব তুই পরবি আর তোর এই বনের পিসীকে মনে রাখবি কেমন?

সেই আদিকাল থেকে কত মানুষ গিলে খেয়েছে সাপটি, তাদের হ্‌ড়গোড় সেই কবেই হজম হয়ে গেছে তারপেটে, কিন্তু গয়না গাটিগুলো আর হজম হয় না। সেগুলো সব জমা করে রেখে দিয়েছে সাপটি। ধ'বি-কে নিয়ে গিয়ে সাপটি দেখিয়ে দিলো তার সেই গয়নার ভাণ্ডারটি। এতসব গয়নাগাটি ধ'বি কি একা বয়ে নিয়ে যেতে পারে? তাই সে বুদ্ধি করে কয়েক সেট দামী দামী গয়না বেছে বেছে পুটলীতে ভরে পিসী সাপটির কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে চললো। সন্ধ্যা হওয়ার মুখে বাড়ির কাছে পৌঁছতেই সে আগের মত আবারো গেল বিরিখ গাছটার কাছে এবং যথারীতি সে সব গয়নাগাটি বিরিখ গাছটার কোটরে রেখে বাড়িতে গেল। বাড়িতে গিয়ে সাপের দুধটা তুলে দিল তার বাপের হাতে।

দু দুবার ধ'বি-কে জীবন্ত ফিরে আসতে দেখে বুড়িতো ভেতরে ভেতেরে রেগে একাকার। মনে মনে বলে– কি একটা আপদ জুটেছে, সতীনের মেয়েটার কিছুতেই যেন মরণ হচ্ছে না। মুখে তো আর কিছু বলা যাচ্ছে না, তাই মনের রাগ মনেই চেপে রাখতে হলো। পাছে না বুড়ো সব টের পেয়ে যায়।

সাপের দুধটা বুড়িকে খেতে দিল বুড়ো। বুড়ি না খেয়ে চালাকি করে বুড়োর অগোচরে সবটুকু দুধ মাচানের নিচে ফেলে দিল। কি আর হবে! মিছেমিছি কাঁহাতক আর রোগী সেজে বসে থাকা যায়, বুড়ির নিজেরই বিরক্তি এসে গেল। ধীরে ধীরে একদিন বিছানায় উঠে বসলো।

এমন করে কষ্ট আর দুঃখ ভোগ করে বুড়োর মেয়েটা একবারে শুকিয়ে গেল। দেখতে ভাল হলে কি হবে? ভাল একটা কাপড় পড়তে দেয় না বুড়ি তাকে। গয়না গাটির বালাই নেই, মাথার চুলে তৈল পড়ে না কোনদিন, হাত পা খালি, অষ্টপ্রহর বুড়ি শুধু খাটিয়েই মারে তাকে। উঠতে বসতে গালমন্দ করে। অথচ মেয়েটি বড় হয়ে উঠেছে। ওদিকে নিজের মেয়ে বেলায় কিন্তু উল্টোটি, গয়নাগাটি সাজ পোষাকের কোন

www.pathagar.com

কমতি নেই, কোন কাজ করতে হয় না, খাওয়া দাওয়া আর ফূর্তি করে ঘুরে বেড়ানোয় হলো তার কাজ। এমনি করে দিন কাটে।

একদিন গাঁয়ে ভীষণ হৈ চৈ পড়ে গেল। রাজার লোক এসে একদিন হঠাৎ ঢেঁড়া পিটিয়ে দিল যে, রাজ্যের যেখানে যত কুমারী মেয়ে আছে, আসছে পূর্ণিমায় রাজা সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তাদের মধ্যে রাজকুমারের যাকে পছন্দ হবে তার সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে হবে। তখন আর কি? সকল গাঁয়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেল কুমারী মেয়ের মহলে। এমন একটা লোভনীয় ব্যাপার! কার না সাধ জাগে নিজের ভাগ্যটাকে একটু পরখ করে দেখার! রাজার ছেলের সাথে বিয়ে বলে কথা। রাজরাণী হবে, কতই না সুখে থাকবে। কে কার আগে সাজিয়ে গুজিঁয়ে মেয়েকে রাজবাড়ি পাঠাবে তার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এদিকে শয়তানী বুড়িও তার মেয়ে ক'বি-কে রাজবাড়ি পাঠাবে বলে আত্মীয় কুটুমের কাছ থেকে নানারকম সুন্দর সুন্দর গয়না গাটি চেয়ে আনলো।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে ঘোড়ার গাড়িতে করে বুড়ি ক'বি কে রাজবাড়ি পাঠিয়ে দিল। আর সাথে সতীনের মেয়ে ধ'বি-কেও পাঠিয়ে দিল চাকরানী হিসেবে। মেয়েকে শিখিয়ে দিল তার সৎবোন ধ'বি-কে চাকরানী হিসাবে পরিচয় দেওয়ার জন্য। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর ধ'বি র গাড়িটা খারাপ হলো। তখন ক'বি কোথায় নিজের গাড়িতে ধ'বি-কে তুলে নেবে, তা না করে সে ধ'বি-কে ফেলে একাই চলে গেল। ধ'বি র গাড়িটা খারাপ হওয়াতে ক'বি মনে মনে বেজায় খুশি। তার চাইতে ধ'বি রূপে গুণে সুন্দরী হওয়ায় ক'বি তাকে হিংসে করতো। ক'বি র গাড়িটা চেখের আড়ালে চলে গেলে ধ'বি আস্তে করে গাড়ি থেকে নামলো, নেমে সেই বিরিখ গাছটার কাছে গিয়ে হাজির হলো। বিরিখ গাছটার কাছ থেকে সোনার জড়োয়া গয়নার সেট আর রেশমের সুন্দর সুন্দর পোশাক চেয়ে নিল। সেগুলো পড়ে নিখুঁতভাবে সেজেগুঁজে রাজবাড়ির দিকে রওনা হলো। ধ'বি এমনিতেই সুন্দরী, ফুটফুটে চেহারা, ফর্সা গায়ের রঙ, জড়োয়া গয়না আর রেশমের পোষাক পড়ে পরী কন্যার মত সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। তার দিকে একবার তাকালে চোখ ফেরানো মুস্কিল।

ধ'বি যখন রাজবাড়িতে পৌছাল সেখানেও একই অবস্থা। রাজবাড়ির বাদ্যবাজনা, নাচগান একেবারেই থেমে গেল! কারণ সকলে সব ভুলে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। এমন সুন্দরী কন্যা জীবনে যেন কেউ দেখেনি। এই সুন্দরী কন্যাটি কি মানুষ না পরীকন্যা? মুহূর্তের মধ্যে সারা রাজবাড়িতে রটে গেল খবরটা, এক পরমা সুন্দরী কন্যা রাজবাড়িতে এসেছে। ধ'বি-কে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। খবর পেয়ে রাজকুমারও এসে হাজির। তার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে রাজকুমারও মুগ্ধ হয়ে গেলো। রাজকুমারের চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় ধ'বি মাথানিচু করলো। লজ্জায় তার গাল দুটি আরো লাল হয়ে গেলো। এতে তার সৌন্দর্য আরো বেড়ে গেল। রাজকুমারের ধ'বি-কে পছন্দ হয়ে তার হাত দুটি ধরে নাচ শুরু করে দিল। এদিকে ক'বি তার সৎবোনকে চিনতে না পারলেও পরে ঠিকই চিনলো এবং হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো। রাজা আর রাণী ধ'বি-কে আদর যত্ন করে রাজবাড়ি তে রেখে দিলেন। কয়েকদিন পরে রাজকুমারের সাথে ধ'বি-কে মহা ধুমধাম করে বিয়ে দিয়ে দিলেন। সারা রাজ্যের লোক আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলো। সাতদিন সাতরাত ধরে রাজবাড়িতে খানাপিনা ও নাচগান

www.pathagar.com

বাদ্যবাজনা সহকারে আনন্দ উৎসব চললো। এদিকে ক'বি হিংসায় জ্বলে পুড়ে কেঁদে কেঁদে বাড়িতে ফিরে গেলো। তখন শয়তানী বুড়ি তার মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো– ঐ শত্তুর যখন রাজকুমারকে নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে আসবে, তখন সুযোগ বুঝে তাকে মেরে ফেলতে হবে। অমনি তুই ধ'বি সেজে রাজবাড়িতে যাবি। শয়তানী বুড়ি আর তার মেয়েমিলে ফন্দি আটতে লাগলো, কিভাবে ধ'বি-কে মেরে ফেলা যায়।

অবশেষে তাদের সে সুযোগও মিলে গেল একদিন। ধ'বি সত্যি সত্যি স্বামী রাজকুমারকে নিয়ে তার বুড়ো বাপের বাড়ি বেড়াতে আসলো। সাথে দাসদাসী, হাতি ঘোড়া, সৈন্য সামন্ত আরো কত কিছুই না এলো। তা দেখে ধ'বি র বুড়ো বাপের আনন্দ আর ধরে না। সে নিজে গিয়ে জামাই রাজকুমারকে মহাসমাদরে বাড়িতে নিয়ে আসলো। সারা ঘর আলো করে ধ'বি খুশিতে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আর সতীনের মেয়ের এই সৌভাগ্য দেখে শয়তানী বুড়ির দুচোখ হিংসেয় জ্বলতে থাকে। তবে বুড়ি অত্যন্ত চতুর। মনের হিংসা মনে চেপে রেখে উপরে উপরে রাজকুমার জামাইকে অতি আদর যত্ন করতে লাগলো। নিজেকে ধ'বি র সত্যিকারের মা হিসাবে পরিচয় দিল। পরম আদর যত্নের মধ্যে বাপের বাড়িতে ধ'বি র দিন কাটতে লাগলো। দিন কয়েক পরে রাজকুমার ফিরে যেতে চাইলে ধ'বি র তো মন খারাপ। অনেক দুঃখের পর এই সুখের দিনে বুড়ো বাপকে ফেলে যেতে কিছুতেই মন চাইছিল না। শয়তানী বুড়িও সে সুয়োগ হাতছাড়া করলো না। সেও ধ'বি-কে কিছুদিন থেকে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সবাইকে দেখাতে চাচ্ছে সে ও ধ'বি-কে কতই না ভালবাসে। ধ'বি র মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে রাজকুমার আরো কিছুদিনের জন্য ধ'বি-কে বাপের বাড়ি রেখে রাজপুরীতে ফিরে গেলেন।

ধ'বি রাজকুমারকে খুবই ভালবাসে। তাই স্বামীর যেন সামান্যতম অসুবিধা না হয় সেজন্য সকল দাসদাসীদেরকে ও রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিল। এবার শয়তানী বুড়ি ও তার হিংসুটে মেয়ে ক'বি নেমে পড়লো তাদের আসল কাজে। সুযোগ খুঁজতে লাগল কিভাবে ধ'বি-কে মেরে ফেলা যায়। মুখে অবশ্যি ধ'বি র সাথে মিষ্টি ভাব দেখাতে ভুললো না। ধ'বি র খুব বেইন বোনার সখ। সে প্রতিদিন বেইন বুনতো। সুযোগ বুঝে শয়তানী বুড়ি আর তার হিংসুটে মেয়ে বেইন ঘরের মাচানের নিচে একটা মস্ত বড় গর্ত খুড়ে ফেললো।

একদিন দুপুরে ধ'বি বেইন বুনছিল আর তার সৎবোন ক'বি পাশে বসে দেখছিল। আর ধ'বি র শ্বশুড়বাড়ির সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করছিল। অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করার পর ক'বি ধ'বি-কে বললো– আচ্ছা দিদি তোর তো অনেকদিন হলো বিয়ে হয়েছে, অথচ তোর বিয়ের আংটি এখনও ভালো করে দেখাই হলো না! বড্ড ইচ্ছে করছে হাতে নিয়ে দেখতে। দেখতে দিবি না আমাকে? ধ'বি বোনের কথা শুনে সহজ সরল মনে বিয়ের আংটিটি খুলে ক'বির হাতে দিল। বললো– নে ভাল করে দেখ, হারিয়ে ফেলিস না যেন। ক'বি আংটিটি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। হঠাৎ ইচ্ছে করেই ক'বি আংটিটি মাচানের নিচে আগে তাদের করে রাখা গর্তের মধ্যে টুপ করে ফেলে দিল। তারপর হায় হায় করে উঠে ধ'বিকে বলল– এখন

www.pathagar.com

কি হবে দিদি? আংটিটা হঠাৎ গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে! ধ'বি আর তখন কি করে, সে ছিল সাদাসিদে স্বভাবের, সে তার শয়তানী সৎমা এবং হিংসুটে সৎবোনের কুবুদ্ধি বুঝতে পারলো না। সরল মনে সে গর্তের মধ্যে নেমে গেল আংটিটা আনার জন্য। শয়তানী বুড়ি ও তার মেয়ে এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, যেই না ধ'বি গর্তে নেমে পড়লো অমনি দুই মায়ে ঝিয়ে মিলে উপর থেকে গরম পানি ঢেলে দিল। তারপর দুইজনে দুইদিক থেকে মাটি চাপা দিয়ে ধ'বি-কে মেরে ফেললো। ধ'বি মারা যাবার সাথে সাথে একটি হলদে পাখি হয়ে রাজবাড়ির দিকে উড়ে চলে গেল। তখন শয়তানী বুড়ি আর তার মেয়ে মাটি সরিয়ে ধ'বি র আংটি এবং তার যাবতীয় অলংকার নিয়ে নিল। কয়েকদিন পরে শয়তানী বুড়ি ক'বি-কে ধ'বি সাজিয়ে রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিল। ক'বি-কে দেখে রাজকুমারের মনে প্রথম থেকেই সন্দেহ দেখা দিল। কারণ ধ'বি র চালচলনের সাথে ক'বি র মধ্যে অনেক ফারাক।

ধ'বি তো অপরূপ সুন্দরী ছিল এবং গায়ের রঙ এত কালো ছিল না। আর তার গালও এত ফোলা ফোলা ছিল না। গলার স্বরও কি মধুর ছিল। তাই রাজকুমার কিছুতেই তাকে তার স্ত্রী বলে মেনে নিতে রাজী হলো না। তখন ক'বি বিলাপ করতে করতে বলে– কুমার তুমি আসার পর তোমার বিরহে কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখ ফুলে গেছে, গাল ফোলা ফোলা হয়েছে, গলার স্বর ভেঙে গেছে। দুঃখে দুঃখে আমার গায়ের রঙও কালো হয়ে গেছে। বিয়ের আংটিটি দেখিয়ে বললো– এই দেখো- আমার আঙুলে বিয়ের সময় তোমার পড়িয়ে দেওয়া আংটিটি এখনো আছে। রাজকুমার ক'বি র হাতে আংটিটি দেখে অবাক হয়ে গেল। তবুও তার মন থেকে সন্দেহ দূর হলো না। যা হোক কুমার ক'বি-কে রাজবাড়িতে থাকতে দিল। আর দাসদাসিদের হুকুম দিল তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করার জন্য।

ক'বি রাজবাড়িতে ঠাঁই পেলে কি হবে। তার আসল বিপদ শুরু হলো। প্রথমদিন তাকে রাঁধতে দেয়া হলো। রাঁধতে গিয়ে কোন কোনটায় বেশি নুন দিয়ে দেয়, কোনটায় একবারে নুন দেয় না, আবার কোনটায় ঝাল বেশি। সেদিন তার রান্না কেউই মুখে দিতে পারলো না। তখন ক'বি নানা অজুহাত দেখাতে লাগলো। অনেকদিন বাপের বাড়ি বসে বসে খাওয়াতে, রান্না না করার কারণে আজ তাই ভাল হয়নি। প্রথম দিন গেলো, এবার দ্বিতীয় দিনে তাকে গাইতে বলা হলো। সে তখন হেড়ে গলায় দিদির শেখানো গান গাইতে লাগলো। তার সেই কর্কশ কণ্ঠ শুনে যে যেদিকে পারে সবাই ছুটে পালালো।

এতে ক'বি ভীষণ লজ্জা পেলো। তবুও সে নিজের দোষ ঢাকার জন্য বলতে লাগলো, কুমারের বিরহে কাঁদতে কাঁদতে গলার এই করুণ অবস্থা। নিজেকে বাচানোর জন্য ক'বি যতই অজুহাত দেখাক না কেন, রাজবাড়ির দাসদাসিদের কাছ থেকে সে কিন্তু রেহাই পেলো না। এবার তারা ছবি আঁকার জন্য রংতুলি এনে দিল তার হাতে। ক'বি ছবি কিছুই জানে না। সে আঁকলো কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং। সে ছবি দেখে সবাই ঠাট্টা করলো। সব শেষে তাকে বেইন বুনতে দেয়া হলো। ধ'বি খুব সুন্দর বেইন বুনতো। ভারি সুন্দর সুন্দর ফুল তুলতে পারতো, সে সব দেখে রাজবাড়ির সবাই কি প্রশংসাই না করতো।

www.pathagar.com

শয়তানী বুড়ির মেয়ে ক'বি জন্মেও কোনদিন বেইন বুনেনি। কিভাবে যে কি করবে ভেবে কুল পাচ্ছে না। পড়লো মহা বিপদে। বেইন বুনতে বসে কিভাবে ফুল তুলবে কিছুই বুঝতে পারছে না, এমন সময়ে মাথার উপর গাছটি থেকে হলদে পাখিটি বলে উঠলো–

তিন জুর ফেলেই তিন জুর তুল
শদানর ঝি শদানি বিগুন বিজি ফুল্লো তুল।
(তিন জোড়া ফেলে তিন জোড়া তোলো,
শয়তানের ঝি শয়তানী বেগুন বিচির ফুলটা তোলো।)

হলদে পাখিটির কথা শুনে ক'বি র খুব রাগ হলো। সে বেইন বোনার একটা কাঠি ছুড়ে মারলো হলদে পাখিটির দিকে। বেচারী হলদে পাখিটি সাথে সাথে মারা গেলো। সেদিন ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় রাজকুমার দেখলো একটা হলদে পাখি মরে পড়ে আছে। পাখিটির প্রতি তার খুব মায়া হলো। রাজকুমার মরা হলদে পাখিটিকে নিয়ে আসলো একেবারেই তাঁর শোবার ঘরে। ঘরের এক কোণে রেখে দিল যত্ন করে। পাখিটার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় রাজকুমার ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল তখন রাজকুমার দেখলো অবাক কাণ্ড! তার শোবার ঘরটা কে যেন সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে গেছে। কুমার মনে মনে ভাবল, দাস-দাসীদের কেউ হয়তো ঘরটা এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে গেছে। এমন সময়ে ঘরের কোনে তাঁর চোখে পড়লো, হলদে পাখিটাকে যেখানে রেখেছিল সেখানে রাতারাতি একটা সদরক (গাঁদা) ফুলের গাছ গজিয়েছে। গাছটাতে মাত্র একটা সুন্দর বড় ফুল ফুটে আছে। কুমারতো একবারেই অবাক। ভাবল এটাকি স্বপ্ন না তাঁর মনের ভুল।

এর পরেরদিনও কুমার দেখল সে একই কাণ্ড! গতরাতের মত তাঁর ঘর সব সাজানো গোছানো। শুধু তাই নয়, তাঁর পরনের কাপড়েও কে যেন পানে পিক লাগিয়ে দিয়ে গেছে। তা দেখে রাজকুমারের ভীষণ রাগ হলো। রাজবাড়ির সকল দাসদাসীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলো– তোমাদের মধ্যে কে এই কাজটি করেছে? সকল দাসদাসি তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে, কেউ কিছু বলতে পারলো না, আসলে কে এই কাজটি করেছে!

রাজকুমার তখন মনে মনে ঠিক করলো নিজেই এর সুরাহা করবে। সেদিন রাতে কুমার ঘুমালো না, ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো। রাত যখন খুব গভীর তখন কুমার দেখতে পেলো, ঘরের কোণে সদরক ফুল থেকে এক পরমা সুন্দরী কন্যা বের হয়ে আসছে, কুমার অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকলো, তাঁর চোখের পলক আর যেন পড়ে না। সুন্দর মেয়েটি প্রথমে ঘরের সব জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলো, তারপর ভাত রাধতে বসলো। ভাত রাধা শেষ হলে ভাতের অর্ধেক নিজে খেয়ে বাকিটা পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখলো। এরপর পানের বাটা খুলে পান সাজিয়ে মুখে দিল। পান খেয়ে মুখটা আরো টুকটুকে লাল হয়ে গেলো। তারপর কুমারের পরনের সাদা কাপড়ের পানের পিক লাগিয়ে সদরক ফুলের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখে

www.pathagar.com

কুমার তো একেবারেই হতবাক! রাজকুমার আবার পরের রাতের অপেক্ষায় রইলো। সেই রাতেও একই ব্যাপার! এবার কিন্তু কুমার সুয়োগের অপেক্ষায় রইলো। এক এক সব কাজ শেষ করে যেই না পানের পিক লাগাতে যাবে অমনি কুমার সুন্দরী কন্যাটির চুল ধরে ফেললো। তখন রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলো– কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? সুন্দরী মেয়েটি তখন বলে উঠলো–

কুমার লে কুমার,
লেজোত্ ন'ধরিছ পেজোত্ ধর!
(কুমার রে কুমার, চুলে না ধরে আঁচলে ধরো।)

তখন কুমার যেই না আঁচলে ধরতে যাবে, তখন মেয়েটি ফুরুৎ করে সদরক ফুলের মধ্যে ঢুকে গেলো। রাজকুমার তখন আর কি করবে, পরের রাতের জন্য অপেক্ষায় থাকলো। এবার আর কুমার ভুল করলো না, যেই না সুন্দরী মেয়েটি তাঁর সাদাকাপড়ে পানের পিক লাগিয়ে দিতে যাবে, তখনি হুট করে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে ফেললো, এবং তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। তখন ধ'বি কাঁদতে কাঁদতে তার সৎমা আর সৎবোনের ষড়যন্ত্র ও তার সব দুঃখের কথা একে একে সব খুলে বললো। ধ'বি-কে ফিরে পেয়ে কুমার তো আনন্দে আত্মহারা, তাদের দুজনের কথা যেন আর ফুরায় না। কথা বলতে বলতে কখন যে ভোর হয়ে গেছে সেদিকে তাদের খেয়ালই নেই।

পরদিন সকালে ধ'বিকে দেখে রাজবাড়ির সকলে যারপর নাই অবাক! রাজা এবং রাণী তাঁদের প্রিয় পুত্রবধূকে ফিরে পেয়ে রাজবাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। নিমেষে রাজবাড়িতে আগের সেই প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এলো।

এদিকে শয়তানী বুড়ি ও তার হিংসুটে মেয়ে ক'বি দেখে তাদের মহাবিপদ। তাদের সব ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে। এবার নিশ্চিত প্রাণটা যাবে। প্রাণের মায়া বড় মায়া। প্রাণে বাঁচার জন্য ক'বি ধ'বি র পায়ের উপর আছড়ে পড়লো। কেঁদে কেঁদে অনেক অনুনয় বিনয় করে ক্ষমা চাইলো। ধ'বি র মন ছিল খুব নরম। ক'বি র কান্না দেখে তার মন গলে গেল। তাদের সব দোষ মাফ করে দিল। তবে রাজবাড়ির লোকজন তাদেরকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল।

রাজা রাণী তাঁদের প্রিয় পুত্রবধুকে ফিরে পেয়ে মহাখুশি। রাজবাড়িতে যেন খুশির মেলা বসলো। রাজার আদেশে সারা রাজ্যে আবারো সাতদিন সাতরাত ধরে আনন্দের বন্যা বয়ে চললো। রাজুমারের আদেশে ধ'বি র বুড়োবাপকেও সসম্মানে রাজবাড়িতে আনা হলো। কুমার তাকে একেবারেই রাজবাড়িতে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। বাপকে কাছে পেয়ে ধ'বি র সে কি আনন্দ! তার দুচোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়লো। তার খুশিতে কুমারও খুব খুশি। সুখের সাথী হলো রাজ্যের সকল প্রজা। কিছুদিন পরে রাজা রাণী গত হলে রাজকুমার রাজা এবং ধ'বি রাণী হয়ে পরম সুখে রাজ্যশাসন করতে লাগলো।

কিংবদন্তি আছে আমাদের দেশে যে হলুদ পাখি দেখা যায়, ধ'বিই নাকি সে পাখি হয়ে এখনো আছে।

www.pathagar.com

ত্রিপুরা রূপকাহিনি

খুমপুই

অতীতকালে কোন এক স্থানে একটি বিরাট নারান গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের উপর দিয়ে সহজে কাক চিল উড়ে যেতে পারতো না। সেই গ্রামটিতে প্রায় পাঁচশত পরিবারের বাস। গ্রামে দর্বাসিং নামে এক অচাই ছিলেন। তিনি খুবই ব্যস্ত থাকতেন সবসময়। তার একদিনও অবসর থাকতো না। প্রতিদিন এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে প্রতিটি পরিবারে তাকে দেবদেবীর পূজো দিতে হতো। পাড়ার সবাই মিলে প্রতিবছর কিছু জঙ্গল কেটে কয়েক আড়ি ধানের বীজ দিয়ে জুম চাষ করাতো। সবাই একত্রে মিলে জুমের চাষ করলেও কিন্তু দর্বাসিং অচাই কোনদিন জুমের কাজে যায় নাই। কারণ তিনি পূজা অর্চনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তার দুটি সেয়ে ছিল। বড় মেয়েটির নাম খুমপুইতি আর ছোট মেয়েটির নাম খুমবারতি। খুমপুইতি তেমন সুন্দরী ছিল না, কিন্তু ছোটবোন খুমবারতি খুব সুন্দরী ছিল। পূর্ণিমার চাঁদের মত তার গোলগাল চেহারা দেখে তাকে সাক্ষাৎ প্রতিমা মনে হতো।

পৌষ মাঘ মাসে জুমের জঙ্গল কেটে রাখা হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে সেই কাটা জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে তা পুড়ে ফেলা হয়। পোড়া জুমের গাছ বাঁশ ইত্যাদি পরিষ্কার করে বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হলে সুঁচালো দা এর মাথা দিয়ে মাঠি খুড়ে জুমের ধান বপন করা হয়। খুমপুইতি ও খুমবারতি প্রতিদিন সেই কাজ করার জন্য জুমে যেতো। জুমের মধ্যে কোন জুমঘর ছিলো না। তাই গাছের ছায়ায় তাদেরকে বিশ্রাম নিতে হতো। বৃষ্টির সময় ঝড়ে ভিজে রোদে শুকিয়ে তাদেরকে জুমে কাজ করতে হতো। দুই বোনের কষ্টের সীমা নেই। জুমর ধান, সূতা, তিল ও অন্যান্য ফলমূলের চারাগুলি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। দু'বোন প্রতিদিন এসে সাধ্যমত জুমের কাজ করে যায়। দু'বোন অতি কষ্টের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের মত আগাছাগুলি পরিষ্কার করে দেয়। দেখতে দেখতে শ্রাবণ ভাদ্র মাস আসে। আর কিছুদিনের মধ্যে জুমের ফসল ঘরে উঠবে। জুমের চারিপাশে প্রচুর আগাছা জন্মেছে। স্নান ঘাটে যাওয়ার জন্য এখনো আগাছা পরিষ্কার করা হয়নি। জুম ঘর নেই। এতদিন বৃষ্টিতে ভিজে রোদে শুকিয়ে জুমের কাজ করেছে। এখন ধান, সুতা, তিল সংগ্রহ করে কোথায় রাখবে তানিয়ে ভাবনায় পড়েছে। বনের পশু পাখি, শুকর, বানর, ভালুক ইত্যাদি জীবজন্তুর হাত থেকে কীভাবে ফসলগুলি রক্ষা করা যায়? খুমপুইতি একটা গাছের নিচে বসে এসব চিন্তা করতে থাকে। একসময় মনে মনে বলে কই! নিজেদের এই দুঃখ দেখে কোন মানুষ তো আমাদের সাহায্য করতে আসবে না। মনে মনে ভাবে যদি জঙ্গলের পশু সমাজের মধ্য থেকে কোন জীব আমাদের দুঃখ হতে পরিত্রানের উদ্দ্যেশ্যে এগিয়ে আসতো তাহলে তাকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতাম। এভাবে মনের দুঃখে খুমপুইতি গাছের নিচে বসে কাঁদতে লাগলো।

এমন সময় নানারং এ সজ্জিত একটি বিরাট সাপ এসে তার পিছনে ফণা তুলে দাড়ালো। রোদের আলোয় সাপটির গায়ের রং চক চক করছে। খুমপুইতি পিছনে সাপটিকে দেখে ভয়ে পালাতে উদ্যত হলে সাপটি আস্তে আস্তে মানুষের রূপ ধরে ইশারায় খুমপুইতিকে বললো– ভয় নেই, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছি।

www.pathagar.com

তবে শোন! আমার কয়েকটি শর্ত তোমাদেরকে পালন করতে হবে। শর্তটি হলো এই, আমার এই রূপের কথা কোনদিন কাউকে বলতে পারবে না। প্রতিদিন তোমরা আমাকে ভাত এনে খাওয়াবে, আমি তোমাদের সব কাজে সাহায্য করবো। খুমপুইতি সাপটির সব কথা মন দিয়ে শুনলো। সাপের মনুষ্য রূপ ধারণের কথাটি কাউকে বলবে না এবং প্রতিদিন সাপটিকে ভাত খাওয়াবে বলে প্রতিজ্ঞা করলো। খুমপুইতির এ কথা শুনে সাপটি ছড়ায় নেমে গিয়ে ছড়ার পাশে একটি বিরাট গর্তে ঢুকে পড়লো। খুমপুইতি ও খুমবারতি ঘটনাটি কাউকে না বলে বাড়ি ফিরে গেলো।

পরদিন খুমপুইতি ও খুমবারতি যথারীতি জুমে এসে পৌঁছাল, সে সময় সাপটিও গর্ত থেকে বের হয়ে মানুষের রূপ ধরে গাইরিং বা জুমঘর তৈরি করার উদ্দ্যেশ্যে জঙ্গল হতে গাছ, বাঁশ ইত্যাদি কেটে নিয়ে আসলো। পাহাড়ের উপর থেকে ছন কেটে আনলো। দু'বোনে মিলে সাপটিকে কাজে সাহায্য করলো। এমনি করে প্রতিদিন সাপটি এসে দু'বোনের সঙ্গ কাজ করতে লাগলো। কাজ শেষে খুমপুইতি সঙ্গে আনা ভাত থেকে সাপের অংশটি সাপটিতে খেতে দিত। যেহেতু বাড়ি থেকে আসার সময় সাপটির জন্য আলাদাভাবে ভাত আনা সম্ভব ছিলো না, পাশে হয়তো সাপ রহস্যটি লোকেরা জেনে যেতে পারে এই ভয়ে। এরি মধ্যে সাপটি গাইরিং বা জুমঘর তৈরি করে ফেললো। জুমের চারপাশে দশ পনের হাত দূরে করে জংগল ও আগাছাগুলি কেটে পরিষ্কার করে নিল। এবং পাখি তাড়ানোর জন্য ওয়াখরব বসিয়ে গাইরিং বা জুমঘর পর্যন্ত লম্বা রশি টেনে ফেললো। স্নানঘাটে যাওয়ার জন্য রাস্তা কেটে সিড়ি তৈরি করলো। এখন জুমে আসলে দু'বোন অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করতে পারে। পাহাড়ের উঁচু মাচাঘরের খোলা মাচাং বা চাকেরেং এ দাঁড়িয়ে জুমের চারিদিকে নজর দেওয়া যায়। রশি ধরে টান দিলে পাখিগুলোকেও তাড়ানো যায়। এমনি করে বেশ কিছুদিন তারা অতি সুখে দিন কাটায়।

এদিকে খুমপুইতির বাবা দর্বাসিং অচাই খুমপুইতির শরীর দিন দিন ভেঙে যেতে দেখে মহাচিন্তায় পড়ে যায়। খুমপুইতি তার প্রথম কন্যা। তার পরিশ্রমের উপর তাদের সংসার চলে। তিনি নিজে প্রতিদিন গ্রামের লোকদের ঘরে পূজা দিয়ে মদ মাংসসহ ইত্যাদি ভাল ভাল খাবার খেয়ে আসতে পারেন কিন্তু কোন সাহায্য পান না। কোন কোন পূজার রীতি অনুযায়ী কিছু কাঁচা মাংস ঘরে নিয়ে আসতে পারেন। এ ছাড়া তার বিশেষ কোন লাভ নেই। তাই বড় মেয়েটির শরীর শুকিয়ে যাওয়ায় তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন।

ভাদ্র মাসের শেষের দিকে একদিন জুমের ধানে লক্ষ্মীমায়ের পূজার বেদী সাজিয়ে পূজো দিয়ে মায়ের সন্তুষ্টির জন্য শূকর, মোরগ মুরগী ও ছাগল বলি দিয়ে গ্রামের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে খাওয়ানোর জন্য নারন মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়। তাই এক সপ্তাহ আগে থেকেই প্রত্যেক পরিবারের একজন মহিলাকে ডেকে কাজে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানায়। খুমপুইতিকেও সেই কাজে সাহায্য করার জন্য জানিয়ে দেওয়া হয়। ঘরে শুধু বাবা আর তার ছোটবোন খুমবারতি। এমন একটা সুযোগ পেয়ে খুমপুইতির বাবা অচাই দর্বাসিং তার ছোট মেয়ে খুমবারতিকে অতি আদর করে ডেকে কথাটি জিজ্ঞাসা করেন। আচ্ছা মা খুমবারতি! একটি কথা আজ দীর্ঘদিন থেকে তোকে

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করবো করবো বলে আর করা হয়নি। আমার তো আর কেউ নেই, তোদের দু'বোনের নির্ভর করে বেঁচে আছি। সত্যি করে বলতো মা! তোর দিদি খুমপুইতির শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছে কেন? কারণটা কি? কোন অসুখ বিসুখ করেনি তো? এভাবে দর্বাসিং অচাই তার ছোট মেয়েকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। কিন্তু তার ছোট মেয়ে খুমবারতি এত সহজে বাবার কাছে সেই গোপন রহস্যটি খুলে বলছে না। আসল কথা বলে ফেললে যদি কোন বিপদ হয়ে যায় তাই। কারণ তাদের দু'বোনকে সর্পরূপী মানুষটি ঘটনার বিবরণ প্রকাশ না করার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। তাছাড়া ঘটনাটি কেই জেনে গেলে সাপটি মারা যাবে, তার জন্য বাবার বার বার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও খুমবারতি কিছুই বললো না। পরে তার বাবা মেয়েকে আরো বুঝিয়ে বললো- দেখ মা, আমি তোমাদের কোন অকল্যাণ বা অমঙ্গল আমি কোনদিন চাই না। তোমাদের কোন ক্ষতি হোক তা কল্পনাও করতে পারি না। কারণ তোমাদের দু'বোনের জীবিকার উপর আমার ভবিষ্যত নির্ভর করছে। মা' আমাকে তুমি অবিশ্বাস করো না। আমায় তুমি সব খুল বল।

শেষে খুমবারতি তার বাবার কাকুতি মিনতি দেখে কেঁদে কেঁদে বললো– বাবা! ঘটনাটি কাউকে না বলার জন্য আমাকে নিষেধ করেছে দিদি। আমি যদি বলে দি তাহলে আমার উপর রাগ করবে দিদি। মেয়ের কথা শুনে বাবা বলল– তোমাকে আমি অভয় দিয়ে বলছি মা, আসল কথাটি আমায় খুলে বল তোমাদের কোন ক্ষতি বা অমংগল হবে না।

পিতার বার বার অনুরোধে অবশেষে খুমবারতি বললো- তার দিদি একদিন জুমর কাজ করে বিশ্রাম করার সময় বলে– জুমের চারিদিকের জংগলগুলি বেড়ে উঠেছে, ধান পাকলে পাখিরা ধান খেয়ে ফেলবে। যেহেতু আমাদের কোন জুম ঘর নেই, ধান কাটা হলে সেগুলো কোথায় রাখবো? স্নান ঘাটে যাওয়ার জন্য রাস্তা নেই, জুমের ধান ক্ষেতে পাখি তাড়াবার কোন ব্যবস্থা নেই, কাজে সাহায্য করার জন্য কোন মানুষও আসবে না। বন জংগলের কোন জীব যদি আমাদের কাজে সাহায্য করতে আসে, সে যেই হোক না কেন তাকে আমি আমার স্বামী হিসাবে বরণ করে নেবো। এসব বলে বলে দিদি যখন চোখের জল ফেলে কাঁদতে লাগল তখন তার পেছন দিকে একটা মস্ত বড় সাপ ফণা তুলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সাপটির বুকের রঙ সূর্যের আলোয় চিক চিক করছে। দিদি হঠাৎ পেছনে ফিরে সাপটিকে দে ভয়ে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে। তখন সাপটি আস্তে আস্তে মনুষ্য রূপ ধারণ করে দিদিকে হাতের ইশারায় বলল– ভয় পেয়ো না, তোমাকে পালাতে হবে না। আমি তোমায় সাহায্য করতে এসেছি। সাপটি আরো বলল, আমার কথা তোমরা কাউকে কোনদিন বলবে না। বললে আমার খুব ক্ষতি হবে। তোমাদের প্রতিদিন আমাকে ভাত খাওয়াতে হবে, তবেই আমি তোমাদের সব কাজ করে দিতে পারবো। দিদি সাপটির সব কথা মাথা পেতে নেয় এবং আমাকেও কাউকে কোনদিন না বলার জন্য নিষেধ করে দেয়। তখন থেকে সাপটি প্রতিদিন জুমে এসে কাজ করে দেয়। দিদির অংশের ভাত থেকে দিদি সাপটিকে খেতে দেয়। এভাবে সাপটি গাইরিং বা জুমঘর তৈরি করে দেয়, জুমের চারপাশে জংগল কেটে পরিষ্কার করে দেয়, জুমের ধানক্ষেতে পাখি তাড়াবার জন্য ওয়াখ্রব বসিয়ে গাইরিং বা জুমঘর পর্যন্ত রশি

www.pathagar.com

টেনে দেয়। ঝর্নার পানিতে স্নান করার জন্য সুন্দর সিড়ি কেটে দেয়। এভাবে প্রতিদিন দিদির অংশের ভাত থেকে সাপটিকে খেতে দেওয়ার ফলে দিদির শরীর দিন দিন ভেঙে যেতে থাকে। সাপটির জন্যে বাড়ি থেকে পৃথক ভাতমোচাও নিয়ে আসতে পারে না, যদি না পাশে সব কথা লোকে জেনে যায় সে ভয়ে। লোকে জানলে সাপটির মহাক্ষতি হবে ভেবে।

ছোট মেয়ের মুখে সব কথা শুনে সাপটিকে দেখা জন্য দর্বাসিং এর খুব ইচ্ছা হলো। মনে মনে ভাবে প্রবাদে আছে দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষতে নেই, যে কোন বিপদ হতে পারে। গোপন রহস্যটি কেউ জেনে গেলে অমংগল হবে। তাছাড়া মেয়ের অংশ থেকে সাপটিকে ভাত খেতে দিলে মেয়ে তো এমনিতেই মারা যাবে। বিভিন্ন রকম চিন্তা ভাবনা করে শেষে দর্বাসিং সিদ্ধান্ত নিল সাপটিকে মেরে ফেলতে হবে। মনে মনে এ কথা চিন্তা করে দর্বাসিং অচাই তার ছোট মেয়েকে বলল– মা তোমার দিদির স্বামী রূপী সাপটিকে আমার একবার খুবই দেখতে ইচ্ছে করছে। আমি তার কোন ক্ষতি করবো না। তাকে কিভাবে আনতে পারি? তুই আমাকে বিশ্বাস কর মা আমি কোনদিন তার কোন ক্ষতি করবো না। তুই যা বলবি আমি তাই করবো।

বাবার মিষ্টি কথা শুনে খুমবারতি বাবাকে বুঝিয়ে বলে যে দিদির স্বামীকে আনতে হলে আগে ভাল খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। সুগন্ধি চাউলের ভাত, ভাল মাছ মাংস আর ঝর্নার শীতল পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। তা শুনে দর্বাসিং অচাই তাড়াতাড়ি সমস্ত কিছু যোগাড় করে দিল। খুমবারতি আস্তে আস্তে রান্না করে সব সাজিয়ে রাখল। এদিকে দর্বাসিং অচাই গোপনে তার পূজার খর্গটিকে শুকনো বালি দিয়ে ভালভাবে শান দিয়ে রাখল। খুমবারতি সবরকম খাবার একটি কলাপাতায় সাজিয়ে মাচাঘরের খোলা জায়গা 'চাকেরেং' বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার দিদির স্বামীরূপী সাপটাকে ছড়া কেটে ডাকতে লাগলো। ডেকে ডেকে বলল– ওরে 'কুমুই' বা ভগ্নিপতি, তোমার জন্য সুগন্ধি চাউলের ভাত, ভাল ভাল মাছ মাংস রান্না করে মোচা বেঁধে রাখা হয়েছে, এগুলো তুমি খেতে আসো। আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। ত্রিপুরা ভাষায় বলতে থাকে–

কুমুই য়য়ই কুমুইয়ৈ
কুমুই মাইচানি ফায়
কুমুই তৈ নি ফায়।
মাইচু মাই মুতুম চুগই তনতিখা
তিলক তৈ কাচাং দাগই তনতিখা
কুমুই মাইচানি ফায়।

এভাবে চাকেরেং এর মাথায় দাঁড়িয়ে তার ভগ্নিপতি সাপটিকে করুণ সুরে ডাকতে ডাকতে সাপটি চলে আসতে থাকে। বাড়ির কাছে এসে চাকেরেং বা বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতে লাগলো। সিঁড়ির মাথায় যখন উঠল তখন মাথাটি রোদের আলোয় ঝিকমিক করতে লাগলো। এমন সময় তার শ্বশুড় দর্বাসিং অচাই দৌঁড়ে এসে তার হাতের খর্গটি দিয়ে সাপটিকে কেটে ফেললো। সাপটি তখন মাটিতে লুটিয়ে

www.pathagar.com

পড়লো। সাপটিকে কেটে দর্বাসিং অচাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরে তার ছোট মেয়ে খুমবারতি কাঁদতে কাঁদতে সাপের কাটা টুকরাগুলি একটি একটি করে কুড়িয়ে নিল। তারপর এক একটি টুকরো এক একটি স্থানে রাখতে রাখলো। প্রথমে এক টুকরো বাখল নেই খুমপুই ফুলের বাগানে। পরেরটি স্নানের ঘাটে যাওয়ার রাস্তায়, আরেকটি রাখল স্নানের ঘাটে, এক টুকরো রাখল চাউলের ভাণ্ডে, এমনি করে তার বড় বোন খুমপুইতি যেখানে যেখানে যায় সে সকল জায়গায় সাপটির কাটা টুকরোগুলো রেখে খুমবারতিও ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

তার বড়দিদি খুমপুইতি নারন বাড়ি থেকে কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে দেখে বাড়িতে তার বাবা ও ছোটবোন কেউই নেই। শুধু তাদের ছোট কুকুর ছানাটি আছে। কুকুর ছানাটি শুধু এদিক ওদিক করে কেঁউ কেঁউ করে ডাকছে। খুমপুইতি ঘরে এসে তার পরনের রিনাই রিছা বা পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে ঘাটে স্নান করতে গেল। স্নান করতে গিয়ে রাস্তায় কুকুর ছানাটির বদৌলতে তার স্বামীর গায়ের রঙের মত সাপের এক টুকরো কাটা অংশ দেখতে পেল। স্নান সেরে খোপায় পরার জন্য বাগানে ফুল তুলতে গেলে তখন বাগানেও এক টুকরো কাটা অংশ দেখতে পেল। ভাত রান্না করার জন্য চাউলের ভাণ্ড খুলতে গিয়ে সেখানেও সাপের এক টুকরো কাটা খণ্ড দেখতে পেল। সে বুঝতে পারলো সাপের এইসব কটা খণ্ডগুলো তার সর্পরূপী স্বামীরই। অতঃপর সাপের কাটা খণ্ডগুলিকে খুব যত্ন সহকারে একত্রে মালা গেঁথে তার গলায় পরে নিল। ঘর থেকে পাদপ্রদীপ ধুপ জোগাড় করে নদীর ধারে গিয়ে একটি স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিল। তারপর সুন্দর করে লেপন করে একটি পাতার উপর সেই মাংস খণ্ডের মালাটি রেখে তাতে ফুল সাজিয়ে দিল। ধুপ দীপ জ্বেলে প্রার্থনার সুরে ছড়া কেটে বলতে লাগলো। সাপটির নাম ছিল 'দুংগুই'। সে দুংগুইকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল– ওহে দুংগুই! তুমি চলে আসো, তোমার অভাগা স্ত্রীকে নিয়ে যাও! আমি তোমায় বার বার ডাকছি। যেটিকে ত্রিপুরা ভাষায় বলে–

দুংগুই য়য়ই দুংগুই য়ৈ
আনো তিলাংনি ফায়,
আনো তিলাংনি ফায়।
নুখুই দুখিয়া জুকমা ফাইতিয়ৈ
রিখনদং দুংগুই ফায়
আনো তিলাংনি ফায়।

খুমপুইতি এভাবে কেঁদে কেঁদে তার সর্পরূপী স্বামীকে ডাকতে লাগলো। এমন সময় নদীতে পাহাড় সমান ঢেউ এসে বালুচরে আছড়ে পড়তে লাগলো। এবং ক্রমে খুমপুইতিকে নদীর ঢেউ গ্রাস করে নিয়ে যেতে থাকলো। এমন সময় তার ছোটবোন খুমবারতি দৌড়ে এসে বললো– দিদি তুমি যেও না, তুমি চলে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকবো! বাবা আমাকে ফেলে চলে গেছে, আমি একা কি করে থাকবো। তখন কিন্তু তার দিদি নদীর ঢেউয়ের সাথে ডুবে যেতে থাকলো, ডুবে যেতে যেতে ছোট বোনকে বললো– তুমি কোন চিন্তা করো না, তুমি তো অপরূপা সুন্দরী! তোমাকে সবাই স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবে। তোমার কোন চিন্তা করতে হবে না। নদীর দক্ষিণ দিকে বিশাল

www.pathagar.com

একটি মাঠ আছে, মাঠের শেষ প্রান্তে চৌমাথা রাস্তায় একটি বিরাট বটগাছ আছে। তুমি সেখানে যাও! সেখানে গিয়ে সেই বটগাছটার ডালে বসে থাকবে। প্রতিদিন বিকেলে সেখানে রাজার শিকারিরা শিকার করতে আসে। তোমার রূপ দেখে তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে. তমি কি রাক্ষুসী, দানবী না মানবী? নাকি কোন দেবী বা পরী? তখন তুমি তাদের বলবে, তুমি কোন রাক্ষুসী, দানবী, দেবী বা পরী নও। তুমি মনুষ্য কন্যা। তখন রাজার শিকারিরা এ খবর রাজার কাছে পৌঁছে দেবে। রাজা এসে তোমাকে একই প্রশ্ন করবে। তুমি রাজাকেও একই উত্তর দেবে। তোমার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তোমাকে তাঁর রাজ্যে নিয়ে যাবেন, এবং তোমাকে রাজরাণী করবেন। তোমার আর কোন চিন্তা থাকবে না। যদি কোন কারণে তুমি বিপদে পড় তখন আমায় স্মরণ করবে। আমি তোমাকে সাহায্য করতে আসবো। এ কথা তুমি দুঃখে বা সুখে ভুলে যাবে না কখনও। কথাগুলি বলতে বলতে খুমপুইতি নদীর ঢেউয়ের তালে তালে নদীর জলের সাথে মিশে গেলো।

এদিকে খুমবারতি তার দিদির কথা মতো নদীর দক্ষিণ দিকের বিস্তীর্ণ মাঠ ধরে একা একা হাঁটতে লাগলো। একা একা বহুদূর হাঁটার পর সেই চৌমাথা আস্তার বটগাছের কাছে গিয়ে পৌছুলো, তারপর বটগাছের ডালে উঠে বসে থাকলো। বিকেলে রাজার শিকারিরা পাখি শিকার করার জন্য তীর ধনুক নিয়ে সেই বচগাছের নিচে পৌঁছল। তারা খুমবারতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থেকে পরে একজন শিকারি দলনেতা সাহস করে জিজ্ঞাসা করল— কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? তুমি রাক্ষুসী না কোন দানবী পিশাচী? উত্তরে খুমবারতি বলল— আমি কোন রাক্ষুসী দানবী বা পিশাচী নই। আমি একজন মনুষ্য কন্যা।

তখন সবাই তার কথায় আনন্দিত হয়ে রাজার নিকট গিয়ে বলল— মহারাজ! কি এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে দেখে এসেছি! তাঁর রূপের আলোয় বটগাছটি পর্যন্ত চাঁদের আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমরা পাখি শিকার করতে সেই চৌমাথা রাস্তায় বটগাছের কাছে গিয়ে দেখি বটগাছটির ডালে বসে আছে সেই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি। তাঁকে আমরা সবকিছু জিজ্ঞাসা করার পর সে উত্তর দিল, সে কোন রাক্ষুসী, দানবী বা পিশাচী নয়, সে একজন মনুষ্য কন্যা। চলুন মহারাজ! তাঁকে আপনি নিজের চোখে দেখলেই তবেই বিশ্বাস করবেন। পাখি শিকারিদের কথা শুনে রাজা তাঁর পাত্র মিত্র সভাসদগন নিয়ে পালকীতে চড়ে সেই বটগাছের নিচে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন- পাখি শিকারিরা যেভাবে বর্ণনা দিয়েছে তা চাইতে মেয়েটি আরো বেশি সুন্দরী ও রূপসী। রাজা স্বয়ং একই প্রশ্ন করে দেখলেন, খুমবারতি সেই একই উত্তর দিলো।

অতঃপর রাজা সেই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটিকে পালকিতে করে রাজবাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর পাত্র মিত্রদেরকে আদেশ দিলেন। খুমবারতিকে রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। রাজা আদেশ দিলেন বিয়ের আয়োজন করতে। আদেশ পেয়ে রাজার সভাসদ, পাত্র মিত্র, সিপাহী, লস্কর সবাই অতি উৎসাহে মহা আনন্দের সাথে বিবাহের আয়োজন করতে লাগলো। যথাসময়ে মহা ধুম দামের সহিত রাজার সাথে খুমবারতির বিয়ে হয়ে গেলো। ইতিপূর্বে রাজা আরো ছয়টি রাণীকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁদের কোন ছেলেপুলে নেই। তাদের সঙ্গে তেমন কোন সম্পর্কও নেই রাজার। তাই খুমবারতি এখন

www.pathagar.com

রাজার খুব আদরের রাণী হয়ে গেলো, এবং অতি আনন্দে দিন কাটাতে লাগলো। খুমবারতির যা যা দরকার তার সবই রাজা পুরন করে দেন, এবং তার সব ইচ্ছা পূরণের জন্য রাজা সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। এমনিভাবে অতি সুখে খুমবারতির দিন কাটতে লাগলো।

এভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, খুমবারতির গর্ভে সন্তান এলো। রাজা তো মহাখুশি। তাদের ঘরে সন্তান আসবে। দশ মাস দশ দিন পর যথারীতি খুমবারতির প্রসবকাল উপস্থিত হলো। রাজা অত্যন্ত খুশি হয়ে সোনার দোল না কিনতে গেল, এবং যাবার সময় ভৃত্যদের বলে গেল সন্তান প্রসব হলে তাঁকে খবর দিতে। খবর দেওয়ার সুবিধার্থে রাজবাড়ি হতে স্বর্ণের দোকান পর্যন্ত লম্বা রশি টেনে দেয়া হলো। রশি ধরে টান দিলে রাজা বুঝতে পারবেন ছোটরাণীর সন্তান প্রসব হয়েছে। অমনি সংগে সংগে রাজা চলে আসতে পারবেন।

ওদিকে হলো কী! রাজা সোনার দোলনা আনতে গেলে খুমবারতিকে অপর ছয়রাণী নানারকম টিটকারী দিতে লাগলো। কেমন সুন্দরী রাণী! রূপের জৌলুসে মাটিতে যেন পা পড়ে না। কেমন তার রূপের বাহার! এখন বাচ্চা একটা হলে তার দাপট আরো বেড়ে যাবে, এই ভেবে খুমবারতিকে নানারকম হয়রানীমূলক কথাবার্তা বলতে লাগলো। এদিকে খুমবারতি প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে। অন্য রাণীরা তাকে রাজবাড়িতে বাচ্চা প্রসব করতে দিল না। নব রাণীই একবাক্যে বলল, ছোটরাণীকে রাজবাড়িতে বাচ্চা প্রসব করতে দিলে রাজবাড়ি অশুচি হয়ে যাবে। তা ফুলবাগান বা বিশ্রামাগার যেখানেই হোক না কেন। এই বলে ছয়রাণী আদেশ করলো-স্নানের ঘাটের পাশে নিয়ে তাকে বাচ্চ প্রসব করাতে, এবং প্রসবকালীন তাঁর চোখ বেঁধে রাখতে। বাচ্চা হলে জ্যান্ত হোক আর মরা হোক নাভি কেটে নদীতে ফেলে দিয়ে তার বদলে কুকুর অথবা বিড়াল ছানা রেখে দিতে। যাতে রাজাকে দেখানো যায় যে, ছোটরাণী কুকুর ও বিড়াল ছানা প্রসব করেছে। এই আদেশ রাণীরা সকল ভৃত্যদের ডেকে জানিয়ে দিল।

ছয়রাণীর নির্দেশে ভৃত্যরা ছোটরাণী খুমবারতিকে বাচ্চা প্রসব করানোর জন্য স্নান ঘাটের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে তাঁকে চোখ বাঁধা অবস্থায় রাখা হল। যথাসময়ে খুমবারতি পর পর ছয়টি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিল। অন্য ছয় রাণীর নির্দেশ অনুযায়ী ধাত্রীরা নাভী কেটে বাচ্চাদের নদীতে ফেলে দিয়ে দিয়ে তার বদলে কুকুর ও বিড়াল ছানা রেখে দিল। এবং রশি টেনে বাচ্চা প্রসবের কথা রাজাকে জানিয়ে দিল।

ইতোমধ্যে রাজা সোনার দোলনা নিয়ে এসে দেখে ছোটরাণী কয়েকটি কুকুর ও বিড়ালছানা প্রসব করেছে। তখন ছয়রাণী হাসতে হাসতে রাজাকে বলে— মহারাজার আদরের স্ত্রী কুকুর ও বিড়ালছানা প্রসব করেছে। ভালই হয়েছে, এবার রাজভাণ্ডার খরচ করে তাদের লালন পালন করতে হবে। তাও একটা দুইটা নয় একেবারেই সাত সাতটি। রাজা রাণীদের বিদ্রূপ সহ্য করতে না পেরে ছোটরাণী খুমবারতিকে নদী তীরে ঘর তৈরি করে সেখানে বাস করতে পাঠিয়ে দিল। এবং রাজবাড়ির হাঁসগুলি চড়ানোর আদেশ দিল। তখন হতেই খুমবারতি ছেড়া রিনাই ও রিছা বা পোষাক পরিচ্ছদ পরে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হাঁস চড়াতে লাগলো। এভাবে অতি দুঃখ কষ্টের মধ্যে খুমবারতির দিন কাটতে লাগলো।

www.pathagar.com

বিভিন্ন অপকৌশলের মাধ্যমে ছোটরাণী খুমবারতিকে রাজবাড়ি থেকে তাড়াতে পেরে ছয়রাণী বেজায় খুশি। তারা আবার নতুন করে রাজার প্রিয় পাত্রী হয়ে উঠলো। নতুনভাবে তারা রাজার সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে লাগলো। এদিকে প্রজারা নদীর স্নান করতে গেলে নদীতে বাচ্চা দোলনার শব্দ শুনতে পায়। দোলনার শব্দের সাথে শুনতে পায় কে যেন বলছে– মা, বাবারা তোমরা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠো, হাঁস চড়ানোর কাজ করে তোমাদের মা অতি কষ্টে দিন যাপন করছে। তোমাদের মায়ের দুঃখ কষ্ট তোমাদেরকেই মোচন করতে হবে। এখন তোমরা ঘুমাও ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতিদিন লোকেরা স্নান করতে এসে এ ধরনের আভাস পায়। ত্রিপুরা ভাষায় ছড়ার ছন্দে বলে–

(১)

তুতু তুই তুয়া য়াং খাইতিদং আপারক
রাংচাকনি ওয়ায়িংগো বকতিয়ৈ
রূপহিনি বুদুক বাই নালতিদং
থুতিদৈ আপারক থুতিদৈ আমারক।

(২)

নামালাই রাজানি তাখুম বেঁয়ামা
অংগোই মা তংখা, হানি দুখুনো
খারাই মা তংখা, দাকতুই তরদিনক
আপারক দাকতুই তরদি নক
আমারক হৈ হৈ থুতিদি।

প্রতিদিন এভাবে দোলনা দোলার শব্দ শোনা যায়। মাঝে মাঝে ঘাটের নিচের দিকে, মাঝে মাঝে উপরের দিকে। ক্রমে একথা রাজার কানে গেল। তখন থেকেই কিন্তু এই রহস্য জানার জন্য রাজ্যের সবাই আগ্রহী হয়ে উঠে। ঘাটে কেউ না থাকলে এমনি করে সাত ভাই বোন নদীর কূলে উঠে দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলা করে। মানুষজন আসতে দেখলে দৌঁড়ে নদীতে চলে যায়। এ ধরনের দৃশ্য দু'একজন প্রজার চেখে পড়ে গেল। তারা গিয়ে রাজাকে এ কথা জানালো। তারা বললো– মহারাজ! আপনি হয়তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। এতদিন আমরা নদীতে স্নান করতে গিয়ে বাচ্চা দোলনার শব্দ শুনে এসেছি। এবার নদীর তীরে ছয়টি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে ও একটি মেয়ে খেলা করতে দেখেছি। একবার নয় পর পর দু'তিনবার আমারা এভাবে দেখেছি। ছেলেগুলি দেখতে একেবারেই রাজপুত্রের মত, আর মেয়েটি দেখতে রাজকন্যার মত। মানুষ দেখলে টুপ করে নদীতে ঝাপ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। মহারাজ! এটি এক আশ্চর্য ঘটনা, তল্লাসী করা প্রয়োজন। তাদের কথা শুনে রাজা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। নিজের চোখে ঘটনাটি দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন। আরো একদিন রাজার এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর চোখে সেই দৃশ্য ধরা পড়ে। দৃশ্যটা তাড়াতাড়ি রাজাকে খবর দেওয়া হলো। রাজা এসে দূর আড়াল থেকে দেখলেন রাজপুত্রের ন্যায় ফুটফুটে সুন্দর ছয়টি ছেলে এবং রাজকন্যার মত একটি মেয়ে নদীর তীরে খেলা করছে। রাজা দৃশ্যটি দেখে

www.pathagar.com

খুবই আশ্চর্য হলেন। কেউ কাছে গেলে নদীতে ঝাপ দিয়ে সবাই অদৃশ্য হয়ে যায়। এরহস্য জানার জন্য রাজা রাজ্যের যত জেলে আছে তাদের সবাইকে নিয়ে এসে হাজির করালেন। এবং ডেকে নির্দেশ দিলেন– তোমরা কাল থেকে নদীর ঘাটে জাল ফেলে তীরে টানবে, যেন পানির কোন জলজ প্রাণী, এমন কি ছোট্ট পাথরও যেন বাদ না যায়। সবকিছু যেন জালে আটকা পড়ে উঠে আসে। রাজার কঠোর আদেশে রাজ্যের যত জেলে আছে সকলে নদীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বড় বড় জাল ফেলে টানতে লাগলো। তখন জেলেরাও এ ধরনের আভাস পেতে থাকল, নদীর উপর দিক থেকে টানলে শব্দটি নিচের দিকে শোনা যায়, আর নিচের দিক থেকে টানলে উপরের দিকে শোনা যায়। সাতদিন সাতরাত ধরে না খেয়ে জেলেরা নদীর উপর নিচ করে জাল ফেলে টেনে দেখল কিন্তু কোনভাবেই ছেলে মেয়েদের জালে আটকাতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল সবাই। সেই ছেলে ঘুম পাড়ানোর গান কিন্তু সবার কানে কানে বাজতে লাগলো। মহারাজা বিষয়টি নিয়ে মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। সভাসদ পাত্রমিত্রদের নিয়ে আলাপ করেও কোন কূল কিনারা করতে পারলেন না।

সাত ভাইবোন দিন দিন বড় হতে লাগলো। একদিন তাদের মাসী খুমপুইতি তাদের ডেকে বললো– শুনো বাছারা! তোমাদের মায়ের নাম খুমবারতি। সে ছিল খুবই সুন্দরী মেয়ে। আমি বড় আর সে ছোট। আমরা দু'বোন মিলে প্রতিদিন জুমে কাজ করতে যেতাম। কিন্তু আমাদের জুমে কোন গাইরিং বা জুমঘর ছিল না। বৃষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়ে আমাদেরকে জুমের কাজ করতে হতো। এরপর থেকে যা যা ঘটেছিল সমস্ত ঘটনা তাদের একে একে খুলে বললো। শেষে খুমপুইতি তার বোন ঝি ও বোনপোদেরকে বললো, তোমরা সবাই আমার কথা মত কাজ করবে। আগামীকাল তোমরা সেই বটগাছের নিচে যাবে, গিয়ে সেই বটগাছের উপর উঠে তোমরা সাতভাইবোনে সাতটি ডালের উপর উঠে বষে থাকবে। রাজার পাখি শিকারিরা দেখতে পেলে তোমাদের নানারকম প্রশ্ন করবে। তোমাদের মাকে যে রকম প্রশ্ন করেছিল ঠিক সেই রকম প্রশ্ন করবে। তোমরাও তোমাদের মায়ের মত উত্তর দেবে। এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলবে– আগে আমরা আমাদের মায়ের দেখা করবো তারপর আমাদের পরিচয় দেবো। যদি রাজার শিকারিরা জিজ্ঞাসা করে তোমাদের মায়ের পরিচয় কি? তখন তোমরা বলবে, যে মহিলা মাটিতে দাঁড়িয়ে বুকের দুধ টিপে দুধের সাতটি নাল হয়ে আমাদের মুখে দিতে পারবে সেই আমাদের মা। তোমাদের মায়ের পরিচয় পেলে বটগাছ থেকে নেমে পা ধরে প্রণাম জানিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরবে।

সাতভাই বোনকে এভাবে সব কথা বুঝিয়ে বলে তাদের মাসীমা খুমপুইতি রাস্তার চৌমাথায় সেই বটগাছের সাতটি ডালে বসিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। তারাও মাসীমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাসীমার কথামত বটগাছের সাতটি ডালে উঠে বসে রইলো। এমন সময় রাজার শিকারিগণ এসে তাদের দেখে আশ্চর্য হল। এক একটি ছেলে যেন এক একটি পূর্ণিমার চাঁদ। আর মেয়েটি যেন পূর্ণিমার আলো। পাখি শিকারিরা তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা বললো, তাদের মাকে পেলে তবেই তাদের পরিচয় দেবে। এরপর শিকারিরা তাদের মায়ের পরিচয় জানতে চাইল। উত্তরে

www.pathagar.com

তারা বললো, যে মহিলা বুকের দুধ টিপে দুধের সাতনাল দিয়ে তাদের সাত ভাই বোনের মুখে ফেলতে পারবে সেই মহিলাই তাদের গর্ভধারিণী মা।

সাত ভাইবোনের কথা শুনে শিকারিরা আবার দৌড়ে গিয়ে রাজার নিকট বিস্তারিত জানালো। শিকারিদের মুখে সব কথা শুনে মহারাজা তার সভাসদ, পাত্রমিত্র এবং সহচরদের নিয়ে সেই বটগাছের নিচে আসলেন, সাথে ছয়রাণীকেও নিয়ে আসলেন। ছয় ছেলে এক মেয়েকে দেখে রাজা খুবই খুশি ও মুগ্ধ হয়ে যান। তাদের মায়ের পরিচয় নেওয়ার জন্য। ছয় রাণীসহ রাজ্যের সকল মায়েদের বুকের দুধ টিপে সাত ভাইবোনের মুখে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন রাজা। কিন্তু ছয় রাণীদের বুকে তো কোন দুধই বেরুলোনা না, এবং অন্য রমণীদের বুকে দুধ বের হলেও বটগাছের ডাল পর্যন্ত উঠাতে পারলো না। এভাবে একে একে সব রমণীর বুকের দুধ পরীক্ষা করার কাজ শেষ হলো। এখন বাকি আছে শুধু রাজার সেই অভাগিণী ছোট রাণী। যাকে রাজা অন্য ছয় রাণীর চক্রান্তে কুকুর বিড়াল ছানা প্রসব করার মিথ্যা অপবাদে রাজবাড়ির সকল হাঁস চড়ানোর কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। রাজা তাকে ডেকে এনে হুকুম দিলেন বুকের দুধ টিপে সাত ভাইবানের মুখে দুধ ফেলার জন্য। রাজার হুকুম পেয়ে খুমবারতি ছেড়া কাঁথা পড়ে হত দরিদ্র বেশে বট গাছটির নিচে আসলো এবং তার দিদি খুমপুইতি'র নাম স্মরণ করে মনে মনে বললো, দিদি! ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, বাবাকে হারিয়েছি, সবশেষে তোমাকেও হারালাম। এখন আমার অগ্নি পরীক্ষায় তুমি যদি সাহায্য না কর তাহলে আমাকে আরো দুঃখ ভোগ করতে হবে। তাই তুমি আমাকে এই অগ্নি পরীক্ষা থেকে মুক্ত করো, আমাকে বাঁচাও। এই বলে বুকের আঁচল সরিয়ে দুধ বের করে যখন দুধে টিপ দিল অমনি সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ার মত সাতনাল দুধ বেরিয়ে এসে সাত ভাইবোনের মুখে গিয়ে পড়লো। তারপর সাত ভাইবোন বটগাছের ডাল থেকে নেমে এসে তাদের মাকে প্রণাম করে বুকে জড়িয়ে ধরলো। সেখানে উপস্থিত রাজা রাণী, অমাত্য এবং প্রজা সকল এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে যারপর নাই অভিভূত হয়ে পড়লো।

অতঃপর সাত ভাইবোনের মধ্যে সবার চেয়ে যে বড়, অর্থাৎ বড়ভাই তাদের মায়ের সকল ঘটনা বিস্তারিত মহারাজের নিকট খুলে বললো। রাজা তখন নিজে অনুশোচনায় ভুগে অতি আদর যত্নের সাথে তাদের সবাইকে পালকীতে করে রাজবাড়িতে নিয়ে গেলেন। ছলনা ও হিংসার অপরাধে রাজা ছয় রাণীকে গহীন জংগলে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন। ছেটরাণী খুমবারতিকে পুনরায় রাণীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলে নিলেন। রাজা খুমবারতি ও তার পুত্র কন্যাকে নিয়ে মহা সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

তঞ্চঙ্গ্যা রূপকাহিনি

কলাথুর কন্যা

(কলাবতী কন্যা)

অনেক অনেক আগে থেকেই আরাকান রোয়াং দেশ নামে পরিচিত ছিল। চাকমাদের একটি শাখাকে রোয়াইঙ্গ্যারা (আরকানীরা) 'দৈংনাক' নামে অভিহিত করে থাকে।

www.pathagar.com

মারমারাও তাদেরকে 'দৈংনাক'ই বলে। এখনো বার্মা'য় বর্তমান মিয়ানমার এ তাদেরকে 'দৈংনাক' বলা হয় এবং সে দেশে এখনো চাকমাদের সেই শাখাটি বসবাস করছে।

একবার একদল দৈংনাক, স্বজাতি চাকমাদের অনুসরণ করে 'আনক' (চট্টগ্রাম) এ চলে আসে। অন্যান্যদের মত চক্রধন আঙুও আত্মীয় স্বজন এবং তার অনুগত লোকজন নিয়ে আরাকান থেকে 'আনক' বা চট্টগ্রামে চলে আসে। প্রথমে তারা আলীকদমের তৈনছড়ির অববাহিকায় বসতি স্থাপন করে। উল্লেখ্য যে, রোয়াং দেশ থেকে 'আনক' বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসার পর তৈনছড়িতে বসতি স্থাপন এবং কিছুকাল সেখানে অবস্থান করায় তারা 'তৈনছর্য্যা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

তারা সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে মাতামুহুরী নদীর অববাহিকা এবং শংখ নদী পার হয়ে বড়গাং বা কর্ণফুলি নদীর পাড়ে এসে পড়ে। কর্ণফুলির উজানে অগ্রসর হয়ে চন্দ্রঘোনার কয়েক মাইল উজানে রাম মোইন, সীতা মোইনে (মোইন শব্দের অর্থ হচ্ছে পাহাড়) এসে থামে। তখন সেখানে জুমচাষের উপযোগী প্রচুর বনভূমি ছিল। অনেকে সেখানে বসতি গড়ে তোলে। আবার কেউ কেউ কর্ণফুলির ওপারে ওয়াগ্‌গা, পূর্বে কাপ্তাই আর রাইংখং নদীর অববাহিকায় বসতি স্থাপন করে। তারা তৈনছড়ি থেকে এসেছে বলে চাকমা রাজার ভূমি অফিসের জুম তৌজিতে তাদেরকে তৈনছর্য্যা চাকমা নামে তৌজিভুক্ত করা হয়। এই তৈনছর্য্যা শব্দটিই কলক্রমে তৈনচংগ্যায় রূপ লাভ করে বলে গষেকদের ধারণা। এবং বর্তমানে সেই শব্দটি 'তঞ্চঙ্গ্যা'য় পরিবর্তিত হয়।

এবার আসা যাক 'কলাথুর কন্যা' নামে রূপ কাহিনিতে। এই কাহিনিটি হলো সেই সময়ের, যে সময়ে তঞ্চঙ্গ্যারা রাম পাহাড় আর সীতা পাহাড়ে জুম চাষ করতো। চক্রধন আঙু'র আত্মীয় স্বজনরা সীতা মোইন বা সীতাপাহাড়ে বসতি স্থাপন করে। তার মেঝো মেয়ে সনামালা বিধবা। সে আর দিতীয় বার বিয়ে করেনি। রোয়াং রাজ্যে কলাডেন নদীর পাড়ে কুমুখ্যা পাড়ায় তাদের ঘর ছিল। তার বাবা চক্রধন আঙু যখন তার দলবল নিয়ে 'আনক' বা চট্টগ্রামে চলে আসে, সে সময় বিধবা সনামালাও তার একমাত্র সন্তান রাঙাধন'কে নিয়ে এখানে চলে আসে। সে তার বাবার সাথে থাকে না। রাঙাধন'কে নিয়ে পৃথক ঘরে থাকে। তার ভাইয়েরা জুমচাষ করার জন্য গভীর বনজংগল কেটে দেয়। কাটা জংগল শুকিয়ে গেলে আগুনেও পুড়িয়ে দেয়। সনামালা আধমরা গাছের ডালপালা সাফ করে জুমচাষের জন্য উপযোগী করে তোলে। তার ভাইয়েরাও এতে সাহায্য সহযোগীতা করে। বৃষ্টি পড়ে মাটি নরম হলে সেখানে ধান, তিল, কার্পাস ইত্যাদি নানারকম ফসলের বীজ বুনে। জুমক্ষেতের আগাছা সাফ করে ধান পাকলে পাকা ধান কেটে ঘরে তোলে। রাঙাধন তখন চৌদ্দ-পনের বছরের কিশোর। সে তার মামাদের সাথে জুমের জংগল কাটা থেকে শুরু করে নানারকম কাজ করে মাকে কিছু কিছু সাহায্য করতে থাকে। তবে বেশীরভাগ সময় তার খেয়াল খুশিমত এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে সময় কাটায়।

সে সময় রাম মোইন, সীতা মোইনে বিশাল বিশাল বৃক্ষরাজির ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর 'তেল্যাকলা'র (এক প্রকার জংলী কলা) থোর পাওয়া যেতো। এসব দেখতে অনেকটা বেগুনী রঙের মত। এগুলো তেলতেলে ও মসৃন হয়ে থাকে। সে সময়ে রাঙাধন সবে কৈশোরে পদার্পণ করেছে। উঠতি বয়সে তার মনে তখন রঙিন রঙিন ভাবনার উদয়

www.pathagar.com

হওয়া স্বাভাবিক। তার মামাদের সাথে জুমের জংগল কাটা থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজে যায় বটে কিন্তু মন দিয়ে কাজ করে না বা করতে চায় না। তার খেয়াল খুশিমত চলতে চায়। কাজ করতে করতে সে প্রায় সময় ছড়া বা ঝিরির পাড়ে তেল্যাকলার বনে গিয়ে তেল্যাকলার থোরগুলি চেয়ে দেখে। আর কলাগাছের আগায় কচি পাতার উপর যে রোদের ঝলক পড়ে, সেইসব চেয়ে চেয়ে দেখে। কচি কলাপাতা গুলো মৃদু বাতাসে দোল খেয়ে যখন সূর্যের আলো তাতে আছড়ে পড়ে ঝিলিক মারে তখন খুব সুন্দর লাগে। রাঙাধন তাতে মোহিত হয়ে আনমনে হেঁসে উঠে। মনে মনে ভাবে, তেল্যাকলার থোর এত সুন্দর হয় কি করে? তার মাসতুতো বোন ধংমালা তার চেয়ে দু'বছরের বড়। রাঙাধন তাকে মনে মনে তুলনা করে তেল্যাকলার থোরের সংগে। বেগুনী রঙের পিচ্ছিল তেলতেলে কলার থোরে যে মোহময় লাবণ্য, তা সে ধংমালার মাঝে দেখতে পায়। আর মনে মনে ধংমালাকে তার বৌ হিসেবে কল্পনা করে ঘরে তুলে আনতে চায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ তার মাকে জিজ্ঞাসা করে- মা! ধংমালা কবে আমাদের এখানে আসবে? তার মা সনামালা বুঝতে পারে তার ছেলে রাঙাধনের মনের জোয়ারে যৌবনের পালে হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। কিন্তু মুখে কিছুই বলে না, কারণ তার মা জানে ধংমালার সাথে তার বাবা চক্রধন আঙু'র আরেক নাতির আই ফাই (ভালবাসা) চলছে।

একদিন যুবক রাঙাধন তার মামাদের সাথে জংগল কাটতে যায়। কিছুক্ষণ সে জংগল কাটার পর তার মামাদের থেকে সরে গিয়ে জুমের শেষ প্রান্তে ঝিরির পাড়ে চলে যায়। সেখানে ঘন তেল্যাকলার বন। তখন ফাল্গুন মাস। তেল্যাকলার থোরগুলো বাতাসে দোলা দিচ্ছে, আর রোদের সোনালী আভা পড়ে কোমল মসৃণ কলাপাতাগুলো যেন ঝিকঝিক করছে। রাঙাধনের দৃষ্টি সেদিকে আটকে গেল। কলারথোরের অপরূপ লাবণ্য আর কচিপাতা গুলোর ঝিকিমিকি দেখে রাঙাধন পুলকিত হয়ে খিল খিল করে হাঁসতে থাকে। তখন তার চোখে স্পষ্টভাবে ভেসে উঠে ধংমালার রূপলাবণ্য। তখন সে এই লোভনীয় কলার থোর আহরনের জন্য কলাগাছগুলো কাটতে শুরু করে দিল। চারটি কলাগাছ কাটার পর পঞ্চমটি কাটতে যাবে অমনি হঠাৎ এক কোমল নারী কণ্ঠ তার কনে এল। নারী কণ্ঠ বলল- রাঙাধন তুমি কলাগাছ গুলো কেটে ফেলে আমার থাকবার জায়গাটুকু নষ্ট করছো কেন? রাঙাধন বিস্ময়ে হতচকিত চোখে চারিদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো— তুমি কোন অচেনা নারী আমার নাম ধরে ডাকছো? এবার কলাগাছের আগা থেকে রাঙাধন স্পষ্ট শুনতে পেল, সে বলছে আমি 'কলাখুর কন্যা'। রাঙাধন অবাক বিস্ময়ে দেখলো, কলাগাছের আগা থেকে কলার থোরের রঙের মত এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা বের হয়ে আসছে! তার পরনে কচি কলাপাতার রঙে সাজানো কোমল মসৃন চকচকে পিনোন খাদি। রাঙাধন তাকে দেখে যেমন বিস্মিত হলো তেমন পুলকিত হলো। একটু ভেবে সে হেঁসে হেঁসে বলল— আমি তোমাকে চিনি না অথচ তুমি আমাকে চেনো,আমার নাম ধরে ডাকও দিলে। তুমি কে বলো তো? সংগে সংগে কলাখুর কন্যা উত্তর দিলো— আমি কলাখুর কন্যা, আমি তোমাকে চিনি। কালাডেন গাঙের পাড়ে আমাদের ঘর। আমার এখনো মনে আছে, তোমরা আসার সময় আমাদের ঘরের সম্মুখ দিয়ে এসেছিলে। তুমি আমার থাকার

www.pathagar.com

জায়গা নষ্ট করে দিয়েছ,তাই আমাকে এখন তোমার সংগে তোমাদের ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

রাঙাধন বিস্ময়ে হতবাক হলেও মনে মনে দারুণ খুশি। কলাখুর কন্যাকে দেখে সে ভীষণ মোহিত হয়ে গেলো। সিড়ি বানিয়ে সে উপরে উঠে কলাখুর কন্যাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে নিচে নামিয়ে আনলো। তারপর হাত ধরে তাকে উঠোনে নিয়ে এসে তার মা'কে ডাকতে লাগলো- মা! মা! দেখ, আমি কলাখুর কন্যাকে বৌ করে ঘরে নিয়ে এসেছি।

তখন রাঙাধনের বড় মামা বিষুরাম আর ছোট মামা খূলারাম কাজ থেকে ফিরে এসে ভাত খাওয়ার জন্য 'চাহ্না' বা বারন্দায় বসে অপেক্ষা করছে। তাদের বোন রাঙাধনের মা সনামালা তখন ভাত খাওয়ার আয়োজন করছে। তারা একপলক দেখলো কলাখুর কন্যাকে। দেখে চমকিত হলো। কলাখুর কন্যা কিন্তু তাদের দেখে ঘরে উঠলো না। কিছুদুর দৌড়ে গিয়ে বনে আত্মগোপন করলো। রাঙাধনের ছোটমামা তখন কিন্তু পরিপূর্ণ তরতাজা একজন যুবক। রাঙাধনের চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়। সে তখনো বিয়ে করেনি। তার ভগিনা রাঙাধন কলাখুর কন্যাকে বৌ করে নিয়ে এসেছে জেনে খুবই দুঃখ পেলো। মনের দুঃখে অভিমান করে সে আর ভাতও খেলো না। তার দিদি সনামালা তাকে অনেক বোঝালো। খুলারাম জেদ ধরে বসে রইলো। সনামালা বার বার অনুরোধ করেও সে আর ভাত খেলো না।

এদিকে কলাখুর কন্যা সেই যে কলার বনে ঢুকে আত্ম গোপন করেছে, সেখান থেকে আর বের হচ্ছে না। ভাত খাওয়ার পর বড়ভাই বিষুরাম আবার কাজে চলে গেলো। এদিকে ছোটভাই খুলারাম অনাহারে ঘরে শুয়ে রইলো, সে আর কাজে গেলো না। তার দিদি সনামালা তাকে অনেকভাবে বুঝিয়ে বললো– দেখ! তোমার ভাগিনা বৌ কে দেখে অভিমানে ভাত খাচ্ছো না, লোকে জানলে তোমাকে হাঁসবে, পাগল বলবে। এসো তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে কাজে যাও। উত্তরে খূলারাম বললো– আমি পাগল নই দিদি। যারা যুবক অবিবাহিত তারাই আমার দুঃখ বুঝবে! তুমি আমার দুঃখ বুঝবে না। তবে আমি ভাত খেতে পারি এক শর্তে, যদি কলাখুর কন্যা ভাত বেড়ে দেয়। সনামালা বললো– আচ্ছা।

এদিকে রাঙাধন সারাক্ষণ ঘরের আশেপাশে বনে কলাখুর কন্যার সন্ধান করলো। কিন্তু কলাখুর কন্যার কোন সন্ধান পেলো না। ওদিকে খুলারাম মনে মনে ভাবছে, আহা সে যদি রাঙাধন হতো! দিন শেষে সূর্য ডুবে গেলে সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এলো। ফাল্গুনে সুনীল আকাশে এক এক করে অসংখ্য তারা মিটমিট করে জ্বলে উঠলো। তখন সে আলোয় ঘরের অদূরে কলাবনে কলাগাছের উপরিভাগে কলাখুর কন্যাকে দেখা গেলো। সনামালা, খুলারাম, রাঙাধন কলাখুর কন্যাকে দেখতে লাগলো। রাঙাধন তখন চট জলদি কলাগাছের গোড়ায় চলে গেলো। কলাগাছে সিড়ি বানাতে যাবে এমন সময় কলাখুর কন্যা তাকে বললো– রাঙাধন তুমি বড্ড ছেলেমানুষ। কেবল কলা গাছগুলোয় কাটছো, তোমার সিড়ি বানাতে হবে না। তুমি এখন ঘরে যাও, আমি আপনা আপনিই চলে আসবো। এদিখে খুলারাম তার দু'কানে যেন শুনতে পেল, কলাখুর কন্যা তাকে বলছে- খুলারাম! তুমি কেন দুঃখ পেলে? মনের দুঃখে অভিমান করে ভাত খেলে না।

www.pathagar.com

তুমি আমাকে কলাগাছের উপর থেকে পেড়ে নিয়ে যাও! আমি তোমাকে ভাত বেড়ে দেবো। বলাবাহুল্য এ কথা শুধুই খুলারাম শুনলো, অন্য কেউ শুনতে পেলো না। শুনে খুলারাম খুবই খুশি হলো। সে কাউকে কিছু না বলে বনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলো।

সে সময় থেকেই তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে অবিবাহিত পুরুষেরা যদি ভাগিনার নব পরিণীতা বধুকে দেখে, বা প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেদিন আকাশে তারা দেখা না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ভাত খাওয়ার বিধান নেই। এমন কি বিবাহিত পুরুষদের ক্ষেত্রেও তখন থেকেই সেই নিয়ম প্রচলিত হয়ে আসছে।

মারমা রূপকাহিনি
মনরি মাঁসুমি
(রাজ কুমারী মনরি)

অনেক অনেক দিন আগে স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সাতটি পরমা সুন্দরী রাজকন্যা ছিল। তাদের মত সুন্দরী রূপসী কন্যা শুধু স্বর্গে কেন ত্রিভুবনে আর কোথাও ছিল না। স্বর্গরাজের সাতটি কন্যাই ছিল দেখতে একই রকমের। তাদের মধ্যে কে বড় কে ছোট চেনাই যেতো না। সাতটি বোনই ছিল খুব উচ্ছল, হাঁসি খুশি এবং তারা সারাদিন স্বর্গে আনন্দে হেসে খেলে বেড়াতো। তবে তাদের, মাঝে মাঝে পৃথিবীর কথা ভাবতে ভাল লাগতো এবং পৃথিবী সর্ম্পকে নানা কিছু জানার আগ্রহ হতো। তাই তারা সবাই মিলে একদিন পিতার কাছে তাদের মনের কথা খুলে বললো।

তাদের পিতা এ বিষয়ে কিছুদিন ভাবলেন। হঠাৎ এ বিষয়ে তিনি একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, একটি সরোবরে চমৎকার ভাবে সাতটি পদ্মফুল ফুটে আছে। হঠাৎ কোত্থেকে এক বিকট দর্শন রাক্ষস এসে একটি ফুল ছিড়ে নিল। স্বপ্নে রাজার মনে হতে লাগলো সাতটি ফুল যেন তাঁরই সাতটি কন্যা। আর রাক্ষসটি যেন দুর্ভাগ্যের মত এসে তাঁর একটি কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাজা হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। কন্যাদের বিপদের কথা ভেবে তাঁর বুক কেঁপে উঠলো। তিনি পরদিন কন্যাদেরকে কোথাও যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু মেয়েরা বার বার পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য পিতাকে আবদার করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত রাজা মেয়েদের আবদারে মন গলে তাদের পৃথিবীতে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

তখন মেয়েদের আনন্দ আর কে দেখে। মনের আনন্দে নাচতে নাচতে তারা পরদিন স্বর্গভূমি ছেড়ে মর্ত্যলোকে বেড়াতে আসলো। মর্ত্যলোকে এসে তাদের সবকিছুই ভালোই লাগলো। মর্ত্যলোকের সবই তাদের কাছে রঙিন মনে হতে লাগলো। তারা সবকিছু আগ্রহ এবং কৌতূহলের সাথে দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতে যখন এক সময় পশ্চিম আকাশকে রাঙিয়ে সূর্য ডুবে গেল, তারা আবার ডানা মেলে স্বর্গে ফিরে গেল।

সেই থেকে প্রতিদিন তারা মর্ত্যভূমিতে বেড়াতে আসতো এবং সারাদিন লোকচুরি খেলতো। তারপর খেলা শেষে সবাই মিলে একটা নির্জন প্রান্তরে গিয়ে একটি সরোবরে স্নান করতো। এমনই আনন্দ ও সুখ সাচ্ছন্দের মধ্যে তাদের দিন কাটছিলো।

www.pathagar.com

এই সুখের দিনেই একদিন তাদের অনর্থ ঘটলো। একদিন কোত্থেকে যেন এক শিকারি এসে ঝোপের আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের স্নান করার দৃশ্য দেখে ফেললো। দেখেই তার পাগল হয়ে যাবার দশা। সে মনে মনে ভাবে এমন সুন্দরী রূপসী মেয়েতো পৃথিবীতে থাকার কথা নয়! এরা কোত্থেকে এলো? যখন সে একথা ভাবছিল, তখন স্বর্গের রাজকন্যারা ডানা মেলে স্বর্গে উড়ে গেলো। এই দৃশ্য দেখার জন্য শিকারি পরের দিনও সেখানে এসে লুকিয়ে রইলো। এবং সেদিনও দেখলো একই ব্যাপার। শিকারি তখন মনে মনে ভাবে ওদের একজনকে যদি ধরতে পারি তাহলে তাকেই বিয়ে করবে। কিন্তু কিভাবে ধরা যায়? একথা ভাবতেই হঠাৎ তার বন্ধু নাগরাজার কথা মনে পড়ে গেল। সে নাগরাজার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললো। নাগরাজা সব কথা শুনে হেসে বললো, আমি থাকতে তোমার এত চিন্তা কিসের বন্ধু। তোমাকে আমি একটা জাল দেবো। সন্ধ্যের সময় যখন স্বর্গের সুন্দরীরা ডানা মেলে উড়তে যাবে তখন ঐ জালটা তাদের দিকে ছুড়ে মারবে। ব্যস্ তাতেই কাজ হয়ে যাবে। কেউ না কেউ এই জালে ধরা পড়বেই। বন্ধু নাগরাজার কথা শুনে খুশি মনেই শিকারি বাড়ি ফিরে গেল। সাথে নাগরাজার দেওয়া সেই জালটিও নিতে ভুললো না।

পরদিন শিকারিটি ঐ জাল নিয়ে নির্জন প্রান্তরের সরোবরটির কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইলো। সেদিনও স্বর্গের রাজকন্যারা সেই সরোবরে স্নান করতে এলো। স্নান শেষে যেই সাতবোন আকাশে উড়তে যাবে অমনি শিকারি তাদের দিকে জাল ছুড়ে মারলো। আর জালটি গিয়ে পড়লো স্বর্গ কন্যাদের সবচেয়ে ছোট বোন 'মনরি'র বাম হাতের কড়ে আঙুলে। বেচারী স্বর্গ কন্যাটি জালে ধরা পড়ে মাটির দিকে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তখন সে তার দিদিদেরকে কেঁদে কেঁদে বললো, দিদি আমি উড়তে পারছি না তোমরা আমাকে সাহায্য করো। তাদের ছোটবোনের বিপদ দেখে ছয়বোন তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো। কিন্তু রাজকুমারী মনরি'র কপাল মন্দ। অনেক চেষ্টা করেও তাদের ছোটবোনকে তারা উদ্ধার করতে পারলো না। বরং তাকে সাহায্য করতে এসে তারা নিজেরাই বিপদের সম্মুখীন হতে চললো। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তার বড় বোনেরা তাকে ফেলে পালিয়ে গেলো। সবচেয়ে ছোট রাজকুমারীর নাম 'মনরি'। বেচারী মনরি কাঁদতে কাঁদতে জালের ভারে মাটিতে এসে পড়লো।

এদিকে শিকারি রাজকন্যাটিকে মাটিতে পড়তে দেখে মনের আনন্দে কাছে ছুটে এলো। রাজকুমারী মনরি শিকারিকে দেখে কেঁদে কেঁদে বললো, ভাই তুমি আমাকে বাঁচাও! আমাকে এই জাল থেকে উদ্ধার করো। শিকারি লোকটা তেমন খারাপ ছিল না। মনরি'র দুর্দশাও তার কাকুতি মিনতি দেখে তার মন গলে গেল। সে মনরিকে জাল থেকে উদ্ধার করল। আর মনরিও আনন্দের সাথে শিকারিকে ধর্ম ভাই হিসাবে বরণ করে নিলো। কিছুক্ষণ পরে রাত নেমে এলো। তাই মনরির আর বাড়ি ফেরা হলো না। এদিকে শিকারি কি করবে ভেবে না পেয়ে রাজ্যের রাজকুমারের সাথে পরামর্শ করতে গেল। রাজকুমার সব কথা শুনে কৌতুহল বশতঃ ঘোড়ায় চড়ে সেই নির্জন প্রান্তরে চলে এলেন। সেখানে এসে তিনি রাজকুমারীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে খুবই মুগ্ধ হলেন। রাজকুমারী মনরিও সা-থ-নু-র রূপ দেখে মোহিত হলো। পৃথিবীতে যে এত সুন্দর পুরুষ থাকতে পারে তা তার ধারণারও অতীত। উভয়ে অপলক নেত্রে পরস্পরের প্রতি তাকিয়ে

www.pathagar.com

রইলো। একসময় সা-থ-নু রাজকুমারীকে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। রাজকুমারী মনরি তখন তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন। রাজকুমার মনরির পরিচয় পেয়ে খুবই খুশি হলেন, এবং এই জ্যোছনা রাতে তাঁকে ঘোড়ায় চড়িয়ে রাজবাড়িতে নিয়ে গেলেন। তারপর এক শুভক্ষণে মহাধুমধাম করে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর তারা মহা আনন্দে হেসে খেলে সুখে দিন কাটাতে লাগলো।

এমনি সুখের দিনে হঠাৎ একদিন তাদের জীবনে দুঃখ নেমে এলো। এক শত্রুরাজা তাদের রাজ্য আক্রমণ করলো। রাজকুমার তখন মনরি'কে একা ফেলে যুদ্ধে রওনা হলেন। বেচারী মনরি তখন গর্ভবতী ছিল। এদিকে স্বামীর যুদ্ধে না গেলেই নয়। তাই সে স্বামীকে রণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে চোখের জলে বিদায় দিল। এরপর শুরু হলো তার জীবনের দুঃখের রাত্রি। স্বামীর বিরহে জীবন তার মরুভূমির মত মনে হতে লাগলো। কিন্তু দুঃখের পরেও সুখ আসে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। তাই মনরি'র জীবনেও হাসি ফিরে এলা। স্বামী চলে যাওয়ার দু'মাস পরে তার কোলে চাঁদের মত ফুটফুটে একটি ছেলের জন্ম হলো। তাকে পেয়ে মনরি আবার জীবনের সব দুঃখকে ভুলে গেল। এবং সে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে ডেকে ধর্মে কর্মে মনযোগ দিল। আর বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও প্রাণ খুলে তাকে আশীর্বাদ জানালেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজকুমারী মনরি'র এহেন ভক্তির বিষয়টি কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সুনজরে দেখলো না। কারণ রাজবাড়িতে মনরি'র আগমনের আগে তাদের খুব সমাদর ছিল। মনরি আসার পরে ব্রাহ্মণদেরকে কেউ আর ভক্তি শ্রদ্ধা করে না। তাই তারা মনে মনে রাজকুমারী মনরি'র উপর খুব ক্ষেপেই ছিল এবং কিভাবে তার ক্ষতি করা যায় সেই চিন্তা করতে থাকলো।

সুযোগও মিলে গেল। রাজকুমার যখন যুদ্ধ নিয়ে খুবই ব্যস্ত, তখন ব্রাহ্মনেরা সবাই মনরি কে নানা কথা বলে ভুলাতে লাগলো। কোন কোন ব্রাহ্মণ বললো, রাজকুমার যুদ্ধে গেছেন। যুদ্ধে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না। আপনি বরং বাপের বাড়ি চলে যান। আবার কোন কোন ব্রাহ্মণ বললো, মহামান্য রাজকুমারী! পৃথিবীতে সুখ বলতে কিছুই নেই। এখানে সবই দুঃখ। সুখ তো কেবল স্বর্গেই আছে। আপনি স্বর্গে চলে যান।

প্রতিদিন এইসব কথা শুনতে শুনতে রাজকুমারী মনরি'র মন খারাপ হয়ে গেলো। আর এই সময় তার শ্বশুর একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটা হলো এই– এক সাদা হাতী তাঁর পেট থেকে বেরিয়ে গোটা রাজবাড়িটা সাতপাক খেয়ে আবার তাঁর পেটে ঢুকে গেল। এই অদ্ভুত স্বপ্নের অর্থ কি হতে পারে তাই নিয়ে রাজা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি ব্রাহ্মণদেরকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর স্বপ্নের অর্থ খোঁজার জন্য। এমন একটা মোক্ষম সুযোগ ব্রাহ্মণেরা কি ছাড়ে? তারা তো মহাখুশি। তারা সবাই যুক্তি করে রাজাকে বললো, মহারাজ! আমাদের যুবরাজের সামনে ঘোর বিপদের দিন অপেক্ষা করছে, যুদ্ধে যে কি হয় বলা যায় না?

রাজা এমনিতেই ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দুশ্চিন্তায় কাটাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণদের কথা শুনে তাঁর আরো দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। মনপ্রাণ আনচান করতে লাগলো। ব্রাহ্মণদের তিনি অনুরোধ করলেন, কিভাবে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় বলে দিতে। তখন ব্রাহ্মণেরা সুযোগ বুঝে রাজাকে বললো, মহারাজ! আপনি যদি অভয় দেন তাহলে আমরা এর উপায় বলে দিতে পারি। রাজা অভয় দিলেন। তারপর ব্রাহ্মণেরা বললো,

www.pathagar.com

মহারাজ! একটা মাত্র উপায় আমরা খুঁজে পেয়েছি সেটা হচ্ছে আপনার প্রিয় পুত্রবধূ রাজকুমারী মনরিকে বলি দিতে হবে। তা নাহলে যুদ্ধের ময়দানে রাজকুমারের সামনে কঠিন বিপদ অপেক্ষা করছে। ব্রাহ্মণদের এই কথা শুনে রাজা ভয়ে আঁতকে উঠলেন। বললেন, না! না! আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়।

দুষ্ট ব্রাহ্মণেরা রাজাকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু রাজা নীরব হয়ে রইলেন। ক্রমে এ কথা রাজবাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো এবং রাজকুমারী মনরি'র কানে ও গেল। দুষ্ট ব্রাহ্মণদের এ সব কার্যকলাপ দেখে রাজকুমারী মনরি'র মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। সে গভীর দুঃখের সাথে মর্ত্যভূমি ছেড়ে স্বর্গে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে লাগলো। তারপর একদিন মর্ত্যের মায়া কাটিয়ে স্বর্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু বেচারীর মনটা ছেলের জন্য খুবই কাতর। অনেক দুঃখ নিয়ে সে ছেলেকে দুধ খাইয়ে দোলনায় ঘুম পাড়ালো। ছেলে হয়তো ঘুম থেকে জেগে তাকে খুঁজবে, একথা ভেবে তার দ্'চোখ বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়লো। রাজকুমারী মনরি ছেলের জন্য একটা বোতলে দুধ ঢেলে ছেলেটার পাশে রেখে দিল। তারপর ঘুমন্ত ছেলেটাকে আদর করে কপালে শেষ চুমু দিয়ে ডানা মেলে স্বর্গে রওনা হলো। যেতে যেতে বার বার পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য তার মনটা ব্যাকুল করতে লাগলো। ছেলেটার কথা ভেবে ভেবে সারাক্ষণ মনটা কাঁদছিল। আর দুঃখের ভারে ডানাগুলোও যেন পৃথিবীতে নেমে আসতে চাইছিল। তবুও একসময় উড়তে উড়তে সে অনেকদূর চলে গেল। এমন সময় বহুদুরে হঠাৎ একটা ঘুঘু পাখি ডেকে উঠলো। আর ঘুঘু'র বিষণ্ন ডাকটা কানে আসতেই তার মনে হলো ছেলেটা বুঝি তার জন্য কাঁদছে। মনরি আর থাকতে পারলো না। তাড়াতাড়ি সে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলো। এসে দেখে তার ছেলেটি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এরপর মনরি ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে আরেকবার দুধ খাওয়ালো। তারপর ছেলেটা যখন আবার ঘুমিয়ে পড়লো, তখন মনরি'র অতীতের অনেক কথা, অনেক স্মৃতি মনে পড়তে লাগলো। সে ভাবে, তার স্বামী যদি যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাড়িতে ফিরেন, হয়তো তাকে খুঁজবেন। একথা ভাবতেই তার দু'চোখ বেয়ে কয়েকফোটা চোখের জল মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। এ সময় তার হঠাৎ একজন ধর্মপরায়ণ ঋষির কথা মনে পড়ে গেল। ঐ ঋষি গভীর অরণ্যে বাস করেন। তিনি মনরিকে খুবই স্নেহ করেন। তাঁর কথা মনে হতেই মনরি ডানা মেলে তাঁর কাছে উড়ে গেল। সে ঋষির কাছে সব কথা খুলে বললো। তারপর নিজের বাম হাতের অঙ্গুরীটি খুলে ঋষির হাতে দিয়ে বললো, ঋষিবর! আমার স্বামী যদি কোনদিন আমাকে খুঁজতে এখানে আসেন, তবে আপনি তাকে আমার স্মৃতি স্বরূপ এই অঙ্গুরীটি দিবেন এবং বলবেন, তিনি যেন আমাকে আনতে স্বর্গে যান।

স্বর্গে কিভাবে যাওয়া যায় সে কথাও ঋষিকে বললো। পৃথিবী থেকে স্বর্গে যেতে হলে মাঝে একটা বিরাট সীমাহীন সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। সমুদ্রের মাঝখানে একটা নির্জন দ্বীপ আছে। প্রথমে সেই দ্বীপে যেতে হবে। তারপর ঐ দ্বীপটি থেকে উড়ে স্বর্গে যেতে হবে। পৃথিবী থেকে দ্বীপটির মাঝখানে একটা ভয়ংকর সমুদ্রের স্রোত আছে। ঐ স্রোতের জল এতই উত্তপ্ত যে, যে কেউ ঐ স্রোতে পড়ে গেলে সাথে সাথে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তবে ঐ দ্বীপে যাওয়ার একটাই পথ আছে, সেটা হল সেই উত্তপ্ত সমুদ্রে

www.pathagar.com

একটা বিরাট নাগরাজা বাস করে। সেই নাগরাজা এত বিরাট এবং লম্বা যে, তার মাথাটা পৃথিবীতে রাখলে লেজটা ঐ দ্বীপে গিয়ে শেষ হবে।

সকালের দিকে নাগেরাজার লেজটা পৃথিবীর দিকে পানিতে ভেসে থাকে। দুপুরে ঐ লেজটা পানিতে ডুবে যায় এবং দেহের মধ্যভাগটা পর্বতের মত করে সমুদ্রের বুকে ভাসে। বিকালে ঐ মধ্য ভাগটাও পানিতে ডুবে যায়, শুধু মাথার দিকটা পানিতে ভাসতে থাকে। স্বর্গে যেতে হলে ঐ নাগের পিঠের উপর দিয়ে প্রথমে সেই নির্জন দ্বীপে যেতে হবে এবং পরে সেখান থেকে যেভাবেই হোক উড়ে স্বর্গে যেতে হবে। এই কথাগুলি বলার পর মনরি ঋষির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বর্গে উড়ে গেল।

এদিকে স্বর্গে তার অবর্তমানে তার জন্য সবাই অত্যন্ত চিন্তিত ছিল। বিশেষ করে তার বোনেরা তার জন্য মাঝে মাঝে প্রায়ই কাঁদতো। তার বাবা ভাবে কিভাবে পৃথিবী থেকে তাঁর মেয়েকে স্বর্গে আনা যায়। এমন সময়ে মনরি স্বর্গে এসে পৌঁছালো। মনরিকে ফিরে পেয়ে সবাই খুশি হয়ে উঠলো। তার বোনেরা তাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু তার বাবা তেমন খুশি হলেন না। তিনি নাকি মনরি'র শরীর থেকে মনুষ্যের গন্ধ পাচ্ছিলেন। আর তা তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। তিনি তাঁর দাসদাসীদের ডেকে মনরিকে গোসল করাবার আদেশ দিলেন। রাজার আদেশ পেয়ে হাজার হাজার দাসদাসী রাজবাড়ির নিকটস্থ পুকুর থেকে কলসের পর কলম জল এনে দিনের পর দিন মনরিকে গোসল করাতে লাগলো। এভাবে চললো দু'সপ্তাহ তবুও থামার কোন লক্ষণ নেই।

ওদিকে সে সময় যুদ্ধ জয় করে তার স্বামী দেশে ফিরে আসলেন। কিন্তু দেশে ফিরে এসে রাজকুমার তাঁর স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে পাগলের মত হয়ে গেলেন। যুদ্ধ জয়ের সব আনন্দ তাঁর মাটি হয়ে গেল। তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে স্ত্রীকে খুঁজতে লাগলেন। দিন যায় রাত যায় তবুও তাঁর খোঁজা শেষ হয় না। খুঁজতে খুঁজতে শেষে একদিন তিনি সেই ঋষির কাছে পৌঁছালেন। তখন ঋষি তাঁকে সব কথা খুলে বললেন, এবং মনরি'র দেওয়া অঙ্গুরীটি তাঁকে দিলেন। পরদিন ঋষির কাছ হতে বিদায় নিয়ে রাজকুমার সা-থ-নু অনেক বন বাদাড় পেরিয়ে স্বর্গ সমুদ্রে পৌছলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি রাজকুমারীর মনরি'র কথামত বিরাট নাগরাজাকে দেখতে পেলেণ এবং সাহসের সাথে নাগরাজার পিঠে উপর দিয়ে উত্তপ্ত সমুদ্র পাড়ি দিতে লাগলেন। তখন ঐ সমুদ্রে ঝড়-ঝঞ্জা এতই প্রবল ছিল যে, বাতাসের ধাক্কায় সমুদ্রে পড়তে পড়তে একটুর জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন। পরে অনেক দুঃখ কষ্টের পর সন্ধ্যার সময় সেই নির্জন দ্বীপে গিয়ে পৌছেন। তাঁর দ্বীপে পৌঁছার সাথে সাথে নাগরাজার বিশাল দেহটি সমুদ্রের বুকে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে ডুব দিল।

তখন চারিদিকে রাত নামছে। ভীষণ ক্ষুধা এবং পথ চলার কষ্টে তিনি সীমাহীন ক্লান্তি নিয়ে একটি গভীর অরণ্যের বিরাট একটা গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর রাতে দু'টি পাখির কথাবার্তায় তাঁর ঘুম ভাঙলো। যে গাছের নিচে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সেই গাছে দুইটি বড় আকারের পক্ষী থাকতো। পক্ষী রাণী পক্ষী রাজাকে বলছে, আচ্ছা আজ তো অনেক ঘোরাঘুরি করে কোনরকমে আহার জোটালাম। কাল কি হবে বল তো? তখন পক্ষীরাজ বললো, গিন্নি কালকের কথা চিন্তা করো না। আগামীকাল

www.pathagar.com

স্বর্গরাজা ডো-মা-রায়ের রাজ্যে খুব বড় একটা ভোজ উৎসব হচ্ছে। কাল ওখানে গেলে আমরা অনেক খানাপিনা যোগাড় করতে পারবো। তখন পক্ষীরাণী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, হঠাৎ স্বর্গরাজ্যে এত বড় ভোজের আয়োজনের কারণ কী? পক্ষীরাজ বললো সে অনেক কথা গিন্নি! আজ রাতে বলে ফুরানো যাবে না। তুমি বরং আজ ঘুমাও, আমি কাল সে কথা তোমাকে বলবো। একথা শুনে পক্ষীরাণীর কৌতূহল আরো দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সে বার বার আবদার করতে লাগলো সে কথা শোনার জন্য। শেষে আবদারে গলে গিয়ে পক্ষীরাজ বললো, গিন্নি! স্বর্গরাজের সাতটি মেয়ে আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটির নাম হলো মনরি। মনরি কিছুদিন আগে মর্ত্যে গিয়ে সেখানকার এক রাজকুমারকে বিয়ে করেছে। তারপর আবার স্বর্গে ফিরে এসেছে। আগামীকাল তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করিয়ে আবার স্বর্গ রাজ্যের অধিবাসী করা হবে। তাই এ উপলক্ষে স্বর্গরাজা একটা বড় ভোজের আয়োজন করেছেন। এটুকু বলার পর পক্ষীরাজ আর পক্ষীরাণী দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়লো।

পক্ষীরাজ আর পক্ষীরাণী যখন এ কথাগুলো বলাবলি করছিল, তখন সেই গাছের নিচে বসে রাজকুমার সা-থ-নু আগ্রহের সাথে কথাগুলি শুনছিলেন। পাখি দ'ুটি যখন ঘুমিয়ে পড়লো সেই ফাঁকে রাজকুমার মন্ত্রবলে নিজেকে একটি ছোট পিঁপড়া বানিয়ে গাছে উঠে পক্ষীরাণীর একটি পাখার নিচে ঢুকে ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরদিন ভোর হলে পক্ষীরাজ এবং পক্ষীরাণী ডানা মেলে স্বর্গের দিকে রওনা হলো। তাদের সাথে পিঁপড়ার বেশধারী রাজকুমার ও পক্ষীরাণীর ডানায় ভর করে স্বর্গে উড়ে চললেন। সমুদ্রের উপর দিয়ে অনেকক্ষণ উড়ার পর পক্ষীরাণী পক্ষীরাজকে বলল, ওগো! আজ আমার শরীরটা এত ভারী ভারী লাগছে কেন বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে অন্য কোন প্রাণী আমার শরীরের উপর ভর করে আছে। ফেলে দেবো নাকি? তার এ কথা শুনে রাজকুমারের চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফোরিত হয়ে উঠলো। কারণ নিচ থেকে তখনও সমুদ্রের প্রচণ্ড গর্জন শোনা যাচ্ছিল। রাজকুমার উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করতে লাগলো পক্ষীরাজ কি বলে! সে কথা শুনে পক্ষীরাজ বলে, গিন্নি! ডানাগুলো বেশি ঝাপটিও না! তাতে তোমার সাথে কোন প্রাণী থাকলে সমুদ্রে পড়ে মারা যাবে বেচারা। তার চেয়ে একটা কাজ কর, তোমার যে ডানাটা ভারী মনে হচ্ছে, সেটা আমার ডানার উপর রাখো। প্রাণীটি বেঁচে যাবে। এতে আমাদের খুব পুণ্য হবে। পক্ষীরাণী তাই করলো এবং দ'ুজনে স্বর্গের দিকে উড়ে চললো। আর তাদের সাথে রাজকুমার ও পিপড়ার বেশে স্বর্গে উড়ে চললেন। অবশেষে স্বর্গে পৌঁছে পাখি দুটি স্বর্গরাজ্যের পুকুরটির কাছে বড় একটা তাল গাছের নিচে নামলো। নেমেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো।

এই ফাঁকে রাজকুমার চট করে ভূমিতে নেমে নিজের রূপ ধারণ করলো। তাঁকে বাঁচানোর জন্য পক্ষীরাজকে তিনি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানালেন। পক্ষীরাজ তখন হেঁসে পক্ষীরাণীকে বললো, দেখলে তো গিন্নি! আমি তখনই তোমাকে বলেছিলাম তোমার সাথে হয়তো কোন না কোন প্রানী অবশ্যই আছে? এরপরে তারা খুশি মনে আহারের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লো। তারা চলে যাওয়ার পর রাজকুমার সা-থ-নু দেখে পুকুর ঘাটে এক অবাক কাণ্ড! স্বর্গের রাজবাড়ি থেকে এসে একের পর এক অপ্সরী পুকুর থেকে কলসীকে ভরে জল নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপাটা দেখে তিনি বুঝতে পারলেন, নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

এ জল দিয়ে রাজকুমারী মনরিকে স্নান করানো হচ্ছে। পুকুর ঘাটে অনেক অপ্সরী এসে জল নিয়ে ধীরে ধীরে সবাই ফিরে যেতে লাগলো। কেবল একজন অপ্সরী পিছনে পড়ে রইল। এতক্ষণ রাজকুমার তাল গাছের আড়াল থেকে এ দৃশ্য দেখছিলেন। এবার তিনি দুর থেকে শেষ মেয়েটির কলসী লক্ষ্য করে মন্ত্রবান নিক্ষেপ করলেন. এতে মেয়েটি অনেক চেষ্টা করেও কলসীটি আর আলগাতে পারলো না। তারপর সে সাহায্যের আশায় চারিদিকে তাকাতে লাগলো। এমন সময় সে রাজকুমারকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাইলো।

তখন রাজকুমার সুযোগ বুঝে মনরি'র দেওয়া অঙ্গুরীটি কলসীর ভেতরে রেখে দিয়ে কলসীটি তুলে দিলেন। এবং মনে মনে বললেন, মনরি যদি এখনো সত্যিকারভাবে আমার স্ত্রী হয়ে থাকে, তবে এই অঙ্গুরীটি যেন তার হাতে অবশ্যই পড়ে। এরপর অপ্সরী রাজবাড়িতে চলে গেলে রাজকুমার মনরি'র জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এদিকে রাজবাড়িতে পৌছে অপ্সরীটি যেই মনরি'র গায়ে জল ঢাললো, অমনি কলসীর ভেতর থেকে অঙ্গুলটি টুপ করে মনরি'র হাতে গিয়ে পড়লো। সেটি দেখার সাথে সাথে সে চিনতে পারলো, এ তো তার বাম হাতের অনামিকার অঙ্গুরী। এই অঙ্গুরীটি সে স্বামীকে দেওয়ার জন্য ধার্মিক ঋষির কাছে দিয়ে এসেছিল। সে বুঝতে পারলো তার স্বামী তাকে খোঁজার জন্য স্বর্গে এসে পৌছেছেন। একথা ভাবতেই রাজকুমারীর মন আনন্দে নেচে উঠলো। সে দাসীদেরকে বললো, তোমরা জল ঢালা বন্ধ করো, আমার শীত করছে। এরপর গিয়ে সে বোনদেরকে সব কথা খুলে বললো। মনরি'র সব কথা শুনে বোনেরা তো বেজায় খুশি। তারা গিয়ে সব কথা তাদের বাবা স্বর্গরাজকে বললো। এসব শুনে স্বর্গরাজ বললেন, ঠিক আছে। আমার মেয়ে জামাই আমার মেয়ের উপযুক্ত কিনা আগে তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তিনি যদি পরীক্ষায় টিকে যান, তবেই আমি মেয়েকে তাঁর হাতে তুলে দেবো। আর যদি পরীক্ষায় টিকতে না পারেন, তাহেলে তাঁকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হবে। দেবরাজের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে রাজকুমারী মনরি ও তার বোনেরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। সবাই ভাবতে লাগলো ছোটবোন মনরি'কে কিভাবে সাহায্য করা যায়।

এদিকে রাজকুমার পুকুর পাড়ে বসে কিভাবে রাজবাড়িতে প্রবেশ করা যায় সেকথা ভাবছিলেন। এ সময় স্বর্গরাজ্যের মেয়েরা আনন্দে হৈ হুল্লোড় করতে করতে তাঁর কাছে আসলো। এবং অতি যত্নের সাথে তাঁকে রাজবাড়িতে নিয়ে গেল। রাজবাড়িতে স্বর্গরাজা যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করার পর বললেন, কুমার! আপনি যদি আমার ছোট মেয়ে মনরিকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চান, তাহলে আপনাকে বেশ কিছু কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আপনি যদি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন, তবেই আপনি আমার মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পাবেন। আর যদি তা না পারেন তবে আপনাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হবে। এখন ভেবে দেখুন! আপনি কি পরীক্ষায় নামবেন? নাকি দেশে ফিরে যাবেন? রাজকুমার সা-থ-নু ভেবে চিন্তে পরীক্ষায় নামবেন বলে স্থির করলেন।

একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করা হলো পরীক্ষার জন্য। প্রথম পরীক্ষাটি হবে একটি দেওয়ালের উপর সাতটি ছিদ্র করা হবে। ঐ সাতটি ছিদ্রে স্বর্গরাজের সাতটি মেয়ের বাম

হাতের কড়ে আঙুল ঢুকানো হবে। তখন রাজকুমারকে সেই সাতটি কড়ে আঙুল থেকে তাঁ স্ত্রী মনরি'র আঙুলটি বেছে নিতে হবে। রাজকুমার পড়ে গেলেন মহা দুশ্চিন্তায়। তিনি ভেবে কুল পেলেন না, কিভাবে সাতটি আঙুল থেকে নিজের স্ত্রীর আঙুলটি বেছে নেবেন! তিনি যখন এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলেন তখন এক ফাঁকে রাজকুমারী মনরি চুপি চুপি এসে তাঁকে বললো, প্রিয়তম! আমি একটা উপায় বের করেছি। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, কি উপায়? রাজকুমারী বললো, তুমি যখন পরীক্ষায় নামবে, সে সময় আমি একটা মাছি পাঠাবো ঐ মাছিটি ভন ভন করে তোমার চারিদিকে উড়বে, উড়তে উড়তে একসময় আমার আঙুলে বসবে, তখন তুমি বুঝে নেবে ওটাই আমার আমার আঙুল। রাজকুমারকে এই পরামর্শ দিয়ে মনরি অন্তঃপুরে চলে গেল।

নির্দিষ্ট দিনে শুরু হলো পরীক্ষা। সবাই আগ্রহের সাথে দেখতে থাকলো রাজকুমারের প্রথম পরীক্ষা। একটি দেওয়ালের অন্তরাল থেকে সাতবোন সাতটি ছিদ্রে আঙুল ঢুকালো। বিপরীতদিকে স্বর্গরাজ ডো-মা-রায়, রাজকুমার সা-থ-নু এবং অন্যান্য দর্শকরা দাঁড়ালেন। এই সময় একটা মাছি এসে ভন ভন করে রাজকুমারের চারিপাশে উড়তে লাগলো। এক সময় উড়তে উড়তে সবার অগোচরে রাজকুমারী মনরি'র আঙুলে বসলো। রাজকুমারের স্থির দৃষ্টি ছিল মাছিটির দিকে। রাজকুমার বুঝতে পারলেন এটাই মনরি'র আঙুল। অন্যরা টেরও পেলো না। তিনি সবার সামনে ঐ আঙুলটি ধরলেন। তাঁর এই কৃতকার্যতা দেখে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেলো।

এরপর দ্বিতীয় পরীক্ষার পালা। দ্বিতীয় পরীক্ষাটি হলো, স্বর্গরাজার সাত মেয়ে একই পোশাক পরে আকাশে উড়বে। তখন কোনটি রাজকন্যা 'মনরি' তা রাজকুমারকে চিনিয়ে দিতে হবে। এই পরীক্ষাটি ছিল বাস্তবিকই খুব কঠিন। কারণ তারা সাতবোন দেখতে একই রকমের। আলাদা করে চেনা খুবই মুস্কিল। এবারও রাজকুমার মহাদুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। এবারও রাজকুমারী 'মনরি' চুপি চুপি এসে বললো, প্রিয়তম! দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। আকাশে উড়ার সময় আমি আমার বোনদের কাছ থেকে একটু আলাদা করে উড়বো। আর ওরা যদি বেশি উপরে উড়ে, আমি তাদের থেকে আলাদা হয়ে একটু নিচে উড়বো। তাছাড়া আকাশে উড়ার সময় আমি আমার ওড়নাটা একটু বেশী ছেড়ে দেবো এবং আমার কাপড়ের আঁচলও ওদের চাইতে বেশী লম্বা হয়ে বাতাসে উড়বে। এ থেকে তুমি সহজেই আমাকে চিনে নিতে পারবে। রাজকুমারী মনরি'র কথা শুনে দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন রাজকুমার।

আবার নির্দিষ্ট দিনে শুরু হলো দ্বিতীয় পরীক্ষা। সাতবোন সুন্দর সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরে আকাশে উড়তে লাগলো। তখন তাদেরকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। তারা প্রথমে নিচের দিকে উড়লো, উড়তে উড়তে অনেক উপরে উঠে গেল। তখন তাদেরকে চেনা বাস্তবিকই দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্বয়ং স্বর্গরাজাও বলতে পারবেন না কে কোনটা? স্বর্গের সবাই এই অভুতপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলো। এখন রাজকুমারের পরীক্ষা দেবার পালা। রাজা বললেন, কুমার! এবার বলেন, কোনটা 'মনরি'? এ সময় উপস্থিত সবাই উৎকণ্ঠার সাথে রাজকুমারের দিকে তাকিয়ে আছে। রাজকুমার দুরে তাকিয়ে নির্দ্বিধায় রাজকুমারী মনরি'র দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন ওই-ই আমার স্ত্রী

www.pathagar.com

মনরি। সে সাতবোনের মধ্যে একটু নীচ দিয়ে উড়ছে। আর তার ওড়নাটাও অন্যদের চাইতে সামান্য লম্বা হয়ে বাতাসে উড়ছে।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। সাতবোন যখন নিচে নেমে এলো, তখন দেখা গেল সত্যিই রাজকুমার তার স্ত্রী মনরি'র দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। রাজকুমারের মাথার উপর দিয়ে চক্কর দিতে দিতে স্বর্গরাজ্যের সাত রাজকন্যা নিচে নেমে এলো। আর রাজকুমার হাত বাড়িয়ে মনরিকে ভূমিতে নামালেন। তখন চারিদিকে দর্শকদের মধ্যে আনন্দের কলরোল পড়ে গেল। রাজাও মনে মনে খুব খুশি হলেন। এরপরে স্বর্গরাজা রাজকুমারকে বললেন, কুমার! আমি আর আপনাকে পরীক্ষা করবো না। আপনি আমার পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন! এবার আপনি নিজে একটা পরীক্ষা দেখান!

তখন রাজকুমার রাজাকে বললেন, রাজন! আপনার মেয়েরা আবার আকাশে উড়ুক। আমি তাদের মধ্যে আমার স্ত্রী মনরি'কে লক্ষ্য করে এমনভাবে তীর ছুড়ে ভূমিতে নামাবো যে, তীরগুলি তার কাপড়ে গিয়ে লাগবে কিন্তু গায়ে কোনভাবেই বিদ্ধ হবে না। রাজকুমারের কথামত আবার সাতবোন আকাশে উড়া শুরু করলো। রাজকুমার তীর ধনুক নিয়ে তৈরি হলেন। এরপর সাবধানে মনরি'কে লক্ষ্য করে একে একে সাতটি তীর ছুড়ে মারলেন। সবাই রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলো কি হয় কি হয় ভেবে? এমন সময় রাজকুমারী মনরি সাতটি তীরের উপর ভাসতে ভাসতে ভূমিতে নেমে এলো। তা দেখে স্বর্গের সবাই আনন্দে উদ্বেলিত হলো। কারণ স্বর্গের সবাই তাকে অত্যন্ত ভালবাসতো। রাজকুমারীরাও সবাই খুশি হয়ে একে অপরকে আলিংগন করতে লাগলো।

স্বর্গরাজা নিজেও খুব খুশি হলেন। তিনি মহা ধুমধামের সাথে স্বর্গের নিয়ম অনুযায়ী আবার মনরি'র সাথে রাজকুমারের বিয়ে দিলেন। বিয়ের রাতে সমস্ত স্বর্গপুরী আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। বিয়ে উপলক্ষে রাজা তাদেরকে একটি নতুন রাজপ্রাসাদ দান করলেন। মর্ত্যের রাজকুমার আর স্বর্গের রাজকুমারীর মনে তখন অনেক আনন্দ। অনেকদিন পরে তারা দুজন দুজনকে ফিরে পেয়েছে। তাই একজন আরেকজনকে কাছে পাবার জন্য তাদের মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তারা সারারাত কথা বলতে বলতে শেষরাতে একসময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। এ সময়ে রাজা তাঁর সৈন্যদের আদেশ করলেন রাজকুমারী মনরি ও তার স্বামী রাজকুমারকে রাজপ্রাসাদটিসহ পৃথিবীতে রেখে আসতে। রাজর আদেশ পেয়ে সৈন্যরা রাজকুমারী মনরি ও রাজকুমার সা-থ-নু কে নতুন রাজপ্রাসাদটিসহ সযত্নে পৃথিবীতে রেখে আসলো। রাজকুমারী মনরি ও তার স্বামী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকায় এ বিষয়ে তারা জানতেই পারলো না।

পরদিন মোরগের ডাক শুনে তাদের ঘুম ভাঙলো। সকালে ঘুম থেকে জেগে নিজেদেরকে পৃথিবীতে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। এরপর সকালে কাজ কর্ম সেরে খাদ্য পানীয় আহারের পর ছেলেকে খুঁজতে বেরুলো। অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুজি করে তারা তাদের পুরনো রাজবাড়িটি খুঁজে বের করলো। কিন্তু বাড়িটার চেহারা দেখে দু'জনেই অবাক হলো। কারণ হচ্ছে তারা মাত্র সেদিন স্বর্গে গিয়েছিল। তখন রাজবাড়িটা ছিল একেবারেই নতুন, ঝকঝকে চকচকে। আর তারা এখন যেটা খুঁজে

www.pathagar.com

পেয়েছে সেটা একটা জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন রাজবাড়ি। সে যাই হোক, তারা বুড়ো রাজাকে খুঁজতে গেল। কিন্তু দ্বার রক্ষীরা তো তাদের কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো। তারা বললো, আপনারা যে রাজার কথা বলছেন, তিনি তো প্রায় একশ বছর হলো মারা গেছেন। এ কথা শুনে তারা দুজনে অবাক হয়ে দ্বার রক্ষীদের নিজেদের পরিচয় দিলেন। দ্বার রক্ষীরা তাঁদের দেখে চোখ ছানাবড়া হবার যোগাড়! তারা বললো, আপনারা প্রায় একশ বছর আগে মর্ত্যভূমি থেকে স্বর্গে চলে গেছেন। অথচ আপনারা এখনও দিব্যি যুবক যুবতীই রয়ে গেছেন। আর এদিকে আপনাদের ছেলে মানে আমাদের রাজা একশ বছরের বুড়ো হয়ে বসে আছেন।

রাজকুমার এবং মনরি এবার তাদের ছেলেকে দেখতে গেলেন। ছেলেকে দেখে তাদের চোখ কপালে উঠে গেল। কোথায় তাদের সামনে দু'মাসের একটা শিশু দেখা দেবে তা নয়, দেখা দিল একজন থুর থুরে বুড়োমানুষ! চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে, দাঁতগুলি পড়ে গেছে, চোখ দিয়েও আর ভাল করে দেখতে পায় না। তাদের বুড়ো ছেলে তাদের কথা শুনে পথ হাতরাতে হাতরাতে তাদের সামনে এলো। তারা তাদের ছেলের এ দুরবস্থা দেখে কি করবে ভেবে কুল পেলো না। রাজকুমারী মনরি তাড়াতাড়ি তার বুড়ো ছেলেকে কোলে নিতেই আশ্চর্য ব্যাপার বুড়োটি আবার দু'মাসের ছোট্ট শিশুতে পরিণত হলো। আর সে তার মায়ের বুকের দুধ খেতে লাগলো।

উপস্থিত সবাই এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে স্বপ্ন দেখছে না জেগে আছে বুঝতে পারলো না। পরে রাজকুমারী মনরি ও রাজকুমার সা-থ-নু'র কাছে সব কথা শুনে বুঝতে পারলো, স্বর্গের একদিন সমান পৃথিবীর একশ বছর। পৃথিবীতে ফিরে আসার পর স্বর্গের রাজকুমারী মনরি আগের চেয়ে আরো বেশি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগী হলো। সে শুধু এ জন্মেই নয়, অতীতেও জন্মে জন্মে সে বরাবরই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিল। এবং রাজকুমার সা-থ-নু' ই সবসময় তার স্বামী ছিলেন। কোন এক জন্মে কী কারণে একবার স্বামীর উপর রেগে গিয়ে ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করলো, প্রভু! জন্মে জন্মে যেন আমি আর এরকম স্বামী যেন না পাই। তার এই প্রার্থনা শুনে তাদের চাকরটি খুবই মর্মাহত হলো। কারণ সেই জন্মে তারা তার মনিব ছিল। একদিন সে তার মনিব এবং তার জন্য খাবার নিয়ে আসছিল। চাকরটি আসার পরে মনিব কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে গেলে চাকরটি মনিবের খাবারের ভাগটি রেখে দিয়ে তার নিজের ভাগটি ভগবান বুদ্ধকে দান করবে বলে মনস্থির করলো। মনিব চলে আসলে সে তার ভাগের খাবারটি নিয়ে ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে খাবারটি দান করে বললো, প্রভু! আমি যেন জন্মে জন্মে আমার মনিব এবং তাঁর স্ত্রীকে স্বামী স্ত্রী হিসেবে পায়। আর আমিই যেন জন্মে জন্মে তাঁদের মিলনের কারণ হই।

ক্ষুধার্ত উপাসকের এই দান সম্ভবত ভগবান বুদ্ধ সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। তাই জন্মে জন্মে সে তার প্রিয় মনিব ও মনিবের স্ত্রীর মধ্যে মিলনের কারণ হিসেবে জন্ম নিয়েছে। এই জন্মে 'মনরি' যখন স্বর্গরাজ ডো-মা-রায়ের কন্যা হয়ে জন্মালো, আর স্-থ-নু মর্ত্যের রাজকুমার, তখন সে তার প্রিয় মনিব এবং মনিবের স্ত্রীর মধ্যে মিলনের কারণ হয়ে শিকারি হিসেবে জন্ম নিয়েছে।

www.pathagar.com

খিয়াংদের রূপকাহিনি

অতীতে লিখিত নিজস্ব কোন লেখা পত্র না থাকায় খিয়াংদের লিখিত সাহিত্য খুব একটা দেখা যায় না। তবে মৌখিক রচনাশৈলী নির্ভর খিয়াংদের সাহিত্যে ও অস্তিত্বে প্রমাণ মেলে। যেমন : 'কই কাইহ্য ক্রখঃ' খিয়াংদের মাঝে এক অলিখিত সাহিত্য। পৃথিবী সৃষ্টি, চন্দ্র ও সুর্য গ্রহণ, মানব সৃষ্টির ইতিহাস, ভূমিকম্প প্রভৃতি নিয়ে খিয়াংদের রয়েছে নান কথা ও কাহিনি, যা এখনও তাদের লোককাহিনির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। খিয়াং সমাজে প্রচলিত জনপ্রিয় একটি লোককাহিনি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল :

সাধারণত খিয়াং পুরুষরা কোন কারণে রাগান্বিত বা উত্তেজিত হলে পুরুষাঙ্গের নাম উচ্চারণ করে। খিয়াং আদিবাসীরা তাদের নিজেদের ভাষায় শরীরের এই বিশেষ অঙ্গটিকে বলে "ইয়ংতেলচ"।

স্ত্রী আর পাঁচ সন্তান নিয়ে মংচ এর সুখের সংসার। প্রতিদিন বন থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে তা বাজারে বিক্রি করে বাজার সদাই করে খেয়ে দেয়ে আবার বাসায় ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন আবার ভোরে একইভাবে বনে যায় গাছ কেটে লাকড়ি সংগ্রহ করতে। এভাবে কোন রকমে সে সংসারের ঘানি টেনে নিয়ে যায়। তার অভাব থাকলেও সে সততার সাথেই জীবন যাপন করে। তার সততায় মুগ্ধ হয়ে বনদেবতা একদিন তার সামনে এসে দেখা দেয়। তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বনদেবতা তাকে বলে– 'তোর সততায় আমি বিমুগ্ধ।' অতঃপর তিনটি তীর তার হাতে দিয়ে বনদেবতা বলেন– 'এই তীর ছুড়ে যা বলবে তাই হবে... তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।' খুব খুশি মনে বাড়ি ফিরে মংচ তার স্ত্রী আর সন্তানদের দরজা বন্ধ করে পুরো ঘটনা খুলে বলে। সবকিছু শুনে সবাই আহ্লাদিত। সবচেয়ে ছোট জন সে বলে– " বাবা, বাবা চকলেট বল। স্ত্রী বলে, সোনার গয়না। অন্য সন্তানরা বলে, প্রাসাদ, খেলনা, পুষ্টিকর খাবার ইত্যাদি। সবাই যার যার অবস্থানে অনড় থাকে আর যে যার দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য চিৎকার আর চেচামেচি করতে থাকে।

সবার এমন চিৎকার চেচামচিতে মংচ এর মেজাজ ক্রমশ বিগড়ে যেতে থাকে। সে সবাইকে চুপ থাকার জন্য বলে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? এক পর্যায়ে সে রাগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ধনুতে তীর নিয়ে ছুঁড়ে আর বলে 'ইয়ংতেলচ'। যেই বলা সেই কাজ। চোখের নিমিষেই মংচ এর সারা শরীর অসংখ্য 'ইয়ংতেলচ' এ ভরে গেল। কোথায় নেই! কপালে, হাতে, মুখে পশ্চাৎদেশে, উরুতে, বুকে সারা অঙ্গে। তা দেখে তার সন্তানরা হাসিতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে। আর ঐদিকে মংচ এর স্ত্রী চোখে কপালে তুলে বলে আমার এতগুলো 'ইয়ংতেলচ' এর কোন দরকার নেই। এখনি সব দূও কর!!! মংচ দ্বিতীয় তীর ছুঁড়ে আর বলে আমার শরীরের সব 'ইয়ংতেলচ' এখনি দূর হও। যেমন কথা তেমনই কাজ। সব 'ইয়ংতেলচ' মুহূর্তেই সারা শরীর থেকে উধাও হয়ে গেল। মংচ হাফ ছেড়ে বাঁচল। সবচেয়ে বেশি খুশি হল তাঁর স্ত্রী। কিন্তু মংচ এর হঠাৎ শরীরে কিসের যেন অভাব বোধ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর হাত দিয়ে বুঝতে পারলো তার কি চরম ভুল সে করেছে! কারণ তার আসল 'ইয়ংতেলচ' টাই তখন আর শরীরে নেই। সে আর বিন্দুমাত্র দেরী না করে শেষ তীর ছুড়ে বলে, 'আমার 'ইয়ংতেলচ' আমার

www.pathagar.com

কাছে ফিরিয়ে দাও। সাথে সাথে মংচ এর মূল 'ইয়ংতেলচ' যথাস্থানে দেখা দিলো। অতঃপর সে হাফ ছেড়ে বাঁচল।

পাংখোয়াদের রূপকাহিনি

বাঘের সাথে বন্ধুত্ব (Mi in Mariampa insian thu)

বাঘের সাথে পাংখোয়াদের সম্পর্ক সুদূর অতীতের। বাঘকে ভয় করেনা এমন মানুষ খুবই কম পাওয়া যায়। বন থেকে বনজ সামগ্রী সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক মানুষ বাঘের হিংস্র থাবার প্রাণ হারায়। এমন ভয়ংকর হিংস্র প্রাণীর সাথে কোন কোন আদিম জনগোষ্ঠীর পরম বন্ধুত্ব থাকতে পারে যা শুনলে হয়ত অবিশ্বাস্য মনে হয়। জগতের সব পশু শিকার করা হেলেও পাংখোয়াদের বেলায় বাঘ শিকার করার কোন ভাবেই সামাজিক অনুমতি নেই। এক কথায় পাংখোয়া সমাজে বাঘ শিকার করা নিষিদ্ধ। তারপরেও কোন পাংখোয়া যদি ভুলবশত বাঘ শিকার করে ফেলে তাহলে সে সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়। পাংখোয়া পূর্ব পুরুষেরা বাঘের পরম বন্ধু হয়ে পরস্পর ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠর হয়ে উঠে। তাদের যে কোন শিকার মিললে যে কোন পশুর একটি উৎকৃষ্ট অংশ বন্ধুর জন্য রেখে দিত উভয়েই। বাঘ তার মানব বন্ধুর ভাগটা পৌঁছে দিত ঘরের দুয়ারে দুয়ারে। বন্ধু রেখে আসত জঙ্গলে গাছের নিচু ঢালে বা বাঘ চলাচলের পথের ধারে।

পাংখোয়াদের কাছে বাঘ হচ্ছে তাদের প্রধান দেবতা খোজিং এর বাড়ির পালিত কুকুর স্বরূপ। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে খোজিং এর আশীর্বাদ দৃষ্টে তাদের মধ্যে কিছু মানুষ যাদু মন্ত্রের প্রভাবে দৈব শক্তির অধিকারী হয়। পাংখোয়া ভাষায় তাদের বলা হয় কোয়াভাং বা সিদ্ধি পুরুষ। পাংখোয়ারা বিশ্বাস করে কোয়াভাং হচ্ছে করলে বাঘের স্বরূপ ধারণ করতে পারে। এসব কারণে পাংখোয়ারা বাঘের মাংস খায় না। পাংখোয়াদের মধ্যে সাকং গোত্রের কোন ব্যক্তি মারা গেলে মৃত ব্যক্তির কবরের আশে পাশে বাঘ আসে শোক জানাতে। ভাল করে লক্ষ করলে কবরের আশে পাশে বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখা যায় বলে তারা বিশ্বাস করে।

বাঘ নাকি প্রতিদিন ভোর বেলায় সূর্যোদয়ের সময় প্রণাম করত শিকারের সময় তার মানব বন্ধুর সাথে যেন দেখা না হয়। বাঘ সূর্যের কাছে আরো প্রার্থনা করত এই আজ সারাদিন হিংসাত্মক মনে বন্ধুর সাথে যেন মুখোমুখি না হই। সে পাহাড়ে গেলে আমি যেন ঝর্না বা ছড়াতে থাকি। সে ছড়াতে গেলে আমি যেন ঝর্না পাহড়ে যাই। তার পরেও হঠাৎ করে শিকারের মুহূর্তে দেখা হলে যেকোন পাংখোয়া 'মারিয়াম- পা লামপুই হং কিয়ান র' বা সুপ্রিয় বন্ধু যাওয়ার জন্য আমাকে রাস্তা দাও- সরে যাও। একথা বললে বাঘ সরে যায় আপন মনে। এই সত্য প্রমাণ আজও পাংখোয়াদের মাঝে আছে। প্রশ্ন জাগতে পারে, এমন হিংস্র পশু কেমন করে পথিকের কথা শুনে সরে যায়? অবিশ্বাস করার কিছুই নেই, এখনও এরকম কথা বলে বাঘকে সরিয়ে দিয়েছে। এমন লোক পাংখোংয়া সমাজে খুঁজে পাওয়া যায়।

বাঘের সাথে পাংখোয়াদের বন্ধুত্ব টিকে থাকলেও মাংস ভাগাভাগি আর টিকে থাকেনি। কারণ হল— একদিন বাঘ মানুষের হাত নাকি এনে দিয়েছিল তার পাংখোয়া

www.pathagar.com

মানব বন্ধুকে। তারপর থেকে পাংখোয়ারা বাঘ বন্ধুর প্রতি দুঃখ করে মাংসের ভাগটা গ্রহণ করে না। তারপরেও টিকে আছে তাদের বন্ধুত্ব। থাকবে চিরদিনই। যতদিন পাংখোয়া জনগোষ্ঠী বেঁচে থাকবে পাহাড়ে জঙ্গলে। টিকে থাকবে বাঘের সাথে পরম বন্ধুত্ব। এখনও যেকোন পাংখোয়া শিকারির ফাঁদ বা কলে রাতে অজান্তে বাঘ আটকালে মারিয়াম পা চামপাল অর্থাৎ সুপ্রিয় বন্ধু, এই অনিচ্ছাকৃত আঘাতের জন্য দুঃখিত বলে দুঃখ প্রকাশ করে। পাংখোয়ারা বাঘ শিকার না করলেও এক শ্রেণির চোরা কারবারীদের গুপ্ত শিকারের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন-জঙ্গল থেকে বাঘ বিলুপ্ত হতে চলেছে।

তুই চং (Tui Chawng Thiam)

(পাংখোয়া ভাষায় তুই এর অর্থ পানি। চং মানে কথা। তুই চং এর অনুবাদ হয় পানির কথা। তুই চং একজন পাংখোয়ার নারীর নাম। তুই চং একটি নদীর নাম। আবার নদীর বিশেষত্বের সাথে অলৌকিক ভাবে এক হয়ে যায় মানুষের নাম। মানুষের নাম কিভাবে যে নদীর নাম রূপান্তরিত হলো সে কথাই জানা যাবে পাংখোয়া এই লোক কাহিনিতে)।

তুই চং ও ন্যাক এ্যাং নামে দুই সহোদর বোন ছিল। লুসাই পাহাড়ের সাধারণ এক পাংখোয়া পরিবারে তাদের জন্ম হয়। বয়সে তুই চং বড় এবং ন্যাক এ্যাং ছোট। দুর্গম পাহাড় গহীন অরণ্যে দুই বোন হেসে খেলে এক সাথে বড় হয়েছে। দুই বোনের মধ্যে ছিল গভীর মমতাবাধ। ছায়ার মতো লেগে থাকতো দুইজন দুইজনের সাথে। কেউ কাউকে ফেলে কোথাও যেতো না এমনকি ঘুমাতোও না। দুইজন যেন পাতার এপিঠ ওপিঠ।

তুই চং ও ন্যাক এ্যাং সে গ্রামের মেয়ে। যে গুহা থেকে তাদের পূর্ব পুরুষ এর বড় এক নেতা থলানরকপা প্রথম বের হয়ে এসেছিল। লুসাই পাহাড়ের বুরদেইয়া উপজাতির বান হলিয়েন গামের কাছেই সে গুহা। থলানরকপা খুবই শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। যে প্রথম গয়ালকে পোষ মানিয়েছিলেন এবং পাথিয়ানের (ঈশ্বরের) কন্যাকে বিয়ে করেছিল। তুই চং ও ন্যাক এ্যাং যখন কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করল ঐ সময়ে তাদের মা মারা যায়। মায়ের অকাল মৃত্যুতে দুবোন প্রচণ্ড কষ্ট পায় মনে। মায়ের কথা মনে পড়লে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে নিরবে অশ্রু ফেলে। এভাবে মায়ের মৃত্যু শোক এবং একমাস শেষ না হতেই তাদের পিতা দ্বিতীয় বিয়ে করে। সংসারে নু-জুয়াহ (সৎ মা) আসার পর তারা তাকে খাব আপন করে নিয়েছিল। সৎ মা কে আপন মনে করে মা হারানো ব্যথা ভুলতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতির নির্মম পরিহাস তাদের কপাল থেকে দিনের পর দিন সমস্ত সুখ শান্তি হারিয়ে যেতে লাগল। সৎ মার জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে দেখতে দেখতে একবছর পেরিয়ে গেল। তুই চং ও ন্যাক এ্যাং এর সৎ মা সাংঘাতিক ঝগড়াটে ও অলস স্বভাবের একজন মহিলা। নিজে সংসারে কোন কাজ কর্ম করে না। সমস্ত কাজ করতে হয় দুইবোনকে। জুম করা ফসল তোলা এবং ঝর্না থেকে পানি নিয়ে আসা থেকে শুরু করে সংসারে সকল কাজ করতে হয় তাদের। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি, রোগ-বালায় যতই কিছুই হোক কাজ থেকে তাদের মুক্তি নেই। সকল কাজে সৎ মা তাদের দোষ খুজে বেরায় এবং দুইবোনের নামে নানা নালিশ দিয়ে তাদের বাবাকে

www.pathagar.com

ক্ষিপ্ত করে তোলে। সৎ মা ষড়যন্ত্র করতে থাকে কীভাবে দুইবোনকে চিরতরে শেষ করা যায়।

একদিন তুই চং একা জুমে গেল। ন্যুক এ্যাং বাড়িতে একা। সৎ মা এই সুযোগটি কাজে লাগাতে এদের বাবাকে প্ররোচিত করল। তিনি তার স্বামীকে কানে কানে কি যেন বলে পাশে বাড়ির দিকে রওনা হয়। বাবা ন্যুক এ্যাং কে ডেকে বলল, বাড়িতে কেউ যখন নেই চল মা, এই সুযোগে আমরাও বেড়িয়ে আসি। তোমাকে সেখান থেকে অনেক কিছুই নিয়ে দেব। এই বলে ন্যুক এ্যাং কে নিয়ে জঙ্গলে পথে অজানা উদ্দেশ্যে রওনা হল। দুটি পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আরএকটি পাহারের মাঝামাঝি যেতে একটি জঙ্গলী ফুলের গাছ দেখতে পেল। ন্যুক এ্যাং তার বাবাকে বলল গাছটি থেকে সে কিছু ফল নেবে। বাবা অনুমতি দিল ফুল নেয়ার জন্য। সে হাত টেনে নাগাল না পেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ফুল নেয়ার চেষ্টা করল। এমন একটি মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল তার বাবা। বাড়িতে থেকে সাথে নিয়ে আসা তিন হাত লম্বা শেলটি পাশ থেকে ন্যুং এ্যাং এর বুকের লাগানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। ন্যুং এ্যাং একটু করে দেখে ফেলল। সে বলল বাবা তুমি আমাকে মারকে চেয়েছিলে বুঝি? বাবা বলল ছিঃ ছিঃ তুমি কি বল মা, তোমাকে মারতে যাব কেন? একটি কাঠ বিড়ালী দেখেছি তাকে মারত চেয়েছি। তুমি আমার প্রাণের আলো তোমাকে আমি কত ভালবাসি। একথা বলে মেয়েকে সান্তনা দিল এবং আরো বলল মা ঐ যে একটু উপরের ডালে দেখা যাচ্ছে ফুলগুলো নাও। এগুলো বড় এবং সুন্দর।

ন্যুং এ্যাং বাবার কথার মত আবারো জোরে জোরে উপরের দিকে লাফিয়ে ফুল নিতে চেষ্টা করতে থাকল। এবার আর দেরি না করে তার বাবা দুহাতে ধরে শেলটি মারল। ন্যুং এ্যাং এর বুকে উপর ডান পার্শ্বে শেলটি লেগে তার ডান স্তনটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তখনো একগুচ্ছ ফুল তার হাতের মুঠোয় ধরা ছিল। এর কিছুক্ষণ পরে তার মৃত্যু হয়।

একা একা জুমের তুই চং এর মনটা প্রচণ্ড অস্থির লাগছিল। বুকের ভিতরতা যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। শুকিয়ে যাচ্ছে তার জিহ্বা ও ঠোঁট। অসময়ে সে জুম থেকে বাড়িতে ফিরে এল। আসার সময় ভা-মিম (পাখির ধরার ফাঁদ) ধরা পড়া বন্য মধুরা ও চংমাকে (চিনার) নিয়ে আসতে একটুও ভুলেনি। মনে মনে ভাবছিল বাড়িতে গিয়ে দুবোন মিলে মথুরাটি আগুনে সিদ্ধ করে দুপে/ ভর্তা বানিয়ে খাবে। বাড়িতে এসে দেখে নেই। ন্যাক এ্যাংকে অনেক ডাকা ডাকি করল। নাহ, কোথাও তার সারা শব্দ পেলনা। তুই চং ভাবতে থাকে এরা সবাই কোথায় গেল। সম্ভবত পাশের গ্রামে তার সৎ মায়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছে। এই কথা ভেবে তুই চং নিজে নিজে শান্ত্বনা পেল। তবে ন্যুক এ্যাং এর উপর বেজার রাগ হল।

তুই চং স্নান শেরে খাওয়া দাওয়া শেষ করল। তার একা একা ভাল লাগছিল না। তাই মাসাং-এ পোয়ান বু তে (কোমর তাত) টাঙ্গানো ন্যুং এ্যাং এর অর্ধেক বুনা পোয়ানচাই (পরনে কাপর) টি বুনতে বসল। কাপড়ের এক লাইন তুই পন (পানির ঢেউ) নকশা তোলা শেষ করল। এমন সময় বাড়ির পালা কুকুরটি কোথেকে এসে ঘেউ ঘেউ করে তুই চং এর কাছাকাছি এসে চিৎকার করছিল। তুই চং কুকুরের উপর

www.pathagar.com

বিরক্ত হয়ে কোমর থেকে তাঁতের বানানো রশিটি খুলে উঠে দাঁড়াল। এই সময় কুকুরটি তার পরনের কাপড় মুখে কামড়ে ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে যেতে চাইল। তুই চং কুকুরকে অনুসরণ করে ঘড়ে ঢুকল। এক কণায় একটি হাইলেংপাই (ঝুড়ি) এর দিকে তাকিয়ে কান্নার মত সুরে কুকুরটি আবার চিৎকার করছিল। তুই চং জুড়িতে রক্তাক্ত ধরনের কিছু একটা আছে বলে অনুমান করল। জুড়িতে হাত দিয়ে দেখতে পেল একটি নারীর স্তন।

ন্যাং এ্যাং কে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে তার বাবা যখন বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল তাদের সাথে কুকুরটিও গিয়েছিল। ন্যুং এ্যাং কে কিভাবে হত্যা করেছে সব দেখেছে কুকুরটি। ন্যুং এ্যাং বেক হত্যা করে তার বাবা স্তনটি বাড়িতে নিয়ে এসে জুড়িতে রেখেছিল তার স্ত্রীকে দেখানোর জন্য। সে সত্যি যে ন্যুং এ্যাংকে হত্যা করেছে তার প্রমাণ স্বরূপ।

কুকুরকে অনুসরণ করে তুই চং জঙ্গলের পথে রওনা হল। যে পথে তার বাবা ন্যাক এ্যাং কে নিয়ে গিয়েছিল। যে ফুল গাছের নিচে ন্যুক এ্যাং কে হত্যা করেছে সেখানে এসে পৌছাল। ন্যুক এ্যাং এর মৃত দেহ যে অবস্থায় পড়েছিল সেভাবেই রয়েছে। তুই চং তার বুকের উপর মাথা রেখে অনবরত কাঁদতে থাকে। তুই চং এর কান্নায় বনের লতা পাতা গাছপালা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্ত পোকা মাকড় পশু পাখির আনাগোনা থেমে গেল। সবাই যেন তার কান্নায় শব্দ অনুধাবন করছে। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে তুই চং এর তিন দিন তিন রাত পেরিয়ে যাবার মুহূর্তে হঠাৎ অদৃশ্য এক শব্দ শুনতে পেল। তুই চং এর করুণ কান্নায় ব্যথিত খোজিং (খোজিং পাংখোয়াদের বন পাহাড়ের দেবতা) পাথিয়ান (ঈশ্বর) কে তারা বিশ্বাস করলেও সমস্ত পূজা অর্ঘ্য দেবতা) খোজিং এর উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে। তুই চং মনে মনে খোজংকে স্মরণ করে নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও ন্যুক এ্যাং এর জীবন ফিরে পেতে প্রার্থনা করেছে। অদৃশ্য ভাবে খোজিং জানালো তুই চং তুমি আর কেঁদো না তোমার প্রাণের ছোট বোনকে বাঁচাতে পারবে। এমন একটি কলা পাতা খুঁজে দেখ যে পাতার উপর কোন দিন পোকা মাকড় বসেনি, এমন একটি ছরা খুঁজে দেখ যে ছড়ায় কোনদিন কোন পশু পাখি ঢুকেনি বা উড়ে যায়নি। কলা পাতায় তোমার বোনকে শুইয়ে তার দেহে ছরার পানি ছিটালে সে বেঁচে উঠবে। অদৃশ্য এই শব্দ শুনার পর হঠাৎ তুই চং এর কান্না থেমে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে কুকুরটিকে দেখতে পেল। সে কুকুরকে বলল কাঁ হ্ং কাল লৌতেং কা ন্যুক হ্ং এ্যাং হি ঙাক র ঔ। (আমি না আসা পর্যন্ত ন্যুক এ্যাং কে পাহারা দিয়ে রাখবি) এই কথা বলে তুই চং কলা পাতা ও পানির সন্ধানে রওনা হয়। সমস্ত বন পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে সাত দিন সাত রাত পেরিয়ে গেল। তখনো পাতা বা পানির খোজ মেলেনি। না পেয়ে বিষণ্ন মনে ফিরে আসার পথে অবশেষে বনের ঠিক মধ্য খানে পেয়ে গেল। অদৃশ্য কথামত সে খুব যত্ন করে কলা পাতা ও বাঁশের চোঙায় করে ছড়ার পানি নিয়ে এল। এসে দেখল কুকুরটি ন্যুক এ্যাং কে পাহাড়া দিয়ে বসে আসে।

তুই চং নিয়ে আসা কলা পাতার উপর ন্যুক এ্যাং কে শুইয়ে দিল। তার বিছিন্ন স্তনটি নিদির্ষ্ট স্থানে লাগিয়ে রাখল। তারপর তার মুখের উপর একবার পানি ছিটাল। তার দেহ সাথে সাথে নড়ে চড়ে উঠল। দ্বিতীয় বার পানি ছিঠানোর পর চোখ মেলে

www.pathagar.com

তাকাল। তৃতীয় বার পানি ছিঠানোর পর সে শোয়া থেকে উঠে বসল। তখন তুই চং এর মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সমস্ত সুখ শান্তি তার মনের মধ্যে। ন্যাক এ্যাংয়ের বেঁচে উঠা এ যেন তুই চং এর জীবনের পরম পাওয়া। ন্যু এ্যাংয়ের কিছুই মনে পড়ে না। তার শুধু মনে আসে সে বাবার সাথে বেড়াতে এসে গাছ থেকে ফুল নিতে চেয়েছিল সে তুই চং কে প্রশ্ন করে, দিদি আমরা এখানে কেন? দিদি ছোট বোন সমস্ত কথা খুলে বলল।

ন্যাক এ্যাংয়ে প্রচণ্ড পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। সে দিদির কাছে একটু পানি চাইল। দিদি বাঁশের চোঙা করে দুর থেকে নিয়ে আসা অবশিষ্ট পানি দিল। এক নিঃশ্বাসেই সমস্ত পানি খেয়ে ফৈলল। স্যাং এ্যাংয়ের হৃদয়ে প্রচণ্ড তৃষ্ণা। সে আরো পানি খেতে চাইল। এভাবে আশে পাশে কুয়ো ছড়া ঝর্নার পানি খেয়ে শেষ কর। তবু তার তৃষ্ণা নিবারণ হয়না। কোন উপায় না পেয়ে তুইচং তার সমস্ত পানি অলংকার গলিয়ে পানি করে বোনকে খাওয়াল। তাতেও কিছু হল না। ন্যাক এ্যাং আরো পানি খেতে চাইল শেষ পর্যন্ত কোথাও পানি না পেয়ে তুই চং ছোট বোন কে বলল, ন্যাক এ্যাং এই মুহূর্তে তোমার কোনটি বেশি প্রয়োজন? তোমার দিদি নাকি পানি? ন্যাক এ্যাং বলল দুটিই আমার প্রয়োজন। এই মুহূর্তে পানি তারপর দিদি। তুই চং বললো তাহলে একটু অপেক্ষা কর। পানি পাবে।

তুই চং জানত তার ভাগ্যে আছে জীবনে সে কোন একদিন গলে পানি হয়ে যাবে। সে ছড়ার উজানে গিয়ে নিজোক গলিয়ে পানি করে ফেলল। ন্যাক এ্যাং দেখতে পেল শুকনা ছড়া হঠাৎ পানিতে ভরে গেল। সে এক মুহূর্ত দেরি না করে এক নিঃশ্বাসে ছড়ার একটি বাঁকের সমস্ত পানি খেয়ে শেষ করল। তারপর দিদিকে খুঁজতে লাগল। দিদি কোথায় গেল? উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সব দিক চিৎকার করে দিদিকে ডাকল। না-কোথাও দিদির দেখা পেল না। তখন তার মনে পড়ল একটু আগে দিদির বলা সেই কথা সে যে পানি খেয়েছে সেতো তার দিদি। যে দিদি তার জীবন বাঁচিয়েছে তাকে সে খেয়ে ফেলল। এই অনুশোচনায় পাগলের মত দিদি করে প্রলাপ বকতে লাগল।

এমন সময় জুম থেকে বাড়িতে ফিরছিল থ্লাংভাই মালাল এর কিছু লোকজন। তারা ন্যাক এ্যাংকে দেখতে পেল। তার কাছে জানতে চাইল কে সে, তার নাম ঠিকানা ইত্যাদি। ন্যাক এ্যাং কোন উত্তর দিল না। তখন তারা বলল। ঠিক আছে তুমি আমাদের সাথে চল তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তোমাকে আমাদের সর্দারের কাছে নিয়ে যাব। যিনি এই পাহাড়ের মতো বিশাল ভারী এবং উই পোকার বাসার মতো অনড় (যা নাড়া যায় না) তাই তার নাম থ্লাংভাই মালাল। তিনি এই পাহাড়ি এলাকার মালিক। তিনি অনেক মক্তি ও প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী। তোমার দিদিকে তিনি খুঁজে দিতে পারবেন। আমাদের সর্দারের মনের অনেক দুঃখ। দীর্ঘ সংসার জীবনে তার কোন সন্তান নাই। আমরা সর্দারের দ্বিতীয় বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজছি। তুমিতো সুন্দরী যুবতি। তুমি রাজি এবং সর্দারের পছন্দ হলে তোমাকে বিয়েও করতে পারে। তোমার কোন ভয় নেই। এই বলে তারা ন্যাক এ্যাংকে নিয়ে থলাংভাই মালালের বাড়িতে এল্ ন্যাক এ্যাং থলাংভাইকে সমস্ত কথা খুলে বলল্ ষোড়শী ন্যাক এ্যাং এর সুঠাম দেহ, রূপ-লাবণ্য, চলাফেরা কথাবার্তায় খলাংভাই খুবই মুগ্ধ হল। তিন দিন শেষ না হতেই মহা ধুমধামে ন্যাক এ্যাংকে নিয়ে করে নতুন সংসার শুরু করল।

www.pathagar.com

সর্দার তার স্ত্রী ন্যুক এ্যাংকে খুব ভালোবাসে। ন্যুক এ্যাংয়ের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সবসময় মনোযোগ রাখে তার যত ইচ্ছে জাগত থলাংভাই সব পূরণ করত। এসব প্রথম স্ত্রী একদম সহ্য করত না। ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে মরত। এক সময় সতীনের সংসারে দিনের পর দিন তাস জ্বালা বাড়তে থাকে। এভাবে তাদের সংসার এক বছর পেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে ন্যুক এ্যাং সন্তান সম্ভবা হয়েছে।

আদিকালে পাংখোয়া সমাজে তিন দিনের মধ্যেই সর্দারের সন্তানের নাম রাখার রেওয়াজ ছিল। নাম রাখার ক্ষেত্রে নির্ধারিত অনুষ্ঠানে পায়ে যমজ আঙ্গুলের একটি লাল মোরগ অবশ্যই প্রয়োজন হতো। তাই সর্দার দীর্ঘদিন পর সন্তানের পিতা হবে এই খুশিতে নিজেই এমন একটি মোরগ খুঁজতে গিয়েছে দুরের গ্রামে ঐ দিন ভোরে সূর্য উদয়ের মুর্হুতে ন্যুক এ্যান যমজ পুত্র সন্তানের জন্ম দিলো। সন্তান জন্মের পর পরই ন্যুক এ্যান অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফিরে এলে সে সন্তানকে খুঁজতে থাকে। ধাত্রী সতীনকে সে প্রশ্ন করে তার সন্তান কোথায়? সতীন বলল তুমি মৃত সন্তান প্রসব করেছ। ন্যুক এ্যান সতীনকে বলল তুমি এসব কি বলছ? আমি আমার সন্তানের কান্নার শব্দ শুনেছি। এর পর আমার আর কিছুই মনে পরে না। আমি মৃত সন্তান জন্ম দিয়েছি এ কথা বিশ্বাস করি না। তোমরাই আমার সন্তানকে মেরে পেলেছ। এ কথা বলতে বলতে সে অনবরত কাঁদতে থাকে। যে খালে ছোট বোন ন্যুক এ্যান এর তৃষ্ণ মেটাতে তুই চং গলে পানি হয়ে গিয়েছিল সে খালেই ন্যুক এ্যান এর সন্তানদ্বয়কে তার সতীন ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। পুত্র শোকে খালেই পাড়ে বসে ন্যুক এ্যাং অনন্তকাল কাঁদতে কাঁদতে তার চোখের জলেই সৃষ্টি হলো আর একটি ছড়া। যে ছড়াটি মিলিত তুই চং খালের সাথে।

বাস্তবে - তুই চং মিজোরাম প্রদেশের লুংলাই জেলায় অবস্থিত একটি সরু খরস্রোতা নদীর নাম। নদীটি লুসাই পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে পার্বত্য চট্রগ্রামের সীমান্তবর্তী ঠেগায় এসে কর্ণফুলি হ্রদের সাথে মিলিত হয়েছে। একই নদী দুই দেশে দুই নামে পরিচিত। তুই চং নদী-খাল সম্পর্কে পাংখোয়াদের লোকবিশ্বাস হল বড় বোন তুই চং মরেনি। সে এখনো বেঁচে আছে। তার দেহ আমরা দেখতে পাইনা কিন্তু তার আত্মা ঘুরে বেড়ায়। এ কথা ও বিশ্বাস করে তুই চং এখনো অনন্ত যৌবনা যুবতী। তার নিয়মিত ঋতুস্রাব হয়। নদীর উজানে কখনো কখনো শুকনো স্থান বা পাথরের গায়ে তার দাগের চিহ্ন দেখা যায়। ন্যুক এ্যাংয়ের সন্তানেরা ও মরেনি। তারা ও বেঁচে আছে মাসী তুই চংয়ের বুকেই। তুই চং তাদের মাতৃস্নেহে বাঁচিয়ে রেখেছে। এরা বেঁচে থাকবে। যতদিন পাংখোয়া নামক কোন মানব গোষ্ঠি বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে এবং লসাই পাহাড় থাকবে স্থির দাঁড়িয়ে।

সুয়ানলু সুয়ানলু (Suanlu Suanla thiam)

এক পিতার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা সন্তান ছিল। পুত্রদের মধ্যে একজন প্রস্তাব দিল সমাজের আমাদের সুনাম হবে এমন কিছু কৃতিত্ব দেখানো উচিত। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল দা দিয়ে এক কোপে ঘিল লতা কেটে ফেলা। যে এক কোপে পারবে না তাকে বাঘ চলাচলের পথের ধারে ঘর বানিয়ে রাখা হবে বলে শপথ দিয়ে পাঁচ সন্তানকে জন্মদাতা পিতাই প্রতিজ্ঞা করাল। পরের দিন সবাই যার যার দা যথাযথভাবে ধার করল। হঠাৎ

www.pathagar.com

তাদের পিতা ঐ মুহূর্তে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে গেলে কে সুযোগে পাঁচ ভাই মিলে বুদ্ধি করে পাথর দিয়ে ঘষে তাদের পিতার দা এর ধার ভোঁতা করে দিল। পাঁচ সন্তানেরা তাদের যথেষ্ট ধারালো দা নিয়ে সেই ঘিলা লতা কাটার প্রতিযোগিতায় নামলো। তারা প্রত্যেকে এক এক কোপে ঘিলা কেটে শেষ করেছে কিন্তু তাদের পিতা এক কোপে পারলো না। আবার দা এ কোপ দিল তাও পারলো না। তখন ছোট ছেলে প্রশ্ন করল, বাবা কথা থাকলে ও এমন ভয়ানক কাজ করা উচিত নয় তোমার। পিতা বলল পুরুষের জবান এক কথা দুই কথা হবে না। আমাকে বাঘ চলাচলের রাস্তার পাশে কুঁড়ে ঘর তুরে দাও। পাঁচ সন্তানেরা মিলে বাঘ চলাচলের পথের দ্বারে ঘর তুরে দিল এবং এক বিকেলে পিতাকে সেখানে রেখে সন্তানেরা সবাই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে এল। তারপর সন্ধ্যাবেলায় হুম হুম ভয়ানক শব্দে গর্জে বাঘেরা আসতে শুরু করল।

তখন তাদের পিতা চিৎকার করে বরে উঠল আমি পাঁচ বীর পুত্রের জন্মদাতা। আমার শরীরের গঠন বোতলের মত। আমার দাঁত মুরগীর ঘরের দরজার মত। চোখ সূতার বলের মত বড়। সেই ব্যক্তি আমি। কোথায় আছ বলে গর্জে উঠতেই বাঘেরা পালিয়ে যায়। পরের দিন সকালে তার একমাত্র মেয়ে খাবার নিয়ে এসে ডাকল। বাবা আছ নাকি? বাবা বলল হ্যাঁ আছি। এসো মা ভিতরে এসো। এভাবে সকাল বিকাল মেয়ে খাবার দিয়ে আসত। পিতা একই সুরে দুই রাত বাঘ তাড়িয়ে তৃতীয় রাতে তার চোখে ঘুম এসে যায়। এই সুযোগে বাঘেরা এসে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলল। সকালে তার মেয়ে প্রতি দিনের মত ডাক দেয় বাবা বাবা আছ নাকি? আমি খাবার নিয়ে এসেছি। কিন্তু ঘরের ভিতর কোন সাড়া শব্দ পেল না। মেয়ে বার বার বাবা বাবা বলে ডাকার পরে ও বাবার কোন জবাব নেই।

সে বাড়িতে এসে তার বড় ভাইদের কাছে সব ঘটনা খুলে বলল। শুন, দাদারা বাবা আর বেঁচে নেই। তখন পাঁচ ভাই বলল এভাবে হতে পারেনা। বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে। বাবার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাঁচ ভাই তাদের তীর ধনুক ধার দিয়ে তৈরি হলো। পরের দিন রওনা হর সেই বাঘের আস্তানার দিকে। পথের মধ্যে অনেক পাড়া গ্রাম অতিক্রম করে মোরগ পাড়ায় এসে পৌছল। মোরগ বলল কোথায় যাও পাঁচ ভাইরা? উত্তরে তারা বলল, বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবে কিনা। মোরগ বলল আমি সিঁড়ির উপরে বসে ডাক দেওয়া মাত্র আমাকে ধনুকের তীর দিয়ে মারবে। মারতে পারলে আমার মাংস তোমাদের পথিক খাদ্য হিসেবে নিয়ে যাবে। পাঁচ ভাই খুশি হয়ে ধনুকের তীর দিয়ে মারার প্রস্তুতি নিল। মোরগ তার কথা মত উঁচু সিঁড়ির উপর বসে কু কু রু কু ডাক দেওয়া মাত্র পাঁচ ভাই তীর ছুঁড়লো। কিন্তু কেউ লাগাতে পারলো না।

এইভাবে পাঁচ ভাই মোরগ পাড়া অতিক্রম করে তারা মালা শুকর পাড়ায় পৌছল। সেখানে ও ঠিক একই প্রশ্ন। পাঁচ ভাইরা কোথায়? পাঁচ ভাইদের একই জবাব পিতা হত্যার প্রতিশোধ নিতে। তোমরা বাবার প্রতিশোধ নিতে পারবে কি পারবে না পরীক্ষা করে দেখি। সেই একই অবস্থা মোরগের মত কেই তীর লাগাতে পারলো না শুকর মালাকে। তারপরও নরম সুরে মালা শুকর তাদের বলল তোমরা পিতার হত্যার

প্রতিশোধ নিতে পারবে? তারা বলে উঠল পারব। এভাবে তারা গয়ালের পাড়া গরুর পাড়া অতিক্রম করতে লাগল। সবারই একই প্রশ্ন এবং পাঁচ ভাই কোমল সুরে ডাকে নানী ঘরে মেহমান এসেছে। দরজা খুলে দাও। ঘরের ভিতর থেকে ডেবী বলে আমি অসুস্থ। দরজা খুলতে পারবনা। মেহমানরা মোরগ রাস্তা ও শুকরের রাস্তা হয়ে ডেবি তার ঘরে প্রবেশ করেছে। তখন শেষ বিকেল। পাঁচ ভাইয়ের বিনীত অনুরোধে ডেবী দরজা খুলে দিল। তাদের জন্য ভাত রান্না করে দিল। তরকারি হিসেবে তাদের পিতার মাংস সেটিও রান্না করে দিল। খাওয়া দাওয়া শেষে পাঁচ ভাই ডেবীকে রান্নার জন্য খুব প্রশংসা করল। রাত অনেক হয়েছে। এবার ঘুমাবার পালা। ডেবী পাঁচ ভাইকে বলল পুত্ররা আমার ঘরে বিভিন্ন ইঁদুর আছে। তোমাদের ধনুকের তীরগুলি আমাকে দাও আমি যত্ন করে রেখে দেব। পাঁচ ভাই সরল বিশ্বাসে তীরগুলি ডেবী হাতে তুলে দিল। তারা ঘুমানোর পর ডেবী দাঁত দিয়ে তাদের তীরগুলির ধার নষ্ট করে দিল। সকালে ডেবী পাঁচ ভাইকে প্রশ্ন করলো। তোমরা কি চাও? গাছের পিছলা-না-উচু মাটির পিছলা? তারা বলে উঁচু মাটির পিছলা। তারপর পাঁচ ভাই উঁচু মাটির আড়ালে লুকিয়ে বসল। ডেবী তখন তার পালিত কুকুর (বাঘ) কে ডাকল। কোথায় ক্ষুধার্ত কুকুরেরা এসো। তোমাদের খাওয়ার বাকি আদারগুলো খেতে এসো। হুম হুম করে ক্ষুধার্ত বাঘেরা এল। পাঁচ ভাইরা একে একে সবাই তীর ছুড়ালো। একটা বাঘও মারতে পারলনা। অবশেষে পাঁচ ভাই বাঘের খাদ্য হলো।

এই দুঃসংবাদ শুনে বাড়িতে তাদের অসহায় ছোট বোন কি করবে ভেবে পায় না। পিতাকে হারাল শেষ পর্যন্ত পাঁচ ভাইকেও হারাল। নিঃস্ব মনে শুধু পাথিয়ানকে (সৃষ্টিকর্তা) ডাকতে লাগল। একদিন ঘরের পেছনে মাচাং এ ধান শুকাতে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আবারও সৃষ্টি কর্তাকে স্মরণ করল। তখন আকাশ থেকে একটি আমলকী পড়ল। এই আমলকী খেয়ে গর্ভবর্তী হল পাঁচ ভাইয়ের একমাত্র ছোট বোন। কিছু দিন পর তার একটি পুত্র সন্তান জন্মাল। সন্তানের কি নাম রাখবে ভেবে পায় না। এক ধাত্রী বিধবা বুড়ি বলল আমলকী খেয়ে যেহেতু সন্তান এসেছে সেহেতু তার নাম সুয়ানলো সুয়ানল (মানব আমলকী) রাখলেই পার। সবাই এক বাক্যে রাজি হল। নামের জন্য বুড়িকে প্রশংসা করা হল। সুয়ানল সুয়ানলা ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। তার বয়সের সঙ্গী সাথীরা নানান খেলাধূলায় মেতে থাকে। তারও ইচ্ছা করে খেলতে। একদিন মায়ের কাছে গিয়ে বলে মা আমার বন্ধুরা সবাই খেলছে, আমিও খেলব। আমাকে ঘিলা দাও। তার মায়ের জবাব যাও ঘরের বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বল, 'আমাকে ঘিলা দাও'। মায়ের কথামত আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘিলা চাইল। আকাশ থেকে পাথরের ঘিলা পড়ল। কিন্তু এই ঘিলা দিয়ে বন্ধুরা তাকে খেলায় নিতে চায় না। পাথরের ঘিলার সাথে বারি খেয়ে অন্যদের ঘিলা ফেটে যায়। এই কারণে বন্ধুরা তাকে নানান কথা বলে। এমনকি পিতৃবিহীন সন্তান বলে গালি গালাজ করে। মা তাকে সান্তনা দিত। কে বলে তুমি পিতৃবিহীন সন্তান। তোমার বাবা সবার চাইতে দয়ালু। আমরা যাকে পাথিয়ান (ঈশ্বর) হচ্ছে তোমার পিতা। তোমাকে এখন থেকে প্রস্তুতী নিতে হবে তোমার পাঁচ মামার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। তাকে সব কায়দা কৌশল শিখিয়ে দিল। এখানকার পাহাড়ে একজাতীয় মিমের চাষ করা হয়। মিম দেখতে গমের মত। আছিলা মিম কিন্তু খুবই পিছলা। মিমের উপর কেই সহজে

www.pathagar.com

দাঁড়াতে পারে না। সুয়ানলু সুয়ানলা মিমের উপর দৌড়ে দৌড়ে অভ্যস্ত করল নিজেকে। সুয়ানলু সুয়ানলার মা বলল এবার সময় এসেছে। তোমার মামাদের প্রতিশোধ নিতে পারবে? ধনুক তীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস আকাশের দিকে তাকিয়ে তোমার বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিও। তার জিনিগুলো খুবই শক্ত।

সুয়ানলু সুয়ানলা রওনা হল তার মামাদের প্রতিশোধ নিতে। তাদের মতো সেও মোরগ পাড়া, শুকর পাড়া , গোয়াল পাড়া, গরুর পাড়ার পথ অতিক্রম করলো। শেষ পর্যন্ত ঐ ডেবীর ঘরে এসে পৌঁছল। ডেবী বলল। সুয়ানলু আমার ঘরে অনেক জন্তু আছে, তোমার জিনিসগুলো নষ্ট করতে পারে। আমাকে দাও যত্ন করে রেখে দেব। সে মানলনা। ঘুমানোর সময় তীর বালিশের নিচে রেখে ঘুমাল। রাত যখন গভীর হল ডেবী চুপি চুপি উঠে চুরি করে তার ধনুকের তীরের ধার বিকল করার চেষ্টা করল। কিন্তু পাথরের জিনিস বলে পারল না। পরের দিন ডেবী সুয়ানলুকে বলে কি চাও তুমি? উঁচু মাটির পিছলা না বাকলহীন গাছের পিছলা? সে বলে বাকলহীন গাছের পিছলা। সুয়ানলু বাকলহীন গাছের উপর উঠে বসল। ডেবী তার পালিত কুকুরগুলিকে (বাঘ) ডাকল। আয় আয় তোমাদের অবশিষ্ট খাবার শেষ করে যাও। বাঘেরা হুম হুম করে আসতে লাগল। সুয়ানলু সেই সময় প্রস্তুত ছিল ধনুকের তীর দিয়ে এক এক করে সমস্ত বাঘ মেরে ফেলল। সবশেষে সর্দারনি গর্ভবতী বাঘিনী ভয়ংকররূপে আসতেই তাকে মেরে পেট ফাটিয়ে দিল। পেটের বাচ্চাগুলো চারিদিকে জঙ্গলে পালাল। সজারু ও অন্যান্য বন্য প্রাণীরা বাচ্চাগুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলল। তখন ডেবী তার ঘরের ঢেঁকি গর্তের ভেতর লুকিয়েছিল। অনেক কাকুতি মিনতি করে কোনভাবে সে প্রাণ রক্ষা পেল। সুয়ানলু তার ইচ্ছামত তার পাঁচ মামার প্রতিশোধ নিল। মাকে প্রামাণ স্বরূপ দেখানোর জন্য ঐ সর্দারনি বাঘির মাথা কেটে বাড়িতে নিয়ে এল। এসে দেখে তার লক্ষ্মী মা ঘরের ভিতর অপকর্মে লিপ্ত। সুয়ানলু মাকে ডাকে মা, মা দরজা খুলে দাও। আমি মামাদের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে এসেছি। মা দরজা খুলে দাও এভাবে তিনবার ডাকার পরও মা যখন দরজা খুলল না। সুয়ানলু দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বলল, মা তুমি যখন আমার মুখ দেখতে চাও না আমিও আর থাকবনা। এই আমার মামাদের হত্যার প্রতিশোধের চিহ্ন বাঘীনির মাথা, মোরগ ছানা রেখে গেলাম। তোমার যখন মন চায় দেখে নিও। এই কথা বলে সুয়ানলু ঘরের বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল বাবা আমার জন্য সিঁড়ি নামিয়ে দাও। তখন আকাশ থেকে সিঁড়ি নেমে এলো। সুয়ানলু সেই সিঁড়ি বেয়ে আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার মা অনেক কান্না কাটি করেও আর দেখতে পেল না। দেখতে পেল তার পুত্রের শিকার করা বাঘিনীর মাথা ও মোরগ ছানা। মা তখন বাঘের মাথা নাড়াচড়া করতে গিয়ে হঠাৎ দাঁতের সাথে লেগে তার আঙ্গুল কেটে গেল। অনবরত রক্ত ক্ষরণে সুয়ানলুর মা এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

গুর্খাদের রূপকথা ও লোক কাহিনি

গুর্খারা আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ গুরু গোরকনাথের শিষ্য। গুরু গোরকনাথ ছিলেন সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী। তখনকার দিনে আধ্যাত্মিক শক্তির বহুল চর্চা ছিল গুর্খা সমাজে। কথায় কথায় মন্ত্র চালাচালি ছিল নিত্য ব্যাপার। মন্ত্র শক্তির ব্যবহার করে তারা ইচ্ছা

www.pathagar.com

করলে বাঘ, ভাল্লুক হতে পারতো। কিন্তু কেউ কাউকে তাদের স্ব স্ব বিদ্যার বিষয়ে জানাতো না। এমন কি পরিবারের কাউকেই এ বিষয়ে জানাতে পারতো না, কারণ বিষয়টি জানাজানি হলে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি আপনা আপনি চলে যেতো। একদিন এমন এক গুর্খার পরিবারে তার স্ত্রী বায়না ধরলো হরিণের মাংশ খাওয়ার জন্য। অগত্যা স্ত্রীর কথা রাখার জন্য সেই গুর্খা ভাবলো একটি হরিণ মেরে নিয়ে আসবে। সে গোপনে মন্ত্র পড়ে একমুঠ চাউল ও একটি পাত্রে অল্প পানি নিয়ে তার স্ত্রীকে বললো– রাতে বাসার কাছে একটি বাঘ একটি হরিণ মেরে নিয়ে আসবে তখন তুমি সেই বাঘের গায়ে এই চাউল আর এই পানি টুকু ছিটিয়ে দিও, ভয় পেওনা সেই বাঘ তোমার কোন ক্ষতি করবে না। পারবে তো? স্ত্রী বললো– পারবে। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সেই গুর্খা বললো আমি একটু বাইরে থেকে আসছি। সেই মন্ত্র শক্তিধারী গুর্খা বাসার পিছনে গিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করা মাত্র ধীরে ধীরে এক বিশাল বাঘে পরিণত হয়ে গেল। আর একলাফে জঙ্গলে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পর একটি বিশাল হরিণ মেরে মুখে করে তার বাসার কাছে এসে ঘরের দরজায় রেখে বাঘের আওয়াজ করে ডাকতে লাগলো। তার স্ত্রী বাঘের আওয়াজ পেয়ে ভয়ে দরজা বন্ধ করে চুপ করে লুকিয়ে রইল। বাঘের গোঙানির শব্দে তার আধমরা অবস্থা। সে বিশ্বাস করতে পারল না যে তার প্রাণ প্রিয় স্বামী বাঘ হয়ে তাকে আহবান জানাচ্ছে যাতে সে সেই মন্ত্র পড়া চাউল ও পানি তার গায়ে ছুড়ে দেয়।

এ ভাবে সারা রাত বাঘরুপী গুর্খা, বাঘের গোঙানির শব্দে তার স্ত্রী কে ডাকলো কিন্তু হায় তার স্ত্রী ভয়ে তার স্বামীর নির্দেশ কোনভাবেই পালন করতে পারলো না। অবশেষে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বাঘ জঙ্গলে হারিয়ে গেল। সে আর কোন দিন মানুষের রূপ ধারণ করতে পারলো না। তার স্ত্রী তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠলো। ভোরে ঘরের দরজা খুলে দেখলো একটি মরা হরিণ ঘরের সামনে পড়ে আছে। তার আর বুঝতে বাকি রইলো না। তখন সে মাথার চুল ছিড়তে লাগলো আর নিজের কৃতকর্মের জন্য আফসোস করতে লাগলো। সে ভাবলো যদি সে হরিণের মাংশ খাওয়ার জন্য বায়না না ধরতো তাহলে তার স্বামী বাঘ হয়ে হরিণ মারতে বনে যেত না, আর সে যদি তার স্বামীর কথায় বিশ্বাস রেখে ভয় না করে সেই মন্ত্র পড়া চাউল ও পানি বাঘের উপর ছিটিয়ে দিত তা হলে তার স্বামী বাঘ হয়ে বনে হারিয়ে যেতো না। আশে পাশের প্রতিবেশীরা সকলে ঘটনা জানার পর তাকে গালাগালি করতে লাগল। এভাবে অনেক নব তন্ত্র বিদ্যাধারী বিদ্যা পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেরা বা প্রতিপক্ষকে বাঘে পরিণত করে অপরিণত বিদ্যার কারণে পুনরায় স্বরূপে ফিরে আসতে পারে নি। বিশেষ করে নিজের পরিবারের সদস্যদের উপরই তারা এসব বিদ্যা পরীক্ষা করতো জানাজানি না হওয়ার জন্য। কথিত আছে নেপাল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বহু বাঘ শিকারি মৃত বাঘের শরীরে লিঙ্গ ভেদে মানুষ ব্যবহার করে এমন কিছু চিহ্ন পেয়েছিলেন যার দ্বারা এই রূপকথার সত্যতা মেলে।

এই রুপ কথায় স্ত্রীদের অতি উচ্চাভিলাষী না হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে,সাথে সাথে যার যার স্বামীর উপর অগাধ বিশ্বাস রাখার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

খ. কিংবদন্তি

চাকমা কিংবদন্তি

পাগলা রাজার কাহিনি : সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে চাকমাদের একজন রাজার নাম ছিল 'পাগলা রাজা'। শোনা যায় তিনি নাকি যোগসিদ্ধি ছিলেন। তিনি স্নানের সময় যোগবলে দেহের ভিতর থেকে নাড়িভুড়ি বের করে নদীতে ধুয়ে মুছে তারপর ঐগুলি আবার দেহের যথাস্থানে ঢুকিয়ে রাখতে পারতেন। ঐ কাজটি তিনি করতেন খুবই গোপনে। কোন কাকপক্ষীও টের পেতো না।

স্নান করতেন তিনি ঘরের ভিতরে পর্দার আড়ালে থেকে। যথেষ্ট গোপনীয়তা সত্ত্বেও একদিন সবকিছু ফাঁস হয়ে যায় তাঁর একমাত্র রানীর কারণে। পাগলারাজার মূল নাম ছিল রাজা 'সাত্তুয়া বড়ুয়া'। রাজা সাত্তুয়া বড়ুয়ার আগে 'বুরা বড়ুয়া' নামে চাকমা রাজা 'জনু'র একজন সেনাপতি ছিল। এ কারণে অনেকে 'বড়ুয়া' শব্দটিকে সেনাপতি বাচক মনে করেন।

সে যা হোক, আমাদের কাহিনির নায়ক 'পাগালা রাজা' বা পাগলা রাজা। তাঁর নামে আজও শিশুরা ছড়া কাটে–

'মুনি ঋষি ধ্যান গরে'

'পাগালা রাজা চিদকলজ্যা খুয়োই স্যান গরে।'

(অর্থাৎ মুনি ঋষি ধ্যান করেন, পাগলা রাজা চিৎকলিজা খুলে স্নান করেন।)

পাগলা রাজার রাজধানী ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে মাতামুহুরী নদীর তীরে আলিকদমে। আলিকদম শব্দটি মারমাদের 'আলেহ্য খ্যাং ডং' শব্দের বিকৃত উচ্চারণ থেকে এসেছে। মারমা ভাষায় 'আলেহ্যা খ্যাং ডং' শব্দের অর্থ 'পাহাড় ও নদীর মধ্যবর্তী স্থান'।

পাগলা রাজা তাঁর রাজত্বকালে আলিকদমের আশেপাশে অনেক জায়গা আবাদ করিয়েছিলেন। তাই আজও আমরা আলিকদমের অনতিদূরে তাঁর নামে 'পাগালা বিল' নামক স্থানটি দেখতে পাই। চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে তাঁর নামে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে।

পাগলা রাজা কিন্তু প্রথম থেকেই পাগল ছিলেন না। তিনি সখ করেও অন্য কারোর সামনে নিজের নাড়ীভুড়ি বের করেননি। ঐ ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। তাঁর জীবনের সমস্ত অনর্থের মূলে ছিলেন তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ রাণী। রাণী একদিন কৌতূহল বশতঃ পর্দার আড়ালে থেকে রাজার স্নান কার্য দেখছিলেন। এই সময় রাণী দেখেন, রাজা পেটের ভিতর থেকে তাঁর নাড়ীভুড়ি বের করে ধুয়ে মুছে ফেলছেন। রাণী সে দৃশ্য দেখামাত্র ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। রাণীর আর্ত চিৎকার শুনে রাজা তড়িঘড়ি করে তাঁর নাড়ীভুড়ি দেহের যথাস্থানে বসালেন। কিন্তু তাড়াহুড়োর কারণে ঠিকমত বসাতে পারলেন না। ফলে কিছুদিন যেতে না যেতেই রাজার মাথা বিগড়ে যেতে লাগলো। এই হলো রাজার পাগল হওয়া সম্পর্কে চাকমাদের কিংবদন্তি। তবে এ বিষয়ে কিন্তু তঞ্চঙ্গ্যাদের কাহিনিটি ভিন্ন ধরনের। তাদের মতে রাজা যখন নদীতে স্নান করছিলেন তখন তিনি

www.pathagar.com

নিজে চিৎকলিজা (হৃদপিণ্ড ও কলিজা) খুলে নদীর তীরে একটা পাথরের উপর রেখেছিলেন। ঐ সময় ঘটনাচক্রে একটা পাগলা কুকুর এসে ঔগুলি খেয়ে ফেলে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর তরবারি দিয়ে কুকুরটিকে মেরে ফেলেন এবং ঐ কুকুরটির চিৎকলিজা নিজের দেহে স্থাপন করলেন। এতে রাজা বেঁচে গেলেন বটে কিন্তু তিনি পাগল হয়ে গেলেন।

পাগল হয়ে রাজা শুরু করলেন নানারকম অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ। কারণে অকারণে তিনি যাকেই সামনে পান তাকেই হত্যা করতে লাগলেন। যে কারণে তাঁর ভয়ে রাজ্যের লোকজন তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। রাজার অত্যাচারে প্রজারা অস্থির হয়ে উঠলো। তাঁর এই পাগলামি প্রজারা সহ্য করলেও পাত্রমিত্র ও অন্যান্য ক্ষমতাবান সভাসদরা সহ্য করতে চাইলেন না। তাঁরা রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। রাজা সম্ভবত মন্ত্রী ও অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী সভাসদদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছু কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন। এতে তিনি কয়েকজন অমাত্যের বংশশুদ্ধ কেটে ধ্বংস করার চেষ্টা করলেন। তাঁর রোষে পড়ে অনেক বংশ ধ্বংস হয়ে গেল। এমনই একটি বংশের নাম 'লচ্চর গঝা'।

কমল ওয়াংঝার বাবা 'লচ্চর গঝা'র দলপতি ছিলেন। রাজ দরবারে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর বাড়িখানা এত বড় ছিল যে, ভাত খাওয়ার সময় সবাউকে ডাকার জন্য ঘন্টা বাজাতে হতো। এমনই একজন প্রতিপত্তিশালী সুখী অমাত্য কোন কারণে রাজার কুনজরে পড়ে গেলেন।

আর সেটাই হলো সর্বনাশের মূল কারণ। রাজার রোষানলে পড়ে একে একে পরিবারের সব পুরুষই একদিন প্রাণ হারালো। একমাত্র কমল ওয়াংঝা এক বুড়ির চালাকির কারণে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি ঐ সময় খুবই ছোট ছিলেন। ঐ বুড়ি তাঁকে মেয়েদের পরনের কাপড় 'পিনোন' পরিয়ে রাখায় রাজা তাকে কন্যা শিশু ভেবে হত্যা করলেন না। তাই তাঁর রক্ষা। পাগলা রাজা শুধু কমল ওয়াংঝার বাবাকে বংশ শুদ্ধ হত্যা করলেন না, তিনি অন্যান্য প্রভাবশালী অমাত্যদেরকেও হত্যা করতে লাগলেন। এতে অনেকে তাঁর শত্রুতে পরিণত হলো। মন্ত্রীরা অনেকটা নিরুপায় হয়ে এর একটা বিহীত করার জন্য রাণীর কাছে গেলেন, এবং রাণীও তাঁদের সাথে একমত হয়ে রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। কিন্তু রাজাকে হত্যা করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

রাজার কাছে রাণী ছাড়া অন্য কারো যাওয়ার সাহসও ছিল না। তাই সবাই গোপনে পরামর্শক ঠিক করলেন, রাজাকে রাজবাড়ির বাইরে অন্য কোথাও নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে হত্যা করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন প্রথমে রাজার বিশ্বস্ত চাকর, কর্মচারী এবং দেহরক্ষীদের অন্যত্র সরানো। তাঁরা রাজাকে কুপরামর্শ দিয়ে ঐ সকল রাজকর্মচারীদের বিতাড়িত করে তার পরিবর্তে নতুন কর্মচারী নিয়োগ করলেন। এভাবে রাজকার্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে রাজা বিশ্বস্ত লোকজনদের সরিয়ে রাজাকে হত্যা করার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। সুযোগও মিলে গেল। দেবদেবীর প্রতি রাজার ছিল অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তিনি পূজা অর্চনার জন্য প্রায় সময় রাজবাড়ির বাইরে বৌদ্ধ

www.pathagar.com

মন্দিরে যেতেন। এমনই একদিন রাজা যখন পাল্কিতে চড়ে মন্দিরে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ মন্ত্রীরা সুযোগ বুঝে চারিপাশে 'পাগলা হাতি, পাগলা হাতি' বলে চিৎকার দিতে আরম্ভ করলেন। স্বভাবতই রাজা ব্যাপারটা কি দেখার জন্য পাল্কির বাইরে যেই মাথাটা বের করেছেন, অমনি পাল্কির পিছনে লুকানো ঘাতকের তরবারি আঘাতে রাজার শির দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। রাজা নিহত হলেন। এ খবর বিদ্যুৎ বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এ সময় রাণী এবং তাঁর মন্ত্রীরা নিজেদের সমর্থকদের মাধ্যমে রাজ্যময় গুজব ছড়িয়ে দিলেন যে, রাজা মন্দিরে যাওয়ার পথে পাগলা হাতির আক্রমণে নিহত হয়েছেন। এ কথা অনেকে বিশ্বাস করলো আর অনেকে বিশ্বাস করলো না। আসলে রাজবাড়িতে কি ঘটছে আর কি ঘটতে যাচ্ছে তা কারোরই জানার উপায় ছিলো না। কারণ সবকিছুই করা হচ্ছিল অত্যন্ত গোপনে।

এমনকি রাজাকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চিতায় দাহ করার পরিবর্তে মাটি চাপা দেওয়া হলো এবং এই জায়গাটি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কেউই জানলো না।

এরপর অবশ্য সবকিছু নীরবেই চলে যেতো যদি না রাজার মেয়ে রাজাকে স্বপ্নে না দেখতো। রাজার ছিল একটিই মেয়ে এবং সে ছিল বড় আদরের। সে পর পর সাতটি রাত রাজাকে স্বপ্নে দেখলো।

রাজা তাকে স্বপ্নে বলেছেন, অতি শীঘ্রই তাঁর দেহের সাথে কাটা মুণ্ডটি জোড়া লাগবে এবং তিনি বেঁচে উঠবেন। কন্যার মুখে এহেন স্বপ্নের খবর শুনে রাণীর অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে গেল। রাণীর মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং অন্যান্য মন্ত্রীদেরও ভয়ে দেহ ছেড়ে প্রাণ যায় যায় অবস্থা হতে লাগলো। কারণ সবাই জানতো রাজা ছিলেন দীর্ঘদিনের তান্ত্রিক সাধক এবং সে কারণে সবারই বিশ্বাস রাজার পক্ষে বেঁচে উঠা এমন কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়।

তাই রাণীসহ মন্ত্রীরা একদিন সদলবলে ঢাল তলোয়ার নিয়ে রাজার কবরে ছুটলেন। এবার অবশ্য তাঁদের পক্ষে আর আগের মত গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হলো না। কারণ তাঁরা এতই ভয় পেয়েছিলেন যে, রাজার কবরে রাতের বেলায় না গিয়ে অনেক লোকজন ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিনের বেলায় গিয়েছিলেন এবং অনেকটা প্রকাশ্যেই রাজার কবর খোঁড়া হলো।

কবর খোঁড়ার পর সবাই বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো যে, সত্যি সত্যিই রাজার কাটা মুণ্ডটি দেহের সাথে জোড়া নেয় নেয় অবস্থা। এই অবস্থা দেখে রাণী ভয়ে তৎক্ষণাৎ রাজার মরদেহকে খণ্ড খণ্ড করার জন্য তাঁর দেহরক্ষীদের আদেশ দিলেন। রাণীর আদেশে রক্ষীরা রাজার দেহকে সাতটি খণ্ডে খণ্ডিত করে বিভিন্ন পাহাড়ে মাটি চাপা দিয়েছিল এবং কিছু খণ্ড নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

লোকেদের বিশ্বাস এমনই একটি খণ্ড 'পাগলা মুড়া'য় মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল এবং সে কারণেই ঐ পাহাড়টির নাম 'পাগলা মুড়া' নামেই পরিচিত হয়ে উঠে। আজও ঐ ঘটনার সাক্ষী হিসাবে 'পাগলা মুড়া' নামে আলিকদমের অনতিদূরে ঐ পাহাড়টি দাঁড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

গ. লোকছড়া

চাকমা লোকছড়া

১.

কবাজাং কবাজাং
মোনো উগুরে বাহ্ থাং
চাক ন' খাং ঘিলুক খাং
ইক্কুয়া বদালোই ঘরত যাং।
কবাজাং কবাজাং
মামু ঘরত বেরেদ'যাং।
ম'মামি দিব' কুরো কাবি
চিত ঘিলেলোই খাং।

বাংলা অনুবাদ :

কবাজাং কবাজাং
পাহাড়ের উপর রাত কাটাবো।
চাক খাবো না ঘিলু খাবো
একটি ডিম নিয়ে বাড়ি যাবো।

কাবজাং কবাজাং
মামার বাড়ি বেড়াতে যাবো।
মামি দেবে মোরগ কেটে
কলিজা দিয়ে খাবো।

২.

উন্দুরে গত্তন কজ মজ
বিলেই আগে বোই
লক্করে দাগ গোই
বিলেই মারক্কোই।
ঝারর বিলেই ঝারৎ যিয়ে
কুধু পেবগোই।

বাংলা অনুবাদ

ইঁদুর করছে ছুটোছুটি
বিড়াল আছে বসে,
সোনা মনিকে ডাকো গে
বিড়াল মারবে সে।
বনের বিড়াল বনে গেছে
কোথায় পাবে তাকে।

www.pathagar.com

তঞ্চঙ্গ্যা লোকছড়া

জুম ঘরত চাইর কাইত
চলাহ চনাহ ফুলরবাইচ।
ভঙরায় গত্তন গুন গুন গুন
চষতন রেনু ফুলত্তুন।
রু রু রু বাঁশি তারে তালে
খেং খ্রং বা-দন তার তালে
পুনং চানান আকাশ্যত ঘুম নাই আচ্যা
লাঙ্যা আ লাঙনি চুগত।

বাংলা অনুবাদ
জুম ঘরের চারিপাশে
মৌ মৌ করছে ফুলের সুবাসে।
ভ্রমরের দল গুঞ্জন তুলছে
ফুলের রেণু নিচ্ছে চুষে।
রু রু রু বাঁশির সুরে সুরে
খেংগ্রং বাজাচ্ছে একই সুরে।
পূর্ণিমা চাঁদ ঐ গগনে
প্রেমিক প্রেমিকার ঘুম নেই নয়নে

পাংখোয়া লোকছড়া
ভাইতে নি বৌপুই আহ্রেং দন
ছনপেই লৌতে ইনপেই বৌ।
বুচিতে আন ঙোয় জৌতাআ
বুলেমতে আন হিপরাল দল।
হ্লান সাথে আওথম নাসাজিয়া
কৃনিদামতো ইহায় এসতি।

বাংলা অনুবাদ
শুন উৎসব দিন আসছে
যারা প্রস্তুত হওনি প্রস্তুত হও।
খারাপ বীজ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে
খারাপ বীজ ধ্বংস হয়ে যাবে।
যারা রক্ত দিয়ে কিনেছি,
চিৎকার করো
ত্রাণকর্তা ভুলে যাবেনা।

www.pathagar.com

বম লোকছড়া

সু লৌ কার তলুং দাহ্ লৌ
পা লৌ কার তলুং দাহ্ লৌ
থলাংরিপাতে ইন মোয়ান আ
রেয়াজা খালা
মেল দুম খালা
বাবু ডীন, বাবু ডীন

বাংলা অনুবাদ
জুম থেকে মা ফিরে নাই
জুম থেকে বাবা ফিরে নাই
তলারিপার বাড়ির পাহাড়ে
রোয়াজা খালা
মেলদুম খালা
বাবু বিশ্রাম করে
বাবু বিশ্রাম করে।

খিয়াং লোকছড়া
১.
বেলেক চ্ও খ্রহেমও
লুংখিং লুংখিয়াং নেমেহৈ ন্ তি- এই
তেকতেলেন লা থিং পোক স্ চে
কেইবে লেক চ্লা হেউ সুই সতিং কিখিন নু
সুগু সেই অং ফোউ বে-ই
লংবয়হ্ খ্রাওং চং হো বে-ই
সকি খো ওং চং চেল বে-ই।
সকি খো ওং চং চেল বে-ই।
অঙ তেউয়া বেন লু-আক হূইহ
উই থেই তেউয়া য়োং পুমাক হ্ইহ্
সুসিম তেউয়া লানসু তেউয়া
লুখিং লুখিয়াং নেএে ন্ তি- এই।

বাংলা অনুবাদ
জোছনার আলোর মতো ভাই আমার
একা একা তুমি রয়েছো,
কাঠঠোকরা গাছ ঠোকরানোর শব্দে মনে হচ্ছে

www.pathagar.com

তুমি বনে লাকড়ি সংগ্রহ করছ।
আমলকির পাতায় ধানগুলি শুকাতে দিও
এক প্রকার বড় পাখির পালকে ধানগুলি ঝেড়ে নিও
আর হরিণের মতো পায়ে ধানঘুলি নেড়ে যেও।
কাকের ঝাঁকের মাঝে একটি বকের মতো
শিকারি কুকুরের মাঝে একটি বানরের মতো
নির্জন পাহাড়ের শত্রুর মতো
একা একা রয়েছ তুমি।

খিয়াং লোকছড়া

২.
ঙুলুই ও ঙুলুউ ও
ইয়া নে বেং সেন স-ওম
সেনাইহ্ খিয়াং ঙালা কেসেন স্ হিয়াহ্
লুং পেক পে চলা একেপ নকা
লুং পেক পে চ-ও লুং পেক পে চ-ও
ইয়া নেকেপ নক সওম
কেপ ন- আইহ খিয়াং ঙালা কেকেপ্ নক স্ হিয়াহ্
থিং বাক্ ও থিং বাক্ ও
ইয়া ন খ্রক নক সওম
খ্র ন- আই খিয়াং ঙালা ক- খ্রক নক স্ হিয়াহ্
য়োং লা ইহ্নিনা
য়োং ও য়োং ও
ইয়া নি- হ্নিন সওম
হ্নিনাইহ্ খিয়াং ঙালা কিহ্নিন স্ হিয়াহ্
উই লা অনকা
উই ও উই ও
ইয়া ন- নক সওম
নকাইহ খিয়াং ঙালা কনক স হিয়াহ্
মহ্ নুলা মহ্ পলা সুহ্ খ্রং তে : কা দ :
মহ নুলা মহ প : ও
ইয়া সুহ্ নেতেক সওম
তে : কাই্ খিয়াং ঙালা কেতেক স হিয়াহ্
লোউআ হিল থেইহ্ পানচি থেইহ্ খোল
তেউ পেচে লা ইনি এ য়া দ।

www.pathagar.com

বাংলা অনুবাদ

ও টাকি ও টাকি
কেন গাল লাল?
আমার ইচ্ছেতে হয়নি লাল
দিয়েছে পাথরে চেপে।
কেন দিলে চেপে?
আমার ইচ্ছেতে হয়নি চাপা
গাছের ডাল পড়ে।
ও ডাল ও ডাল
কনে পড়লে গায়ে?
আমার ইচ্ছেতে পড়িনি আমি
বানর দিল নেড়ে।
ও বানর ও বানর
কেন গাছের ডাল নাড়লে?
আমার ইচ্ছেতে নাড়িনি ডাল,
কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে।
ও কুকুর ও কুকুর
কেন ঘেউ ঘেউ করলে?
আমার ইচ্ছেতে করিনি ঘেউ ঘেউ
গৃহ-কর্তা-কর্ত্রী ঝুঁকিয়ে দিল বলে আমায়।
ও গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী
কেন ঝুঁকিয়ে দিলে?
আমাদের ইচ্ছেতে দিইনি
জুমের ফল ফসলাদি
খেয়ে নষ্ট করেছে বন্যপ্রাণী তাই।

খিয়াং লোকছড়া

৩.

ঙুলুই ও ঙুলুউ ও
ইয়া নে বেং সেন স-ওম
সেনাইহ্ খিয়াং ঙালা কেসেন স হিয়াহ্
লুং পেক পে চলা একেপ নকা
লুং পেক পে চ-ও লুং পেক পে চ-ও
ইয়া নেকেপ নক সওম
কেপ ন-আইহ্ খিয়াং ঙালা কেকেপ নক স্ হিয়াহ্
থিং বাক্ ও থিং বাক ও
ইয়া ন-থ্রক নক সওম

www.pathagar.com

খ্র ন-আই খিয়াং ঙালঅ ক-খ্রক নক স্ হিয়াহ।
য়োং লা ইহ্লিনা
য়োং ও য়োং ও
ইয়া নি-হ্লিন সওম
হিনাইহ্ খিয়াং ঙালা কিহ্লিন স্ হিয়াহ্
উ লা অনকা
উই ও উই ও
ইয়া ন-নক সওম
নকাইহ্ খিয়াং ঙালা কনক স্ হিয়াহ্
মহ্ নুলা মহ্ পলা সুহ্ খ্রং তে : কা দ :
মহ্ নুলা মহ্ প :ও
ইয়া সুহ্ নেতেক সওম
তে :কাই খিয়াং ঙালা কেতেক স হিয়াহ্
লোউআ হিল তেইহ্ পানচি থেইহ্ খোল
তেউ পেচে লা ইনি এ য়া দ :

বাংলা অনুবাদ
ওটা কি ওটা কি
কেন গাল লাল?
আমার ইচ্ছাতেই হয়নি লাল
দিয়েছে পাথরে চেপে।
ও পাথর ও পাথর
কেন দিলে চেপে?
আমার ইচ্ছাতে হয়নি চাপা
গাছের ডাল পড়ে।
ও ডাল ও ডাল
কেন পড়ল গায়ে?
আমার ইচ্ছাতে পড়িনি আমি
বানর দিল নেড়ে।
ও বানর ও বানর
কেন গাছের ডাল নাড়লে?
আমার ইচ্ছাতে নাড়িনি ডাল,
কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে
ও কুকুর ও কুকুর
কেন ঘেউ ঘেউ করলে
আমার ইচ্ছেতে করিনি ঘেউ ঘেউ,
গৃহ-কর্তাকর্ত্রী ঝুকিয়ে দিল বলে আমায়।

www.pathagar.com

ও গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী
কেন ঝুকিয়ে দিলে?
আমাদের ইচ্ছাতে ঝুকিয়ে দিইনি
জুমের ফল ফসলাদি
খেয়ে নষ্ট করেছে বন্য প্রাণী তাই।

তথ্যসহায়ক

১. উপজাতীয় রূপকথা ও লোককাহিনি এবং কিংবদন্তি (প্রথম খণ্ড), উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৭৯
২. উপজাতীয় রূপকথা ও লোককাহিনি এবং কিংবদন্তি (দ্বিতীয় খণ্ড), উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৪
৩. তঞ্চঙ্গ্যা রূপকথা লোককাহিনি ও কিংবদন্তি, লেখক-বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, ২০০৫, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ২০০৫
৪. ত্রিপুরা রূপকথা, মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, প্রকাশকাল, ১৯৯৯
৫. চাকমা রূপকাহিনি, বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৯
৬. মি. এঃ হ্লা মং মার্মা, উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মী
৭. মি. লাল ছোয়াক লিয়ানা পাংখোয়া, প্রকল্প সমন্বয়কারী, গ্রীণ হিল, রাঙ্গামাটি
৮. মি. মনোজ বাহাদুর গুর্খা, বিশিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী, রাঙ্গামাটি
৯. লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, প্রাক্তন শিক্ষক, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি
১০. চিত্র মোহন চাকমা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বনযোগীছড়া, রাঙ্গামাটি
১১. মি. তিমথি খিয়াং, সিডি প্রকল্প, সিএইচটিডিএফ, ইউএনডিপি, রাঙ্গামাটি
১২. মিলিং (পাহাড়ের ছড়া ও লোককথা), প্রকাশক, টংগ্যা, রাজবাড়ি, রাঙ্গামাটি
১৩. লাল ছোয়াহ লিয়ানা পাংখোয়া, প্রকল্প সমন্বয়কারী, গ্রীণ হিল, রাঙ্গামাটি
১৪. অনুপম খিয়াং, উন্নয়ন ও সংস্কৃতিকর্মী, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি
১৫. শাক্য মিত্র তঞ্চঙ্গ্যা, প্রকল্প সমন্বয়কারী, স্যানিটেশন প্রকল্প, স্পেইস, রাঙ্গামাটি

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

১. ওগোয় : ওগোয় সাধারণত গাছের গোড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। তামাক পাতা চূর্ণ করা এবং এক ধরনের গুড়ের সাথে মিশ্রণ তৈরি করার কাজে চাকমা ও অন্যান্য আদিবাসীরা ওগোয় ব্যবহার করে। তামাক পাতা ও গুড়ের সাথে মিশ্রণ হলে তাকে চাকমা ভাষায় বলা হয় **'ধুন্দ'**।

ওগোয়

২. আরি : আরি এক ধরনের বেঁতের তৈরি ধান পরিমাপ করার ঝুড়ি। আরি বেঁত দিয়ে খুব মজবুতভাবে তৈরি করা হয়। আদিবাসীদের জন্য আরি একটি মূল্যবান জিনিষও বটে। জুমে ফলানো ধানের পরিমাণ আরি দিয়ে মেপে অনুমান করা হয়। ধান চাল বিনিময় করতেও আরি দিয়ে পরিমাপ করা হয়।

আরি

www.pathagar.com

৩. **মেজাঙ :** মেজাঙ একটি সছিদ্র ঝুড়ি বিশেষ। চাকমাদের একটি অত্যাবশ্যকীয় গৃহাস্থলি সামগ্রী। এটি বাঁশ ও বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত হাঁস মুরগীর ছোট ছোট বাচ্চাকে খাদ্য খাওয়ার সময় বড় হাঁস মুরগীর কাছ থেকে রক্ষা করার কাজে, কাক চিল হতে হাঁস মুরগীকে রক্ষার কাজে এবং হাঁস মুরগীকে সহজে ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়। অনেকে আবার ভাত খাওয়ার জন্য ছোটখাট টেবিল হিসেবে ব্যবহার করে।

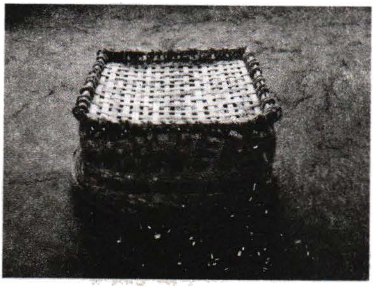

মেজাঙ

৪. **পাক্কোন :** এটিও চাকমাদের একটি অত্যাবশ্যকীয় গৃহাস্থলি সামগ্রী। এটিও বাঁশ ও বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি করা হয়। এটি ঘরের ময়লা ফেলার কাজে, গোবর দিয়ে ঘর লেপার কাজে এবং মদ জাতীয় মাদক দ্রব্যাদি তৈরির কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

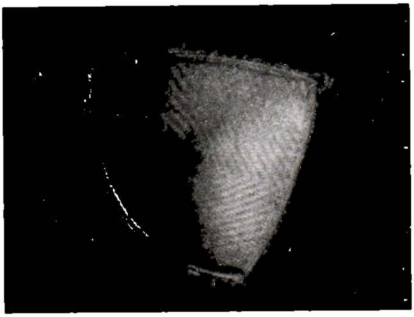

পাক্কোন

৫. **হাল্লোং :** হাল্লোং চাকমাদের একটি গৃহাস্থলি সামগ্রী। বাড়ির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। আকারে একটু বড়। বনের এক ধরনের গাছের বাকল দিয়ে তৈরি দড়ি হাল্লোং এ বেঁধে আদিবাসী মেয়েরা মাথায় নিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র বহন করে। হাল্লোং মাথায় নিয়ে জুমের ধান কাটে, জুমের বিভিন্ন ফল ফলাদি হাল্লোং এ ভরে জুমের ঘরে ফিরে। আরও নানা কাজে হাল্লোং ব্যবহার করা হয়। যে গাছের বাকল দিয়ে দড়ি তৈরি করা হয় সে গাছের নাম উদোল গাছ। যখন দড়ি তৈরি হয়ে হাল্লোং এ লাগানো হয় তখন তাকে লাবাক বলা হয়।

www.pathagar.com

৬. বারেঙ : বারেঙ দেখতে হাল্লোং এর মতো হলেও এর আকার হাল্লোং এর চাইতে অনেক বড়। মাথায় হাল্লোং রেখে জুমে ধান কেটে বারেঙ এ জমা করে রাখা হয়। বারেঙটি ধানে ভরে গেলে জুমের ঘরে আনা হয়। বারেঙ দিয়ে শুধু জুম থেকে ধান আনা হয় না, বিভিন্ন দূরের জায়গায়ও ধান বহন করা হয়। একটি ফুল বারেঙ এর চিত্র নিম্নে দেয়া হলো।

ফুল বারেঙ

৭. হুরুম : হুরুম আকারে একটু ছোট। চাকমারা জুমে ধান বপণের সময় হুরুম ব্যবহার করে। হুরুম কোমরে বেঁধে হুরুমে ধানের বীজ রাখা হয়। জুমে ধানের বীজ বপনের সময় চওড়া এক ধরনের দা ব্যবহার করা হয়। চাকমা ভাষায় এই দা'কে বলা হয় চুচ্ছেং তাগল। এই হুরুম নিয়ে একটি ছড়া প্রচলিত আছে–

"নিগুড়ি নিগুড়ি হুজি ধান
হুরুম পুনত বানি
তক তক তক বাজে
চুচ্ছেং তাগলানি"।

হুরুম

www.pathagar.com

৮. হক্কেরেং : হক্কেরেং দেখতে হাল্লোং এর মতই কিন্তু হক্কেরেং এর মুখটি একটু আকারে বড়। হক্কেরেং সাধারণত জুমে ফলানো তিল (চাকমা ভাষায় তিলকে বলা হয় ঘচ্ছে) গাছ থেকে তিল সংগ্রহ করার জন্য কাজে লাগে। জুমে ফলানো তিল গাছ কাটার পর কাটা গাছের গোড়ার সাথে বেঁধে কিছুদিন প্রখর রোদে শুকানো হয়। তিল শুকিয়ে এলে জুম থেকে কাটা তিল গাছ এক জায়গায় জড়ো করা হয়। তারপর হক্কেরেং এর মধ্যে তিল গাছ থেকে তিল সংগ্রহ করা হয়।

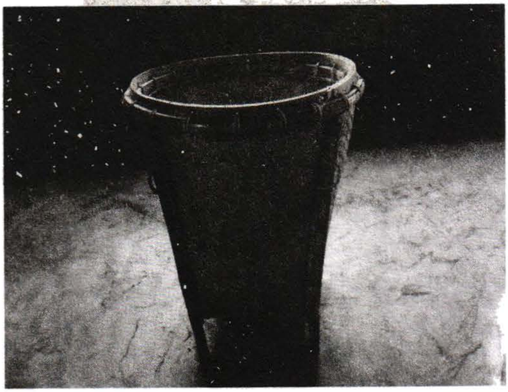

হক্কেরেং

কারুশিল্পী পরিচিতি

বিলেত্যা চাকমা, পিতা- রাঙামুয়া চাকমা, বয়স- ৭৫ বৎসর, গ্রাম- চিমুচ্যাছড়া, উপজেলা- রাঙামাটি সদর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাঁশ বেতের শিল্পের সাথে যুক্ত আছেন। তিনি বাঁশ বেতের শিল্পের একজন দক্ষ ও নিপুণ কারিগর।

কারুশিল্পী বিলেত্যা চাকমা

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

চাকমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ

পিনন : মহিলাদের পরিদেয় বস্ত্র। এটি লম্বায় তিন হাত প্রস্থে দুই হাত বিশিষ্ট হয়। গাঢ় নীল বর্ণ, উপরদিকে এবং নিচের দিকে প্রায় চার আঙ্গুল বিস্তৃত লোহিত বর্ণের দুইটি সুদীর্ঘ ডোরা থাকে। এটি প্রধানত মোটা সুতাতেই তৈরি হয়।

খাদি : মহিলাদের বক্ষ বন্ধনী বস্ত্র। দৈর্ঘ্যে আড়াই কী তিন হাত। প্রস্থে এক ফুটের বেশি নয়। খাদি দুই প্রকারের হয়। 'রাঙা খাদি' ও 'ফুল খাদি'। 'রাঙা খাদি' তে লাল সুতার কাজই বেশি, 'ফুল খাদি' তে ফুল রচনাতেই বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়।

খবং : পাগড়ি। এটি সাদা সুতার তৈরি হয়। তবে মহিলাদের বেলায় খবং এর প্রান্তে লোহিত বর্ণ রঞ্জিত সুতার ফুল তোলা থাকে। দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন হাতেরও অধিক হয়। প্রস্থে কোনভাবে এক হাত পর্যন্ত হয়।

কর্জ্জাল : ব্যাগ বা থলি বিশেষ। এটি কাঁধে ঝুলিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

পানের খল্যা : এটিও থলি বিশেষ। পান, সুপারী রাখবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

গামজা কানি : এটি গা মুছবার জন্য তৈরি হলেও অনেকে পরিধানও করে। এটি নানা বর্ণের হয়ে থাকে, এটি সাধারণত দৈর্ঘ্যে তিন কী সাড়ে তিন হাত প্রস্থে এক কি দেড় হাত হয়ে থাকে। কোন গামজা কানিতে ফুলও তোলা হয়।

তৈইলা : ইংরেজি Towel শব্দের অপভ্রংশ। এটি সাধারণত মোটা সুতার কাপড়ে তৈরি হয়। টাওয়েলের মত ব্যবহৃত হয়।

আলাম : ইংরেজি Chart শব্দের অনুরূপ। এটিতে হরেক রকমের ফুল, লতাদি, পশু-পক্ষী, মাছ, ফল-মূল বিভিন্ন প্রাণীর হাত- পায়ের ছাপ ইত্যাদির নমুনা রক্ষিত হয়। কাপড় বয়নকালে এটিকে আদর্শরূপে ব্যবহৃত হয়। মেয়েদের পরিধানের জন্য পিনন, হাদি, চাদর বোনার সময় এখান থেকে অনুকরণ করে নকশা হিসাবে ফুটিয়ে তোলা হয়।

বর্গি : এটি শীত নিবারণের জন্য পাতলা কম্বল বিশেষ। সাধারণত সাদা বর্ণের, দুই দীর্ঘধারে লোহিত বর্ণের পাইর থাকে। দৈর্ঘ্যে ১০ হাত এবং প্রস্থে দুই হাতের দুই খানি কাপড় তৈরি করে পরে দুটিকে জোড়া দিয়ে চার হাত পরিমাণ বিস্তৃত করে এটি তৈরি করা হয়।

ছিলুম : পুরুষদের পরিধান করবার কোর্তা বা শার্ট বিশেষ।

www.pathagar.com

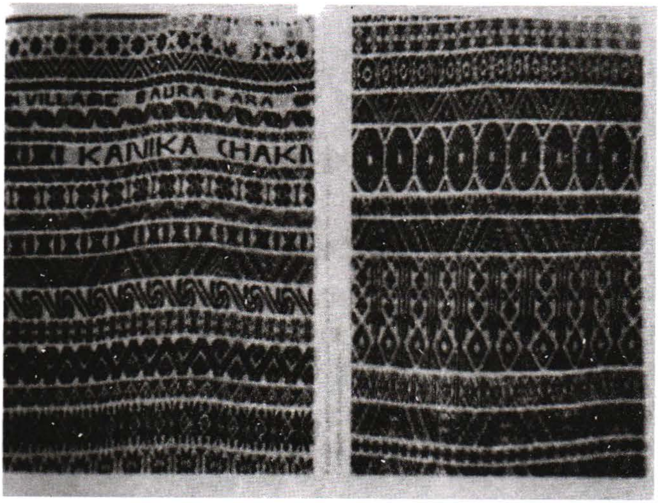

আলাম

তঞ্চঙ্গ্যাদের পোশাক-পরিচ্ছদ

তঞ্চঙ্গ্যা : তঞ্চঙ্গ্যা গসা (গোষ্ঠী) ভিত্তিক যে যে পোশাক পরিধান করে তা নিম্নে ছক আকারে প্রদর্শন করা হলো :

ক্রমঃ	গসা (গোষ্ঠী)	পোশাক
১.	কারওয়া গসা	পিনুইন, খাদি, ফারর দুরি (কোমর বন্ধনী, মাথার খবং, সাদা কোবেই, সলুম এবং রৌপ্য অলঙ্কারাদি
২.	মুঅ গসা	পিনুইন, খাদি, (ফুল খাদি), কালা কোবেই সালুম, ব্লাউজ এবং অলঙ্কারাদি
৩.	ধৈংনা গসা	পিনুইন, খাদি, ব্লাউজ, খবং, ফারার দুরি এবং অলঙ্কারাদি
৪.	মংগলা গসা	পিনুইন, খাদি, ব্লাউজ, এবং অলঙ্কারাদি
৫.	মেরং গসা	পিনুইন, খাদি, ব্লাউজ, কালা কোবেই সালুম, খবং এবং অলঙ্কারাদি
৬.	লাং গসা	পিনুইন, খাদি, ব্লাউজ, খবং এবং অলঙ্কারাদি
৭.	অঙা গসা	পিনুইন, খাদি, ব্লাউজ, খবং এবং অলঙ্কারাদি

পাংখোয়াদের পোশাক-পরিচ্ছদ

পুরুষ

১. কোমরের নিচে পড়নের জন্য 'রেনতে রেং' বা এক পাট কাপড় যা লম্বায় ৩-৪ ফুট ও এবং প্রস্থে আধা ফুট চওড়া হয়।

২. বিশেষ দিনে পড়নের জন্য "চং নাক পোয়ান" বা জমকালো পোশাক যাতে অনেক কারু কাজ করা থাকে।

৩. "ভৌ-লেপ্ "বা সাদা কাপড়।

www.pathagar.com

মহিলা

পাংখোয়া মেয়েরা কোমরের নিচে পরার জন্য নিজেদের হাতের তৈরি এক ধরনের স্কার্ট পাংখোয়া ভাষায় যাকে 'কেংজেল ভেল' বা এক পাট কাপড় বলে এবং দেহের ঊর্ধ্বাংশে পরার জন্য 'কর্ড' বা টপ ব্লাউজ ব্যাবহার করে। বিশেষ দিনে সাজের জন্য সাদা কাপড় বা 'পোয়ান ঙৌ' পরে থাকে। পাংখোয়া মেয়েরা হাতের কাজে খুবই পারদর্শী। ব্যাবহারের সমস্ব কাপড়ই তারা নিজেরা তৈরি করে এবং কাপড় গুলোতে চমৎকার ও আশ্চর্য্য সব ফুলের নকশা বুনতে পারে।

পাংখোয়া নারীদের পোশাক (নু নাউ নি পোয়ান) :

পাংখোয়া	বাংলা
কেং জেল ফেল	স্কার্ট (এক পার্ট নিজস্ব তৈরি) দৈর্ঘ্য-৫' প্রস্থ -৩'
করড ভম্	কালো শার্ট/টপস্
পোয়ান ঙৌ বা পোয়ান সেন	সাদা/লাল কাপড়
চং নাক পোয়ান	বিশেষ নকশা করা কাপড় সামাজিক/বড় ধরনের অনুষ্ঠানে পরিধান করে।

পাংখোয়া পুরুষদের পোশাক (মি পা নি পোয়ান) :

পাংখোয়া	বাংলা
রেন তে রেং	নেংটি (এক পার্ট কাপড় যা দীর্ঘ-৭-৮' প্রস্থ-৬')
পোয়ান পুই	'কোমর তাতের কাপড়' নানান রং ও জুমের তুলা দিয়ে নিজস্ব তৈরি
কর ড (জৌ কর ড)	ফুল হাতা জামা জুমের তুলা দিয়ে নিজস্ব তৈরি
ঙৌ লেপ পোয়ান	স্রেফ সাদা কাপড় বিশেষ অনুষ্ঠান বা সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য।
বিয়ার	পাগড়ি (কাজ করার সময়ের জন্য)

খিয়াংদের পোশাক-পরিচ্ছদ

খিয়াংদের নিজস্ব পোশাক ও পরিচ্ছদ রয়েছে। পুরুষেরা নেংটি এবং নিজেদের হাতে সেলাই করা এক ধরনের জামা পরে। হাটবাজরে যাওয়ার সময় পুরুষেরা কোমর তাঁতে বোনা সাদা জামা এবং ধূতি পরিধান করে। এছাড়া তারা মাথায় পাগড়িও পরে। খিয়াং রমণীদের নিজস্ব পোশাক রয়েছে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখতে অনকেটা রাখাইন নারীদের পোশাকের মতো। তবে তা ভিন্ন। তাদের ব্যবহৃত নিজেদের থামিকে তারা 'পাওন' বলে এবং বক্ষবন্ধনীকে 'লাংগাত' বলে।

খিয়াংদের অলংকার : খিয়াং রমণীরা বিভিন্ন ধরনের অলংকার পরিধান করে। তারা যেসব অলংকার ব্যবহার করে তার নবগুলোই রূপার তৈরি। নিচে খিয়াং রমণীদে ব্যবহৃত অলংকারের নাম দেয়া হল।

খেলখারু (খাড়ু), ২. হাঁসুলি (গলার অলংকার), ৩. তায়্যম (রুপার টাকার মালা), ৪. থেকেল (হাতের প্যাঁচানো চুড়ি), ৫. হ্বেথেং (কানের দুল), ৬ লুতুম সুন (চুলের কাটা), ৭. কালসি যাক (দু হাতের বাহুতে পরে), ৮. হেনবে জে-ই (এক প্রকার রূপার চেইন), ৯, ফেমফেলেপ (খোপার ব্যবহৃত প্রজাতির আকৃতির অলংকার) প্রভৃতি।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধরনের অলংকার

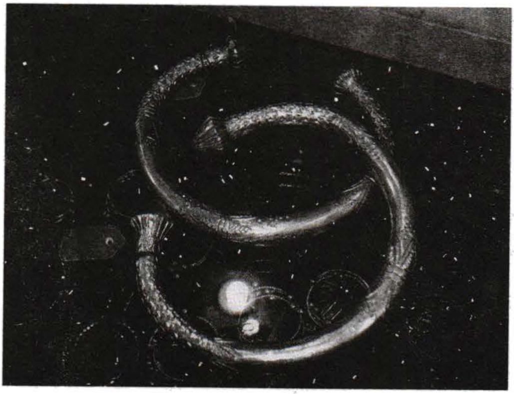

থেঙৎ হারু বা পায়ের চুড়ি

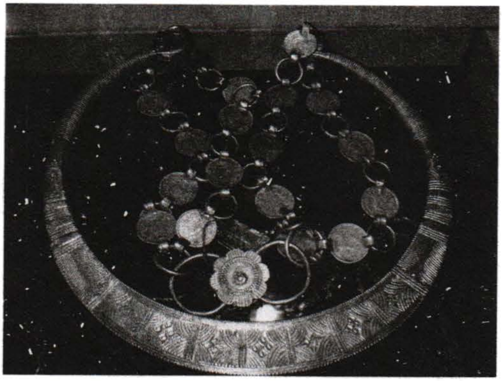

আহ্‌জুলি

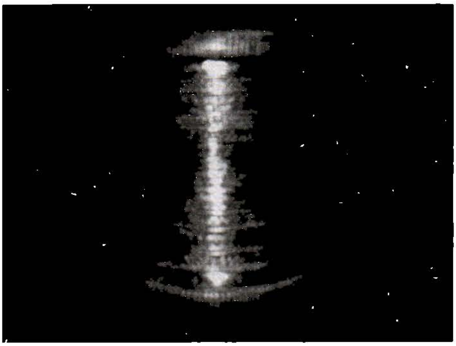

তাজ্জুর (ব্রেসলেট)

www.pathagar.com

বাঙুরি (বালা)

চন্দ্রহার (গলার হার)

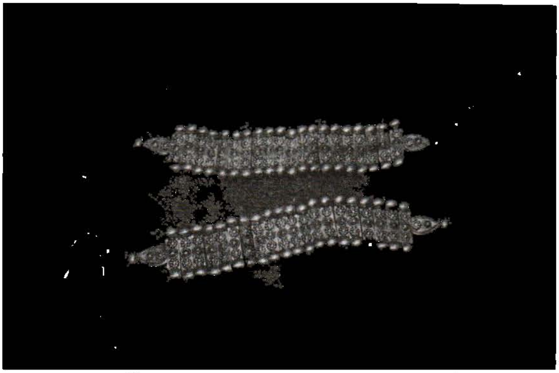

চাকমা রমণীদের বাহুতে পড়ার বাজুবন্দ (ব্রেসলেট)

www.pathagar.com

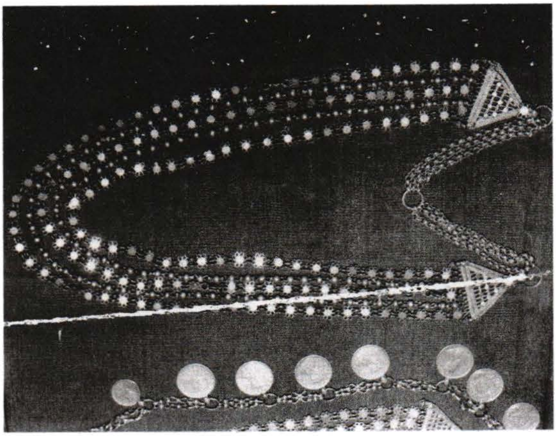

হালছরা (চাকমা রমণীদের গলার চন্দ্র হার)

মারমা রমণীদের গলার নেকলেস

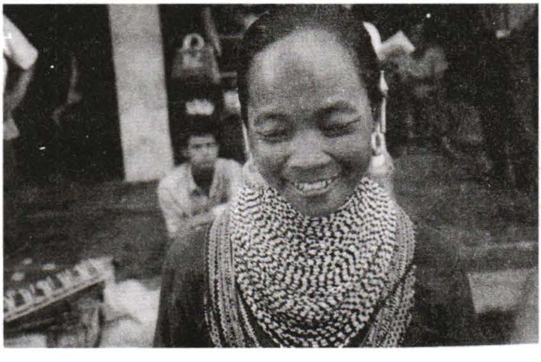

পিজিছরা (পুঁতির মালা)

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

স্থপতি রবিউল হোসাইন তাঁর 'বাংলাদেশের লোকজ স্থাপত্য ও গৃহনির্মাণ' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন যে, "আমাদের দেশের লোকজ স্থাপত্য মূলত গ্রামের ঘরবাড়িতেই পরিদৃষ্ট যার ভিতর দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের রুচি, ব্যবহারিক চাহিদা সব কিছুর প্রকাশ পায়। প্রকৃতির অফুরন্ত রূপ, অবারিত ভূপ্রকৃতি, বৃক্ষ, জল, মাটি, এসব মৌলিক নির্মাণ উপকরণ গ্রামীণ স্থাপত্যে সাধারণত মূল গঠন সামগ্রিকরূপে দেখা যায়। তার সাথে আবহাওয়া, বৃষ্টি পড়ার কৌণিক পরিমাণ, সূর্যরশ্মি আলো ছায়ার রূপ ও পতনশীল অনুযায়ী আবাসগৃহের নকশা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবহারকারীর চাহিদা ও সুখ যাতে সে কোনোরূপ অসুবিধার সম্মুখীন না হয়" (রবিউল হুসাইন, 'বাংলাদেশের লোকজ স্থাপত্য ও গৃহনির্মাণ', বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, সম্পাদক শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৬৭।

মাটির ঘর

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকস্থাপত্যের অন্যতম আবাসস্থল মাটির ঘর প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

রাঙ্গামাটি অঞ্চলেও এর ব্যতিক্রম নয়। ঘর তৈরিতে সহজলভ্য উপাদান হচ্ছে : পাহাড়ি মাটি। বিশেষ করে ঘরের দেওয়াল তৈরি হয়ে থাকে মাটির সাহায্যে। আর ছাউনি হয়ে থাকে টিনের। মাটির ঘর গরমের সময় ঠাণ্ডা এবং শীতের সময় কিছুটা গরম থাকে। ঘর তৈরিতে প্রতিটি পাহাড়ি পরিবারে সদস্যই অভিজ্ঞ। নিজেরাই মাটির ঘর তৈরি করে থাকেন। কখনো কখনো কামলার প্রয়োজন হয়। একটি মাটির ঘর দীর্ঘদিন টিকে।

মাটির ঘর

www.pathagar.com

মাটির গুদাম ঘর

একটা সময় ছিলো মৃত্তিকা নির্মিত গুদাম ঘর ছিলো পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ঐতিহ্যের প্রতীক। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে অপক্ষোকৃত অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ যেমন হেডম্যান, কারবারী, বাগানদাররা পরিবারের সদস্য সংখ্যার অনুপাতে ছোট, মাঝারি এবং বিশাল আকৃতির গুদাম ঘর নির্মাণ করতেন।

গ্রামাঞ্চলে এখনো কোথাও কোথাও দোতলা গুদাম ঘরের অস্তিত্বও দেখা যায়। দুই-তিন দশক আগেও শহরাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গুদাম ঘর দেখা যেতো। কিন্তু এখন আর তেমনটা দেখা যায় না।

এই গুদাম ঘর তৈরির জন্য প্রত্যেক গ্রামেই সাধারণত নির্মাণ শ্রমিক থাকে। এখনো আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যেকটি গ্রামেই এসব নির্মাণ শ্রমিকের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। কারো কারো কাছে এটা জীবিকার প্রধান উপজীব্য না হলেও কয়েক পুরুষ ধরে এই নির্মাণ শিল্পে জড়িত এমন পরিবারের অস্তিত্বও এখনো গ্রামাঞ্চলে আছে।

মাটির তৈরি গুদাম ঘরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও ভিতরে ঠাণ্ডা থাকে। ঝড়, বৃষ্টি আর তুফানের সময়ও এই ঘর সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

নির্মীয়মান গুদাম ঘর (মাটির)

www.pathagar.com

মজাঘর বা মাচাংঘর

মানুষের প্রথম প্রয়োজন বাসগৃহ। চাকমারা থাকে মাজাঘর বা মাচাং ঘরে। জঙ্গল থেকে সহজলভ্য বাঁশ, গাছ ও ছন দিয়ে খুঁটির মাথায় তৈরি হয় এই বাসগৃহ। পাহাড়ের ঢালে বা সমতল স্থানে সহজেই ঘর নির্মাণ করা যায়। জমি সমতল করার দরকার হয় না। গভীর অরণ্যে বন্য জীবজন্তুরা এই উঁচু ঘরে হামলা করতে পারে না।

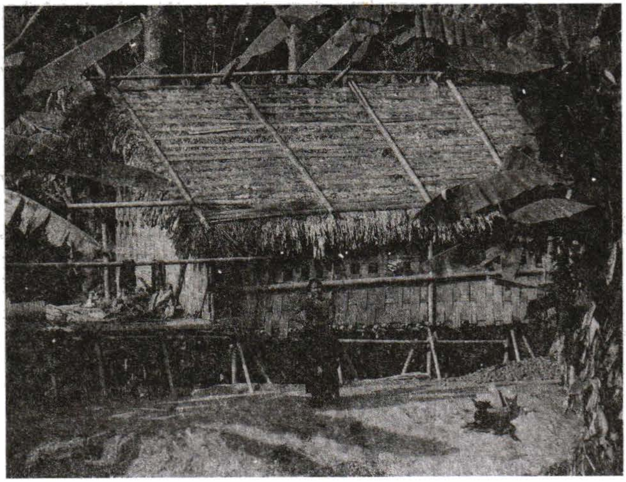

চাকমাদের মাজাঘর বা মাচাংঘর

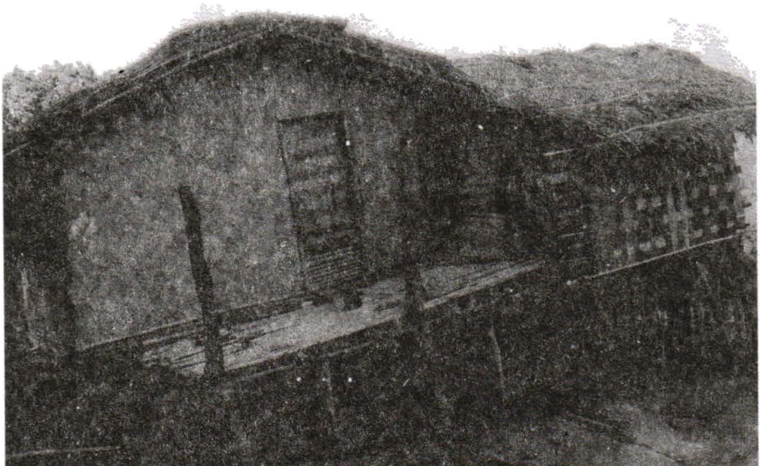

পাংখোয়াদের মাচাং ঘর

www.pathagar.com

তঞ্চঙ্গ্যাদের মাচাং ঘর

মারমাদের মাচাং ঘর

www.pathagar.com

লোকসংগীত ও গাথা

চাকমা বারমাসি

চান্দবী বারমাস
রচনা : ধর্মধন চাকমা

সুলুক
নমং কৃঞ্চনং গুপি সবে বল্লভং।
কারণং। কমলানং। পতি ভক্ত বাঞ্ছা পুনঃপুন॥
ত্রি-ই অংশে জরমে নং। কান্দেত্তং। পায়েনং।
(জিলবাত্তেং। পাবি সর্ব শাস্ত্র)। মা স্বরস্বতি।

পয়ার
নম নম বন্দম মুই প্রভু নারায়ণ।
যাআর কারণে সৃষ্টি এই তিন ভুবন॥
স্বর্গ মর্ত পাতাল জান এই তিন পুরি।
তাআরে বন্দম মুই নমস্কার করি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মাহেশ্বর এই তিন জন।
তাহরে বন্দম মুই ধরিয়া চরণ॥
আদ্য শক্তি মহামায়া বন্দি এগামনে॥
যদেক্ক দেবতা বন্দম ধরিয়া চারণে॥
গংগার চরণে বন্দম শিবের ঘরনি।
সহস্র প্রণাম করম লুটায়া ধরণি॥
সত্য লাগি প্রিতিম্বিতে থাগে চারি যুগ।
সংসার নরক্ক উন্দে উদারিত্তে লুক॥
তাহারি উদ্দেশে মুর' সহস্র প্রণাম।
যাহারি কৃপায় পায়ে মূর্খ লুক দাম॥
বন্দম যে স্বরস্বতি জগত্ত জননি।
অবিরদে কন্দে বসি যগাইব্যা আপনি॥
বৈস মাতা স্বরস্বতি কন্ধের উপর।
বারমাসে যগাই দিব্যা অক্ষরে অক্ষরে॥
শ্রীরাম লক্ষণ বন্দম ভমিত গরেহ্ পড়ি।
আর পত্তনি বন্দম মুই সিতা থাগুরানি॥

www.pathagar.com

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বন্দি এগামনে।
সাত বার বন্দিলাম সবার চরণে॥
চন্দ্র সূর্য বন্দম মুই করি নমস্কার।
দিবারাত্রি ভেদ জান যাহার অধিকার॥
সুরাসুর বন্দম মুই ভক্তি করি মন।
বাররাশি নবগ্রহ করিলুম সাধন॥
তির্থ সব বন্দম মুই গয়া বারাণসি।
অগিনি কুণ্ড বন্দম মুই আর বন্দম কাশি॥
কদেক্ক বন্দিতে পারি তির্থ যে আছয়।
লেগিত্তে বিস্তর হয় পুস্তগেত্তে কয়॥
অশ্বত্থ বৃক্ষ বন্দম মুই আর তালগাছ।
জলমধ্যে বন্দম মুই বড় বড় মাছ॥
নদানন্দি বন্দম মুই সাগর গম্ভির।
জলমধ্যে বন্দম মুই হাংগর কুম্ভির॥
তায়ন সকলইধু সহস্র প্রণাম।
জ্ঞানি ধ্যানি পদে মুই জানাইলুম সালাম॥
অঝা গুরু মাঅ বাপ করি নমস্কার।
যাহার সাথে দেগি সকল সংসার॥
অন্ধজন' চক্কু গুরু বেদে শাস্ত্রে কয়।
গুরুর লাগিয়া প্রভু বৈদেশেত্তে রয়॥
ওহার উদ্দেশে মুর' সহস্র প্রণাম।
যাহার কৃপায়ে পাই সহস্র সালাম॥
যেত্তকুর পিতা আদি ভাই গুরুজন।
তাহারে বন্দম মুই ধরিয়া চরণ॥
চারি বেদ সত্য শাস্ত্র বন্দিলুম হরি।
[আখনে কহিব আমি অশেজ বিচারি]
কিবা ছ-দ কিবা বড় প্রণাম করিয়া।
কহিব চান্দবী কধা শাস্ত্র বিচারিয়া॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ চার।
তাহারে বন্দম মুই মাগি বড়ি (তার)॥

চিত্ররেখা বারমাস
রচনা : পুষ্পমনি চাকমা

অতঃসুলুক
[নমং আদি তুং অনাদি চরণং যথা॥
শক্তি রূপং প্রণাময়ং তিনং কুলাং যথা॥
মানবং মুক্তাতা আরণং (অথনং) চতুং বেদ ব্যাথা॥

www.pathagar.com

জাআরং চরনং অয়ং সর্ব চত্র যথা॥
চিত্ররেখা পুরাণং প্রচারয়ং এবো॥
রচিতাং পুষ্পমনি সকলাং জানিবো॥
এসব পুরাণং পাত্যাং করিতে যথা॥
অগ্যানং অপরাধং মার্জনং তথা॥

অতঃ বারমাস আরাম্ভ

আইস মাতা স্বরস্বতী মুরে দিবে বর॥
পূরণে রচিয়া দিবে অক্ষরে অক্ষর॥
আগে গুরু কল্পতরু সহস্র প্রণাম॥
যার গুণে সর্ব সিদ্ধি হয়ে মনস্কাম॥
শ্রী গুরু কমল পদে করি নমস্কার॥
দেবদেবি বন্দম এবে শুণ এগবার॥

অতঃ পয়ার

নম নম বন্দম মুই সর্ব মূলধার॥
যার গুণ ধরিয়াছে এই সব সংসার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন।
সৃষ্টি হেতু করিয়াছে এই তিন সৃজন॥
তিন গুণ প্রচারিল নিহ গুণ দিয়া।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন লাগিয়া॥
গুণে ধরে বিষ্ণু করয়ে পালন।
রজগুণ পায়ে ব্রহ্ম করয়ে সৃজন॥
তম গুণে ধরে শিব করয়ে সংহার।
ধরিয়া এই সব গুণ জগত্ত মাঝার॥
এবে বন্দিলাম মুই এই তিন জন।
একে একে বন্দিলাম সর্ব দেবগণ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বন্দম মুই লক্ষ্মী স্বরস্বতী।
ব্রহ্মার রমণি বন্দম সাবেত্রি গুণবতী।
শিবের জনি বন্দম শ্রিদুর্গা চরণ।
সহস্র প্রণাম করম সহস্রলোচন॥
কুবের বরুণ বন্দম যম দণ্ডধর।
যার নামে কাবে সদাই জিবের অন্তর॥
চন্দ্র সূর্য বন্দম আর নক্ষত্র সগল।
অপ্সরা কিন্নর তার গন্দর্বের দল॥
মুনি ঋষি বন্দম মুই গুরু বৃহস্পতি।
ব্যাস বাল্মিকী বন্দম কবি স্রিত্তিদি॥
এবে মা-অ স্বরস্বতী বন্দি তব পায়।

www.pathagar.com

কন্ধে থাগি জ্ঞানমাতা দিবেরে যোগাই॥
ছত্রিশ রাগিনি সহ রাগ ছয় জন।
মোর তাল আদি মুই বন্দিলুম এগন॥
পাতালে বাসুকী বন্দম সেই সব বিস্তর।
কালিকা তক্ষক দূর পত্ত জলধর॥
প্রণম নাগমাতা লুটাইয়া ক্ষিতি।
সন্যাসি তপসি বন্দম মুনিঋণি॥
শ্রিরাম লক্ষ্মণ বন্দম বীর হনুমান।
সুগ্রীব বানর আর মন্ত্রি জাম্ববান॥
মহেদ্র দেবেন্দ্র আর বানর।
বন্দম যুবরাজ আদি॥
জলেত্তে বন্দম মুই জলে জলাংকুর।
বড় বড় মৎস্য হাংগর কুম্ভির॥
তরু গণ মধ্যে বন্দম অশ্বথ আর বট।
সেই গুণ চন্দন বিল্ব বৃক্ষ শতে শত॥
তাল তরু সহ দেবদারু শাল।
আমলকি হরিতকি বন্দিলাম তুমার॥
পারিজাত মধ্যে বন্দম পুষ্পের প্রধান।
এই তিন ভুবন মধ্যে যাহার বাখান॥
মালতি মল্লিকা জবা চম্বা নাগেশ্বর।
গন্দ যুক্ত পুষ্প যত ভুবন ভিতর॥
অঝা গুরু বন্দম মুই সর্ব গুরু জন।
মাতা পিতা যেত্তকুর বন্দিলুম এখন॥
এই সব বন্দনা যদি অইল পুরন।
জিব সৃষ্টি কধা কিছু শুন দিয়া মন॥
যখনে অইল প্রভু শূন্যেত্তে বসত্তি।
জর্ম ঐতে আইল তার জলের উৎপত্তি॥
জলেত্তে দিনি ঐল ধরে গোলাকার।
তার মধ্যে বৃক্ষ লতা জর্মিল অপার॥
পজুপক্কি আদি যত নাগ আর নর।
বনেত্তে বানর ঐল জলে জলেচর॥
এই মতে জিব সৃষ্টি কল্ল্য নারায়ণ।
চারি যুগের কথা এবে করগৈ শ্রবণ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগ।
যুগ ধর্ম লয়া প্রভু করিল কৌতুক॥
এখনে কহিয়া দিম্মুই তার বারমাস।
বেদ শাস্ত্র লয়া মুই করিলুম প্রকাশ॥

www.pathagar.com

পুরুষ রমণী আর বৃদ্ধ যুবা আদি।
বালক বালিকা সবে শুন কন্ন পাদি॥
কান্দরি জননি তার সর্ব লুগ জানি।
তার গর্ভে জনম ঐল সুধাংশু বদনি॥
কান্দরি জননি আর তিবুজ্যা ঐল পিতা।
এগনে কহিয়া দিম্মুই তার জর্ম কথা॥

রূপ বন্দনা

হাদত বালা সুন্দর চান্দ খনজনে বাড়ায় পা।
যবুনবালা সুন্দর চান্দ কুগিলাই কারে রা॥
কি কহিমু চান্দবীর রূপের কথা স্বরূপ বাখান।
কোটি কোটি তারা জিনি চান্দের সমান॥
কিবা লক্ষ্মী স্বরস্বতী কিবা কামবান।
রূপে তিরস্কার করে শত শত চান॥
কোকিলার রাউ যেন মনুহর গতি।
পিঝে পিঝে চলি যায় লক্ষ্মী স্বরস্বতী।॥
যার গন্ধে মকরন্দে ত্যজে অলি বৃন্দ।
ঝাগে ঝাগে চলি যায়ে পায়ে মধু গন্ধ॥
যুগল উরু রম্ভা তরু চারু দুই হাত।
মধ্য দেশ এরি কেলেশ লজ্জা পায়ে মৃগনাথ॥
নাভি অঙ্গ জিনি পদ্ম অপুর্ব নির্মাণ।
কুচ যুগ ভরা বুক বিল্বের সমান॥
ভুজ সম ভুজংগম মৃণাল জিনিয়া।
সুরাসুর মুর্ছাতুর তাহারে দেখিয়া॥
কটি কাম জিনি দাম বদন পংগচ।
মনুহর তুথাগ্র গরুল অগ্রচ্॥
নাসিক্কায়ে লজ্জা পায়ে............... ।
নেত্রদ্বয় শোভা হয় মনি পঙ্কজিনি॥
পুষ্প চাপ হরেই দাপ ভ্রুদ্বয় ভংগিমা।
বালপ্রাত দিননাত্ত দিত্তে নারে সিমা॥
পিত্তবাস করে (আশ) থির সুধামিনি।
দন্তপাটি করে দুটি মুক্তার গাথুনি॥
দেব বরে জর্‌মি চান্দ দেব অবতার।
কতাক্ষে বহ্মার হরে ধ্যান ভিদিবার॥
কত শত চন্দ্র জিনি বদন সুন্দর।
লক্ষ লক্ষ তপ এর ঋষি মুনি বর॥
কুরংগ খন্‌জন জিনি নয়ন যুগল।
ইন্দ্র বরুণ জিনি অধিক্ক উজল॥

www.pathagar.com

হাস্য মুক্কে কধা কয়ে পুরুষের সংগে।
মদনে অয়ে সহায় দেগায় অংগে ভংগে॥
তিল ফুল জিনি তার নাসিক্ক্যার তান।
স্বর্গ মধ্যে নাহি শ্রী তাহার সমান॥
অশ্বিনি কুমার জিনি তেয় করে বাখান।
গ্রিধিনিয়ে দেখিলে তারে পায় অপমান॥
উত্তম চিকুর ভালে বিচিত্র সাজনি।
মস্তকের ঝারে ঝুধা বান্দিয়াছে টানি॥
খন্জন চলনি কিবা মাদংগ চলনি।
রাজহংস জিনিয়া যেন সুন্দর কামেনি॥
দেব বরে জরমিল চান্দ দেব অবতার।
কার শক্তি কইত্তে পারে রূপ গুণ তার॥
(ত্রিভুবন মূর্ছা যায়ে অপরূপ আশ।)
অন্ধকার রাত্রি মধ্যে করয়ে প্রকাশ॥
ভুবন মোহন রূপ সর্বাংগ সুন্দর।
স্বর্গ ছাড়ি হৈল্য কিবা পুষ্প পঞ্চশর॥
কিবা শশি রম্ভা হইল্য কিবা কামবান।
রূপে তিরচ্কার করে শত শত চান॥
রূপের বন্দনা কধা হইল পুরণ।
দান কধা কহি এবে শুন দিয়া মন॥

দান ধরম কধা

কন্ন পাদি শুন লুগ এগা মন করি।
ধর্ম কর্ম করিয়াছে চান্দবী সুন্দরী॥
অঝা গুরু মা হয় বাপ আর জ্ঞানি লুক।
সকল ভজনা করের নাহি মনের দুখ॥
অতিথি সেবনা করে চন্দবী তখন।
নানান দ্রব্য যত্তন করি করাইল ভুজন॥
সেবনে ভুজনে যদি গুরু তুষ্ট হয়।
সেই জনের মনবাঞ্ছা পুরায়ে নিচ্ছয়॥
অন্ন বস্ত্র দান করে তাম্বুল সুপারি।
এই মতে দান করে চান্দবী সুন্দরি॥
ঘৃতছনি দধি দুধ সব করে দান।
ত্রিভুবনে না করে দান তাহার সমান॥
শুন শুন সাধু জন সেই সব কাহিনি।
চান্দবী সমান দান না করে কামেনি॥
যত বড় দান করে তত মাগে বর।
স্বামি দান দেগৈ মরে প্রভু দাম্মদর॥

www.pathagar.com

নুয়ারাম অতিব পতি মনে করে আশা।
মনে মনে ভাবে চান্দ (গবিন্দ ভরসা)।

অতঃ দিতিয়া প্রিত্তি
আর এক দিনে চান্দ ঘরেত্তে বসিয়া।
মনে মনে ভাবে চান্দ নুয়ারাম' লাগিয়া॥
দিন মনি কুল বরে নাইরেই প্রাণ কান্দ।
এখনে হইলে দেগা প্রাণি অব চান্দ॥
যদুর নন্দন আনি বান' মিশাইয়া।
সেই ভাবে অভাগিনি মুরিম্মুই পুড়িয়া॥
(নয়নে নয়ন) দিয়া জরমি বেক্ক (ফি)।
অধরে দিয়া জরমিলেক্ক (রি)॥
অংগে অংগে মিশাইয়া প্রিত্তি করিব।
আমার যদেক্ক দুখ সেই জনে জানিব॥
ন সয়ে দারুণ অংগ বিষে জালাপরা।
নিবারনি দিত্তে নারি হৈলে বাতে বুড়া॥
যেই পিরা সেই দারু দিবেক্ক উচিত।
এগ পিরা আর দারু না লয় মুর' বিষ॥
সর্পয়ে দংশিলে বিষ ঝাড়িয়া লামায়।
প্রিত্তি করিলে বিষ আলিংগনে যায়॥
এই সব দুক্ক মুর বিদরয়ে বুক।
জিবন রহিল মুর না খন্দিল দুখ॥
মরিম মুই নুয়ারাম শোকে মনে হেন জানি।
বাণ পক্ক্য পান করি তেজিম মুই পরাণি॥
কিবা নারি কিবা পুরুষ প্রিত্তি করিব।
আমার যদেক্ক দুক্ সেই জনে জানিব।

লামাহ্ পালা বারমাস

বুদ্ধ লামাহ্
রচনা : ধর্মধন চাকমা

এক লামাহ্
আরেই গুরু সালামত
সৃত্তি গুরু সালাম দ্যাং মুই চরণত
আদি গুরু নমস্কার
বুদ্ধ সালাম দ্যাং মুই এগেম সার
সত্য পুরীত জনম যার

www.pathagar.com

বাপ-মা চরণত নমস্কার
মানেই কুলে জন্মেলুং
বুদ্ধ সাধনা নিহ্ গেলুং
সালাম দিলুং দেবগণ
বুদ্ধ সাধনার আলাপন
বুদ্ধ চরণে সালামত
জোগেই দিবে মরেহ্ গীদর পদ
প্রথম সালাম দ্যাং নিরঞ্জন
আরহ্ সালাম দ্যাং দুই চরণ
আরহ্ সালাম দ্যাং তার চরণ
সালামত দ্বি আহ্‌ত জুর গড়ং
সালাম দিলুং আহ্‌ত জুড়ে
সৃত্তি গুরু বর দিবে তুই মরেহ্
বুদ্ধ চরণে নমস্কার
ধর্ম চরণে নমস্কার
সংঘ চরণে নমস্কার
ত্রিশরণে বন্দনা গড়ং বারেবার
দ্বি আহ্‌ত মুই জুড় গড়ং
সালাম দিলুং তার চরণ।
গুরু চরণে নমস্কার
বাপ মা চরণে নমস্কার
অঝা গুরু মানেলুং
স্বর্গ-মত্ত্য মানেইপুর
সালাম দিলুং দেব কুলে
বর্মা, বিষ্ণু আহ্ শিবরেহ্
মা-স্বরস্বতীরে সালামত
জুগেই দিবে মরেহ্ গীদর পদ
পূবে সালাম দ্যাং বর্মারেহ্
পশ্চিমে সালাম দ্যাং শিবরেহ্
উত্তরে সালাম দ্যাং বিষ্ণুরেহ্
দক্ষিণে সালাম দ্যাং যমরেহ্
তলে সালাম দ্যাং মেদিনী
উগুরেদিহ্ সালাম দ্যাং সন্যাসী
বেগর চরণে নমস্কার
সালামী পালাহ্ রবিবার
সৃত্তি যঘন জন্ম ওহ্‌ল
রবিবার ভিলি নাঙ তখন ওহ্‌ল

www.pathagar.com

আদি কল্প জন্ম তখন
সাতবার উহ্ইয়েহ্ সে কারণ।
সগল দেবতা বন্দিলুং
গীদর লামাহ্ জোরেলুং
দেবদা সালামি ফুরেই যার
বুদ্ধ চরণে নমস্কার
সগল দানে সার গড়েহ্
বুদ্ধ নাঙে পার গড়েহ্
মা সরস্বতীরে সালাম দ্যাং
গীদর সাধনা নিহ্গেল্যহং
সালামি এক লামাহ্ ফুরেলহ্
বুদ্ধ চরণে মন রলহ্।

দ্বি লামাহ্

গীদর এক লামাহ্ ফুরেইয়েহ্
বুঝিলে বুঝিবাক মানেইয়ে
কিয়াত দিলুং সাফ কাবড়
বুদ্ধ চরণে পূজঙর
প্রভু চরণে নমস্কার
আত্মা শক্তি নৈরাকার
নৈরাকারত যঘন রোহ্ল।
স্বয়ং প্রভু জন্ম ওহ্ল
সর্গল প্রভু নৈরাকার
দেলহ্ প্রভু অন্ধকার।
যঘন প্রভু এগা রোহ্ল
শুন্য উগুরে তবত্ বোহ্ল
শুন্য উগুরে গল্যহ্ ধ্যান
তবত্ পেইয়েহ্ দিব্য জ্ঞান
জবা অজবা নাঙ জবে
দিব্য জ্ঞানে সৃত্তি দেঘে
এদঃ ভাবি নিরঞ্জন
সৃত্তি বানেবার গল্যহ্ মন
শুন্য উগুরে গলহ্ঃ তব
তবত্ পেলহঃ বুদ্ধ জব
যঘন্য সৃত্তি জন্ম ওহ্ল
আরহ্ প্রভু তবত বোহ্ল
তবত বস্যে এগামন
নাভিত জন্মেল পদ্মাসন

www.pathagar.com

বিশ্বু জম্মেল মুক্কেদিহ্
শিবে জম্মেল বাঙেদিহ্
বর্মা যঘন জম্মেইয়েহ্
সৃত্তি বানেবার জ্ঞান পেহ্ইয়েহ্
প্রভু আঘে পদ্মাসন
বানেল সৃত্তি এগামন
পথম বানেলঃ স্বর্গপুর
আরহ্ঃ বানেল মর্ত্যপুর
সপ্ত দীবে আবাসন
আরহ্ বানেল জীবগণ
নানা জাদি বানেইয়ে
নাগ জাদিয়হ্ বানেইয়েহ্
স্বর্গপুর দেবগন
মর্ত্যপুর মানেইগণ
বানেল বর্মায় সগল জীব
সৃত্তির কত্তা আহ্ইল শিব।
ধার্মিক বাদে পাবী নেই
দেবে মানেইয়েহ্ দেঘা পেই
সত্যবানত যদ লুক
ভাগ্য সৃত্তি সত্য যুগ
সত্য যুগে সত্য রলহ্
দীপংকর বুদ্ধ জন্ম অহ্লহ্
বুদ্ধ যঘন জম্মেইয়েহ্
দীপংকর ভিলি নাঙ পেহ্ইয়েহ্
পঞ্চাশ আহ্জার শিষ্য পেই
ধর্ম সাধি স্বর্গত যেই
সত্য ত্রেতা দাপর যুগ
এঘন পয্যেগী কলিযুগ
কলি কালর অরম্ভন
রাজা উহ্ইয়েহ্ শুদ্ধোধন
ধর্ম ভাবি বেড়েইয়েহ্
গৌতম বুদ্ধরে লাগ্ পেহ্ইয়েহ্
বুদ্ধ যঘন জন্ম ওহ্ল
কলি যুগ্কহ্ঃ ধন্য ওহ্ল
নম বুদ্ধ অবতার
ধন-ধান্যর মাঘং বর
সুখ শান্দি নিত্য পেবাহ্র

www.pathagar.com

আরহ্ বত্তা মাঘগুর
যেবা পূজো পদত্তলে
পাবখুন মুক্তি পার গড়েহ্
বুদ্ধ শাস্ত্রে বলে
এগেম সার গল্লেহ্
বুদ্ধ চরণে সালাম দ্যং
গীদর দ্বি লামাহ্ ফুরেইয়ং

(অংশ বিশেষ নেওয়া হয়েছে)

কলিযুগ পালাহ্

রচনা : ধর্মধন চাকমা
কিয়া বলি শুন সবে কলিযুগ বিবরণ।
কলিযুগঃ মনস্সগণ যেই মত লক্ষণ॥
কাম-ক্রুদ্ধ বলবীজ্জ কামে অহ্ইব মন।
কামভাবে করিবেক্ক ধর্ম বিনাশন॥
কধা-কামে হেমামতি কিছু না থাগিব।
ছলমতি নারী সঙ্গে রঙ্গরসে মজিব॥
ক্ষেত্রীসব নির্বলী অহ্ইব অধর্ম কারণ।
দয়াইহ্ন অহ্ইব লুক, আত্মসুঘ লাগি॥
বলাজুর করিবেক্ক, ভদ্র ভাবে ডাগি॥
ঘর ভুলে গদি অহ্ইব ভিন্ন নারী পাশ।
গৃহকায্য এরিবেক্ক জাদি আহ্ইব নাশ॥
সত্য ভ্রষ্ট অহ্ইয়া লুগে মিঝায় পূর্ণ অহ্ভঃ।
মন্দমতি লুক দ্বারা, অনাচারে ভরিব॥
মাতা-পিতা না পালিব অহ্ইব অনাচার।
গুরুজন পদে ভক্তি না থাগিব আর॥
ঘরে ঘরে ঘুরিবেক্ক ত্রি-রঝের লাগি।
পর দুয়ার করিবেক্ক, ঘরের ঘরণী ছাড়ি॥
ঘৃণা করি মাতা-পিতা, না পালিব আর।
উলমত্য অহ্ইব লুক, ভবের মাঝার॥
উত্তমে- অত্তমে জান অহ্ইব গৃহবাস।
কানাহ্য় কানাহ্য় না মিলিয়া শান্দি অহ্ইব নাশ॥
অন্যায় অধর্মে সদায়, মতি অহ্ইব লুক।
লুভে-ক্রুদ্ধে আহ্ বিলাসে বাড়ির মনঃদুঃখ॥
অকালে অহ্ইব বৃষ্টি, কৃষি অহ্ইব নাশ।
চঞ্চল অহ্ইব লুক, করি আহ্-বিলাস॥

www.pathagar.com

সত্যধর্ম না মানিব, করিব অনাচার।
পাবকায্য অবিচারে ভরি যেব সংসার॥
সরিষাদি কলিযুগে একবন্ন অহ্ইব।
চক্ষের পলক্কে লুগে শান্দি সংহারিবা॥
জাদি বুলি সর্বত্র, চিহ্ন না থাগিব।
সকল পিথিমী লুক, একবন্ন অহ্ইবা॥
ছাড়িবেক্ক নিজ ধর্ম অন্য ধর্মে যাইব।
অপমা ভ্রাতির বন্ধু তাহারে অহ্রিবা॥
সুখেত্তে অহ্ইব ধর্ম, মনে না থাকিব।
ধর্ম নাঙে মিধা কধায় পররেহ্ ঠগেবা॥
মুনি ঋষি ছাড়িবেক্ জব তর নাঙ।
তাহার কাছে হীন অহ্ইব কৈকুণ্ঠের ধাম॥
যাইব ভুলে জাদি জ্ঞাদি, না অহ্ইব বিচার।
জাদি জ্ঞাদি চিহ্ন আরহঃ না থাগিব আর॥
যনমান না থাগিব লুক পুরোহিত।
জাদি নত্ত্য আহ্ইবেক্ক অধর্ম চরিত॥
পুরুষ অহ্ইব গৃহআহ্রা নারীর কারণে।
রঙ্গ-ঢঙ্গ ছাড়া কিঝু, না বুঝিব জীবনে॥
নারী যাইব পরসঙ্গে পুত্র কন্যা ছাড়ি।
ভুলিবে লালসার ভারে, আপন ঘরবাড়ি॥
জয়া ভুলে জাদি জ্ঞাদি না অহ্ইব বিচার।
জাদি জ্ঞাদি চিহ্ন কিঝু না থাগিব আর॥
জয়া ভুলি যাইবে বাড়িহ্ কলির দুরাচার।
জরবড়ি সনে যেন, জল তরংকার॥
জঞ্জাল করিব লুগে কলির প্রত্তাবে।
ঝগড়া করিব লুক আপন জ্ঞাদির সনে॥
জাদি জ্ঞাদি না থাগিবে কুলির প্রত্তাবে।
ধর্ম-ছাড়ি অধর্মে মতি অহ্ইব কলি যুগে॥
নয়া ভুলে নীদি ধর্ম না শুনিবে কানে।
নিঃধনী অহ্ইব লুক এই যে কারণে॥
মিইয়াইহ্ন অইহ্ব লুক দয়া বিবর্জিত।
না বনিব কুলি যুগে ঘরের সহিত॥
তয়া ভুলে তব-জব না করিব আর।
তিলেক মাত্র ধর্ম কধা না শুনিব আর॥
তেজইহ্ন অহ্ইবেক্ক কলির ব্রাহ্মণ।
সেইমত অহ্ইবেক্ক আরহ্ঃ মুনিগণ॥
শাস্ত্র বাক্য মুক্খে অহ্ইব, মনে পাব চরিত।
মুখেত্তে অহ্ইব আপন, অন্তরেত্তে বিষ॥

www.pathagar.com

অহংকার বাড়িবহ্ রাজার, রাজধর্ম ছাড়ি।
কৌশলে প্রজার ধন, রাজায় নিব কাড়িহ॥
স্বামীর ধন ছাড়খার করি পরপুরুষে দিব।
পুত্রকন্যা ত্যাগ করি ইচ্ছাসুখে চলিব॥
থয়া ভুলে থাগিবেক্ক হিংষা বরাবরি।
থাগিয়া বান্দারঃ ধন করিবেক্ক চুরি॥
থাগিয়া আপন স্বামী, যাইব পর দুয়ার।
ত্যাগিয়া আপন বাক্য করিব দুরাচার॥
দয়া ভুলি ভাগেদি চুরি করিবে মহাজন।
দরিদ্র অহ্‌ইব লুক, এই যে কারণ॥
দয়াইহ্‌ন প্রবঞ্চক, ধনে অহ্‌ইব মতি।
ডুবিয়া নরক কুন্ডে, পাইবে দুর্গদি॥
আত্ত ভুলে রঙ্গ-ঢঙ্গ কলিত্তে করিবে।
ঢেং-গদি জনে, কে কারে চিনিবে॥
ঢেং-গদি জনের অহ্‌ইব পাব-চিত্ত মন।
নিজের স্বার্থের লাগি ভুলিব পর আমন॥
বড়লুগে করিব চুরি, কাঙ্গালের ধন।
অধর্মের পধে চলি, করিব সম্পত্তি অহ্‌রণ॥
অনাচার করিব রাজা, প্রজা না পালিব।
আপন প্রজা ছাড়ি যাইব, ভক্তিইহ্‌ন অহ্‌ইব॥
আপনার প্রিয় পত্নী, স্বামীকে ছাড়িব।
আপনার পাবে নারী নরক্কে পড়িব॥
থয়া ভুলে থাগিবেক্ক লুগের প্রচার।
এগান্ত বালক্কে ডাগি, মাঘিব শৃংগার॥
তেজবর্ণ অহ্‌ইব সূর্য্য সংসার দকিব।
তিল, ধান্য, যব-কৃষি, সব বিনাশিব॥
থয়া ভুলে থাগিবেক্ক, ইচ্ছা বরাবরি।
থাগিত্তে নিজের স্বামী, ফেলিবেক্ক মারি॥
থাগিয়া আপনার ধন, করিবেক্ক চুরি।
ছলে বলে পরধন, লইবেক্ক কাড়িহ্‌॥
নীদি বিবর্জিত আহ্‌ইয়া লুকে অধর্মে চলিব।
সাধুজনে ধর্ম ভুলি, পাপাচারী অহ্‌ইব॥
দান-কর্ম, ধর্ম পধে না থাগিব ভক্তি।
দিনে রেদে পাব গুড়িহ্‌, না অহ্‌ইব মুক্তি॥
শাস্ত্রবাক্য না শুনিব, ধর্ম অহ্‌ইব নাশ।
দয়া-মায়া আহ্‌রা অহ্‌ইয়া, সৃত্তি অহ্‌ইব বিনাশ॥
দয়া ভুলে দিনে দিনে, আয়ু অহ্‌ইব শেষ।
হিংষার আগুনে জ্বলি, মানুষ অহ্‌ইব নাশ॥

www.pathagar.com

দ্বাদশ সূর্য্যের তেজ এক সূর্য্যের অহ্ইব।
দকিয়া সূর্য্যের তেজে, সব বিনাশিব॥
দয়া ভুলে নীদি ধর্ম্ম, কেহ না রাঘিব।
ধন লুভে সাধু জনে, মিথ্যা স্বাক্ষী দিব॥
ধর্ম্মরে ছাড়িয়া লুকের পাবে অহ্ইব মন।
ঢেং-মদি অহ্ইব লুক, আপন জ্ঞাদি সন॥
নয়া ভুলে না থাগিব, শাস্ত্রের বিচার।
না মানিব আর্য্য-গুরু, অহ্ইব পশুরঃ আচার॥
দান ধর্ম না থাকিব, পাবে অহ্ইব মতি।
ধর্ম্মনাশা কামে অহ্ইব, মানুষের গতি॥
পয়া তুলে না থাগিব, পাব-শূন্য সৃত্তি।
পাবহেনে অহ্ইব লুক, পশুর আকৃতি॥
পাবলাগি কুলিযুগে অহ্ইব দয়া বিবর্জ্জিত।
পাব ফলে পর ধনে অহ্ইব বিমোহিত॥
ফয়া ভুলে ফুলফল, গন্ধ অহ্ইব ইহ্‌ন।
ফুলের মধুর গন্ধ, যাইবে দিনে দিনে॥

(অংশ বিশেষ নেওয়া হয়েছে)

মা-বাব : বারমাস

বৈশাখ মাস

বৈশাখ মাসেত্তে মা-বাব পথমঃ বছর
তুমার লাগিয়া মুই ধল্লুং অন্তর।
তুমার লাগিয়া অঙ্গে করিলাম জল,
তুমি বিনা এই পিথিমী যায় রসাতল।
দেবায় করিল কালা উত্তরের কোণে
মাতা নাই বাব্অঃ নাই দাগি নিব কনে?
দেবায় করিল গজ্জন আসমানে বসি
মা-বাব থাগিলে ঘরে মুরে নিদাগিহ্।
আহারে দারুণ মা-বাব্ ডাকিলে না পাই
কান্দিয়া মরি আমি মা-বাব্ দেখা নাই।
এ মেন দুল্লভ পুত্রের করিলা নিঠুর
আহারে দারুণ মা-বাব্ গেলা স্বর্গপুর।
এত বছর পালাইয়াছ বুকের দুধ দিয়া
এত বছর পালাইয়াছ কিছু অন্ন দিয়া।
তিন বছর পালাইয়াছ বহু যত্ন করিয়া
সুঘে রাখিয়াছ নানান রঙ্গ দিয়া।

www.pathagar.com

এইমতে চারিবর্ষে পড়িলাম আমি
মুরে দেখিয়া সদা তমার মনে খুশী।
এই মতে চারিবছর পাইলাম যখন
ধূলায় খেলা করি আমি সদা রাঙ্গা মন।
পঞ্চম বছরে মা-বাব্ আমারে ছাড়িলা
নাবালক শিশুপুত্রে কারে গছাই দিলা?
কিয়েহ্ দেগৈ লাধি-ঘুষা, কিয়েহ্ দেগৈ বারি ·
মা-বাব্ ছাড়া পুত্র আমি কান্দিয়া মরি।
যদি থাগিদে মা-বাব্ মুরে নিদা কাড়িহ্
এখন কেমনে আছ, মুরে একা ছাড়ি?
আহারে দারুণ মা-বাব্ ডাগিলে না পাই
তুমার লাগি মা-বাব্ করি হায় হায়।
কিয়েহ্ ডাগ চিজি-লক্ষী, কিয়েহ্ ডাগঃ পরান
সে কধা মনত উধি ছটফট গড়েহ্ মন।

জৈষ্ঠ মাস

জেত্রল মাসেত্ত্ব মা-বাব্ গাঝে পাঘে আম
না দেঘিলে ওরে মা-বাব্ জলে দিম্বোই ঝাম।
না দেঘিলে ওরে মা-বাব্ মত্তুং মনে কয়
মনে কয় পিত্থিমীত গড়িধুং প্রলয়।
বাবে পাড়ে আমফল পুত্র বঝি খায়
আহারে দারুন মা-বাব্ কুধায় গেলে পাই?
যদি ঘরে থাগিদ মা-বাব্ দুয়ারে বসিয়া
আম্রফল পাড়ি দিত, আমার লাগিয়া।
আহারে দারুন মা-বাব্ কুধায় ছাড়ি গেলাহ্
নাবালক শিশুপুত্রে কারে গছাই দিলাহ্?
মাঅঃ নাই বাব্অঃ নাই নাই কুনজন
বিধিয়ে দিয়াছে মুরে কপালের লিখন।
আহ্ধত কালি বাঝিলেহ্দহ্ঃ পুঝিলেহ্ যায়
কর্মলেঘা জীবন দুঃখ ভুজিলে তেহ্ যায়।
আহারে দারুন বিধি কদ দিবে দুঃখ?
ছোদকালে না দেঘিলুং মা-বাবের মুখ।
আহারে দারুন বিধি কি বলিব আর,
কর্ম্মদুঝে জন্ম দুঃখ কপালেত্তে আমার।

আষাঢ় মাস

আষাঢ় মাসেত্তে মা-বাব্ আহ্ল্যা বানেহ্ এল্
মর যদি থাগিদ মা-বাব্ কন্নাহ্ দিদ গেল্?

www.pathagar.com

আহারে দারুন মা-বাব্ কদ পাইলাম দুঃখ
এ জীবনে না দেঘিলাম মা-বাবের মুখ।
মাঅঃ নাই বাবঅঃ নাই নাই কুন আঝা
বিন্দু মাত্র করি আছি গোবিন্দ ভরষা।
যদি মা-বাব্ থাগিদ ঘরেত্তে বসিয়া
সগল দুঃখ খণ্ডাইতুং মা-বাব্ দেঘিয়া।
আহারে দারুন মা-বাব্ কুদায় গেলাহ্ ছাড়ি?
তুমার লাগিয়া আমি কান্দি কান্দি মরি।
কান্দিতে কান্দিতে মা-বাব্ পড়ি আছি একা
দিবানিশী কান্দিয়া আমি না-পাইলুং দেঘা।
যদি ঘরে থাগিদ মা-বাব্ আমার লাগিয়া
সগল দুঃখ পাশরিদুং মা-বাব দেঘিয়া।
মাঅঃ নাই বাকঅঃ নাই নাই কুন জন
না জানি কি আছে দুঃখ কপালের লিঘন।
দৈবের নির্ঘন্ট কেউ খণ্ডাইতে না পারে
কু-হেনে জম্মেলুং মুই জননী উদরে।
আহারে দারুন বিধি কি করিলা মুরে
কর্মদুঝে জন্মদুঃখ ভূগি বারে বারে।
বিধাতায় দিয়া দন্ডে কধক পাণ্ডর দুঃখ
জীবন ভরি না দেঘিয়া মা-বাবের মুখ।

শ্রাবণ মাস

শ্রাবণ মাসেত্তে মা-বাব ধানে ধরে থুর
আহারে দারুন মা-বাব এত অহ্ইলা নিঠুর।
নিঠুর অহ্ইয়া মা-বাব আমারে ছাড়িলা
স্বর্গপুরে গিয়া মা-বাব নিরালে রইলাহ॥
যদি মা-বাব থাগিদ মুর সুখ পেধুং মনে
তুমিয়হ্ঃ নাই উক্কু মা-বাব অন্ন দিব কনে?
সমবারে পড়ে জান বাজারের আহ্ট
পাড়াল্যা লগে বাজারে যায় বানা ঝাঘে ঝাগ।
যত মা-বাব ঘরে আছে শান্দিতে বসিয়া
বাবর সঙ্গে পুত্রয়হ্ যায় বাজারে চলিয়া।
কিয়েহ্ দেগৈ পিধা কিনি কিয়েহ্ দেগৈ মলা
বাব-পুদে বইয়া খায় বাজারের কলা।
আহারে দারুন বিধি মুর মা-বাব নাই
কলা-মলা-পিধা মুরে কনে দিব চাই?
সন্ধ্যার সময় অহ্ইলে সবে ঘরে আসে চলি
যার পুত্র তার কুলে ধরি লয় যে তুলিহ্।

www.pathagar.com

আহারে দারুন বিধি কি করিলা মুরে?
পূর্বজন্ম কর্মফলে মা-বাব কাড়িহ্ নিলে।
যার মা-বাব আছে ঘরে পুত্রয় বেড়েহ্ই ধরে
নানান রঙ্গ করে পুত্র মার কোলের উপরে।
যদি ঘরে থাগিদ মা-বাব আমার লাগিয়া
নানান রঙ্গ গথুং মুই তার কুলে বসিয়া।
আহারে দারুন মা-বাব্ কুধায় চলি গেলাহ্?
নাবালক শিশুপুত্রে কারহ্ গছাই দিলাহ্?
মা-বাব নাই মুর নাই ভেই-ভোন
বিধিয়ে দিয়াছে মুরে কপালের লিঘন।
আহারে দারুন মা-বাব কান্দিলেয়হ্ঃ না-পাই
মা-বাব ছাড়া পুত্র আমি কুধায় চলি যাই?

ভাদ্র মাস

ভাদ্রল মাসেন্তে মা-বাব ধানে ধরে পাক
কুধায় গেলেহ্ পাইব আমি মা-বাবের লাগ্?
কিয়েহ্ কাবে ধান এখন কিয়েহ্ তুলেহ্ কোন্
কিয়েহ্ যায়গৈ তোনপাতালোই মোন জুমথুন।
মা-বাব নাই মুর নাই ভ্রাদি বন্ধু
বেগেহ্ দূরত ঠেলে মুরেহ্ আত্মীয় কুদুম্ব।
আহারে দারুণ মা-বাব কুধায় চলি গেলাহ্?
নাবালক শিশুপুত্রেরে রাঘিয়া একেলা।
কান্দিতে লাগিলুং মুই বৃক্ষ তলে বসি
মা-বাবদঃ নেই মুর যদি থেদঃ মুঝি।
বস্ত্র দিদ মুরে মুঝি আদর করিয়া
এক্কেনা অহ্লেহ্ দয়া দিদ মুর কাছে বসিয়া।
আহারে দারুন বিধি কি করিলা মুরে?
কর্মদুঝে জন্ম দুঃখ ভুঘি ঘুরে ঘরে।
প্রভাত অহ্ইলে তবে সুয্য উদয় অহ্য়
মা-বাবঃ লাগিয়া আমি মরিব নিশ্চয়।
যদি ঘরে থাগিদ মা-বাব্ আমার লাগিয়া
দেবার গর্জন শুনি ঘরত নিদঃ ডাগিয়া।
আহারে দারুন বিধি মা-বাব্ নিলেহ্ কাড়িহ্
বিধিয়ে দিলে দুঃখ কি করিতে পারি।
কান্দিতে কান্দিতে মুর চোঘে পড়ে জল
দিবানিশী কান্দিয়া আমি অহ্ইব পাগল।
মাঅঃ নাই বাব্অঃ নাই কন জন
বিধিয়ে দিয়াছে মুরে কপালের লিঘন।

www.pathagar.com

আশ্বিন মাস

আশ্বিন মাসেত্তে মা-বাব রানী হুয়া পড়ে
ডলা ডলা হুয়া বনায় মোন হুয়াং ঘিরে।
কাল্যাং বুগী ঝাগে ঝাগে জুমত যান তোনতগা
নানা বাবত্যা তোন তগাদে বেড়ান জুম জঘা।
কিয়েহ্ ছিনে কুমুর কুজিহ্ কিয়েহ্ কুড়েহ্ আলু
কিয়েহ্ তগায় কাঙারা আহ্ কিয়েহ তগায় কজু।
সুমিয়হ্ঃ ছিনন্ আরহ্ঃ কিয়েহ্ কিয়েহ্ শাক পাত
গাঝ ছাবাত কিয়হ্ঃয় জিরান ছাড়ি দ্বিয়ান আহত।
যে যিয়ান তোগেদাক সাদ মনত নিত্য সুখ
ঘরত গেলেহ্ বেগে দেবাহ্ক মা-বাবের মুখ।
ঘরেত্তে যাইয়া যদি মুইয়হ্ঃ মা-বাব দেঘিদুং
মনত্থুন সগল দুঃখ আপোসে খন্ডাইতুং।
কধক সাধিলুং তুয়হ্ঃ না পাইলুং দেঘা
মা-বাব ছাড়া জীবন মুর বৃথা গেলহ্ এগা।
এ জীবনে না বুঝিলাম মা-বাবরঃ সুখ
আহারে দারুন বিধি মুরে দিলা দুঃখ।
মা-বাব ছাড়া একা আমি কপালের লিঘন
বিধিয়ে লিঘেছে দুঃখ কে করিবে খন্ডন?
কর্মদুঝে সারাজীবন ভুগি জন্মদুঃখ
জীবন ভরি না দেঘিলাম মা-বাবের মুখ।
আহারে দুর্লভ মা-বাব ডাগিলে না-পাই
কান্দিয়া কান্দিয়া মরি, করি হায় হায়।

(অংশ বিশেষ নেওয়া হয়েছে)

সৃত্তি উৎপত্তি আর প্রলয় পালা

নমঃ নমঃ বন্দি মুই আদি নিরঞ্জন;
নিমিষে সিরজিল প্রভু এই তিন ভুবন।
নম বন্দম ব্রহ্মা বিষ্ণু সাগর দেবতা,
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দি মুই বিষ্ণুর ভণিতা।
শিবশক্তি বন্দি মুই পার্বতী নন্দন,
মুনি ঋষি বন্দি মুই গুরুর চরণ।
গুরুর পদে নিরবধি চক্ষু রইল মর,
তাহার চরণে বন্দম মুই দুই আহ্ত জুড়।
গুরু নাঙ ভাবি সদা দিবারাত্র ধরি,
গুরু পদত্তলে মর বৈকুণ্ঠ নগরী।
সৃত্তি পুরাণ কধা শুনে যেই জন,

আয়ু বৃদ্ধি, বংশ বৃদ্ধি বাড়ে ধনজন।
পুরাণে কিতাবে যার অন্য মন অহ্য়,
অন্ধজঃ কারণে সেই জন নরক্কে পড়ই।
আগমে পুরাণে যার পাঞ্চালিকা রতন,
দ্বিজ কাশীরামে কয়ে সৃত্তির পতন।
কর জুরে মানি তারে, কয়ে করপ্তুতে
আহ্ত জুড়ে জিজ্ঞাসিল পক্ষীর নিগূঢ়ে।
পূর্ব বিবরণ পক্ষী কগৈ সমাচার,
কিরূপে করিল সৃত্তি প্রভু নৈরাকার।
শুনিনে যে পুরাণ কথা কগৈ মুখোমুখী
যেইরূপে করিল প্রভু সৃত্তির উৎপত্তি।
মুক্তি সার জ্ঞান তবে কয়ে দ্বিজগণ,
উৎপত্তি, প্রলয়, সৃত্তি যাহার লক্ষণ।
ন-আছিল উদয় অস্ত আর রবি-শশী
ন-আছিল স্বর্গমর্ত্ত্য আর দিবানিশী।
ন-আছিল সাগর আদি থাবর জংগম,
ন-আছিল ইন্দ্র চন্দ্র উত্তম-অত্তম।
ন-আছিল সোনারূপা ন-আছিল মনি,
ন-আছিল দধি দুগ্ধ ন-আছিল ননি।
ন-আছিল বায়ুজল এই সপ্ত পাদাল,
ন-আছিল বৃক্ষরাজি এই কুসুমধাম।
ন-আছিল আদি দেব আকার ইকার,
ন-আছিল বেদ-মন্ত্র সংসার মাঝার।
ন-আছিল জন্মমৃত্যু ন-আছিল ওংকার,
ন-আছিল দিবা-রাত্রি সব অন্ধকার।
ন-আছিল পশুপক্ষী কীট আর পতঙ্গ,
ন-আছিল বাদ্যযন্ত্র ন-আছিল রংগ।
ন-আছিল ঘাট পাত প্রভুর সিংহাসন,
শুণ্যতে রইল প্রভু একই তুলন।
ন-আছিল বেদ-পাত নিত্য অন্ধকার,
ন-আছিল মুনি ঋষি সব শুন্যকার।
প্রকাশ অহ্ইল যদি নির্মুক্ত মাঝার,
সৃত্তি অহ্ইল তবে ভবের বাজার।
উর্দ্ধ-অধে নাইক্ক প্রভুর নাইক্ক মরণ,
কেগই নইক্ক প্রভুর সমান রতন।
ইন্দ্র আদি মনিগণে না বুঝি মহিমা,
মনিঋষিগণে নারে দিতে তাহার সীমা।

www.pathagar.com

নিরালে বসি ধ্যানে না পাইল যাহার,
বেদ-তত্ত্ব পুরাণের না পাইল তাহার।
আগমে পুরাণে তারে বলিত্তে না পারে,
পুরাণে কিতাবে তারে বুঝিত্তে না পারে,
অহ্ত্ত-পত্ত পুরাণেতে বুঝিল মরম,
শিবার ঘাটে থাগি করে নানান কর্ম।
এইরূপ জানিয়া প্রভু সগল রাখিল,
গদে গদে সগলের জীবন আইল।
মাতা নাই পিতা নাই নাইক্ক গোচর,
পুত্র নাই নারী নাই প্রভু এগেশ্বর।
ঠাই নাই থিদিয়া নাইক্ক বসত্তি,
গৃহকায্য নাইক্ক প্রভুর নাইক্ক যুবতী।
অহ্ত্য নাই পহ্ত্য নাই নাইক্ক নাসিক্ক্য,
পূর্ণ ব্রহ্মা সনাতন ত্রিভূবনে একা।
পদ নাই গতি করে, সুক্খ নাই হায়,
কর্ণ চক্ষু নাইক্ক প্রভুর দেখার শুনাই।
উদর গ্রাহিয়া প্রভু সকল রাখিল
গদে গদে সকলের জীবন আইল।
উদয় নাইক প্রভুর ক্ষধামাত্র আছে,
কাদা-ছিরা, জরা-জাদি নাই কন ভাজে।
এই মদে কদকাল যদি নির্বাইল,
চতুর্দিকে আহার যে আসিয়া মিলিল।
ধ্যানবলে নিরঞ্জন জলতাকার কল্যহ্
অন্ধকার মধ্যে প্রভু দন্ডকর অহ্ইল।
দন্ডকর হয়ে প্রভু মনে বিচারিল,
সৃত্তি করিবারে প্রভুর মনেত্তে অহ্ইল।
এগ মুক্তি তিন কলা সৃত্তির সিরজন,
আমি বাদে পিত্থিরীতে নাই কনজন।
এই মদে কদকাল যদি নির্বাইল,
সৃত্তি জর্মাইতে প্রভুর মনেতে অহ্ইল।
আপনার ছায়া যবে আপনি দেঘিল,
কে তুমি বলে প্রভু তারেহ্ জিজ্ঞাইল।
ছায়া বলে, কেদু নাঙ অহ্ইল আমার,
ধর্ম কেদু বলি নাঙ রাখিল আমার।
এই মদে কদকাল যদি নির্বাইল,
"ফু" কারে জমিয়া ব্রহ্মা প্রকাশ অহ্ইল।
জ্যোতির্ময় অহ্ইয়া, প্রভু ত্রিবেণী দেঘিল,

www.pathagar.com

গুরু আজ্ঞা পাইয়া তাহা কাশীরামে কইল।
মনেত্তে করিয়া জিম্ব জ্ঞানেত্তে রাখিল,
সৃষ্টি করিবারে প্রভুর মনেতে অহ্ইল।
কেদুরে লইয়া গেল প্রভু ডিম্বুর ভিতর,
বায়ুর জম্ম জল উপরে অহ্ইল সত্তর।
লীলা বলে বটপত্র প্রভু সিরজিল,
সে বটপত্র পেয়ে প্রভু পানিত্তে ভাসিল।
যবে বৃক্ষপত্র ভাসিল জলের উপর,
ধ্যানবলে সিরজিল প্রভু এই ভূমিতল।
বটবৃক্ষ পত্রে প্রভু চিন্দিতে লাগিল,
ডিম্বুর ভিতর প্রভু উর নাহি পাইল।
ভাসিয়া বেড়াইল প্রভু ডিম্বুর ভিতর,
কদকাল ভাসি প্রভু না পাইল থর।
বটবৃক্ষ পত্রে প্রভু ভাসিয়া বেড়ায়,
ডিম্বুর ভিতরে প্রভু থর নাহি পায়।
এই মদে কদকাল ভাসিয়া বেড়াইল,
তবে সৃষ্টি করিবারে তার মনে আইল।
পিথিম্বী সিরজিতে প্রভু মনে কল্য সার,
অহ্ত্ত পত্ত আছে যেথা আনন্দ বাজার।
নাভি মধ্যে উংকার মারি জলমধ্যে দিল,
পিথিম্বী সংসার তঘন ভাঝিয়া উঠিল।
ভাঝিয়া বেড়াইল কিদি ডিম্বুর ভিতর,
কদকাল ভাঝিল তবু না পাইল উর।
থির নয় মেদিনী করে টলমল,
যেখানে পদ দিলে তথায় পড়ে তল।
সুমেরু করিয়া বাহির দেহের আপন,
মেদিনী পূরাইয়া উঠে মূলে যে ত্রিগুণ।
এই মদে কদকাল যদি নির্বাইল,
মূর্ত্তি বানাইতে প্রভু মনে থির কল্য।

(অংশ বিশেষ নেওয়া হয়েছে)

খ. গাথা

১. রাধামন-ধনপুদি পালা

ফুল পারা
চিন-পরিচয়
হে্দে ফোরেল কাদাবন

www.pathagar.com

চিগন ছ্রার পাদাবন
মেনকা পুয়্যবুয়্য রাধামন॥
সাবে বান্ল্যা রঙপুদি
কপুদি ঝিবুয়া ধনপুদি॥
চগদায় কামাল্য থুরকোন
মেনকা কপুদি সদর ভোন।
পুগ' সূর্য পঝিমে গেল্
সাগর দিন বিদি গেল্।
ফুদিলাক খলাত জেদেনা খৈ
গাভুর সুন্দর হ্লাক্কোই
শুল সদরত পলাক্কোই॥

রাধামনরে বামনর গননা
দেবেদা পূজা সালামত
ছ কুরি গিরি আদামত
লেঘা পরি ভনাদন
ঘরে ঘরে গনক্যা বামনে গনাদন॥
ভরা বন্দুক তাক পেলাক
রাধামনরে গনক্যা বামনে
লাক পেলাক।
ভরা বন্দুক তাগদন
রাধামনরে গনকা বামনে গনাদন॥
রবিয়ে ছয় সোমে পন্দর
মঙ্গলে আত্ত্য বুধে সদর
শনিয়ে দচ বিষুবে উনিচ।
গুলা খেইয়্যা কুজুমে-
কিজু গম দেঘা যায় মুজুঙে॥
জাদি পুজাত বিরিদ্দি
ভুরে বানি তিরিচদি
মুজুঙে দেঘা যায়
দাদা রাধামনর গিরিত্তি॥
বেলাত বাজে তাত্তানি
সে কধা শুনি-
আর না রুজে-
দাদা রাধামনর ভাতপানি॥
বনত দগরের বন' পেইক
চিত ন জুরার কনকেইত।

www.pathagar.com

ফুন্দি তুল্য ধুল্যাপুক
ঘুমে না ধরের খাল্যাবুক।
বেল্যা দগরের তিদি পেইক
ভাবনা লাগের নিঝি রেইত॥

রাধামনর ধনপুদি ইধু যানা
পানি ভরি পহ্নত চেই
সেদিন্য বুরাবুরিয়্যা ঘরত নেই।
দৈয়্য মাধাত ঘি তুল্য
বেবেই ধনপুদি কি গল্য।
সিবিদি বাঝেই পানারত-
নেযেইয়ে তার দেবপাচ খাদিয়ান
চানানত॥
পান' লগে সুবারি খায়
এক গেদ' বেইন জুর-
মাত্তে না মাত্তে
তিনগেদা পধকেত্যা রিনি চায়।
দাবা বাঝেই ত দিনে
সমাজ্যা কাররে ন দেনে
বেন' কেত্যা-
মন ন ধরে॥
দৈয়্য মাধাত ঘি তুল্য
সেদিন্য রাধামনে কি গল্য।
কাপ্যা খেঙা কত্ দিল
বাঘ' লেজাত চর দিল
রাধামনে ধনপুদি ঘরকেত্যা
লর দিল॥
বেদে ফিরি কুচ গরি
থবাক আবুজি আগোগাই জুচ গরি॥
বন হ্রিঙে বন খাত্তে
মন' হ্রিঙে মন চাত্তে
বিধু ধনপুদি দাগে-ন-দাগে
কোচ্যা দাদা মন চাত্তে॥
[illegible]দি তালিক্য
কুম্ম কিনি শিলোক্যা
দেলগোই ধনপুদি-
নোনেইয়াদারে আধিক্যা॥

www.pathagar.com

ভরা বন্দুক তাগেত্তে
মাদি বেগেনা ছাগেত্তে
বিধু ধনপুদি
তার নোনেইয়াদারে-
চোগ' ইঝারাদি দাগেত্তো॥
সোর্বুয়া আমিলা করত নেই
ও দাদু!
মামা দাগিয্য ঘরত নেই।
কাবি কুচ্যাল পেরাগি
আয় আয় কোচ্যাদাদা বেরাঘি॥
হে্দে ফুরেল কাদাবন
চিগন ছরার পাদাবন
উদং ন উদং বাজিবুজি
গরা ধোল্য লাঙ্যাদাদা রাধামন॥
বন' হ্রিঙে বন খাত্তে
মন হ্রিঙে মন চাত্তে
ধনপুদি কৈজালী গরে ন গরে
কোচ্যা দাদা মন চাত্তো॥
উগুন মারি পৈঝালি
খারা খোইয়া বিঝালি
গরের ধন্নয্যু কোচ্যাদারে কৈজালি॥
দুবা কাবি ভিরাচ্যে
ও দাদু!
কেইয়া কালা ভিলি-
ত' গুরা বোন্নরে ঘিনাচ্যো॥
পিলা কালি ধলে যায়
জনম কালা মলে যায়।
বনত দগরে কেতকেত্যা
দাবু তুলি খ্যাং পেচ্যা
ও দাদু!
সবায় ফিরিন ন-চাচ্ক্যা মরকেত্যা॥
শন' শানি পেজারে
বুঝিলুং দা-
ভারী আগচ তুই ম' উবর বেজারে॥
জুবুক গাজর ক' বদা
ছরাত দিলুং চেই-গধা
ও দাদু!

www.pathagar.com

কাত্তুন শুনিলে কি কধা?
থেঙা মাধাত রাঙি-ক
কাত্তুন কি কধা শুনিলে ভাঙি ক'।
ঝারত দগরে ঝার' বাঘ
দরি পাগেই ঘন পাক
ও দাদু! কি গল্যে তুই
ম' উব্ব মন' রাগ॥
সুলি সুলি পোই পাদং
বেজার হ্ইয়চ কোই পারং।
ইঝা মিঝেই তোত্তয়া শাগত
সেদিন্যা যিয়ং কুয়া-গাঙত।
চিগন দরি পাগেইয়ং
সেদিন্যা দাদুরে-
চোগ' ইঝারাদি দাগেয্যং।
এত্তে এক থাবর-
যাদে এক থাবর-
দি-যেইয়ং।
মন' দুকখান মনত দ্যুং
জুর' পানি কুম্ম-
ধাগত বাঝেই দ্যুং।
বনত দগরের কেতকেত্যা-
ও দাদু!
সবায় ফিরি ন' চেলেদে মরকেত্যা॥
উগুন মারি পৈঝালি-
খারা খোইয়া বিঝালি
থরি না পাল্য রাধামনে
নোনেইয়্যা বোন্নর কৈজালি॥
চিগন ছরা পাদাবন
কিনি সুবারি আধাপন
ধনপুদি ঘরত উদেরলোই
কোচ্যা দাদা রাধামন॥
লাঘা কানিলই ঘি ছাগি
ও বিধু! ও চিত্তি! ও পরানবী!
তরে বেজার হোদুং কি লাগি।
বেদে ফিরি কুচ গরি
বঝেরলোই রাধামন
ধনপুদি ধাগত জুচ গরি॥

www.pathagar.com

হে্দে ফুরেল কাদাবন
বাজিবুজি গরা ধোল্ল্যে রাধামন।
পান' লগে সিবিদি
সপ্পানে গরের বিঁগিদি।
দেবেদা-পুজা সিক্কারি
সপ্পানে গরের দিদ্দারি।
উন্দুরে কামাল্য- নলকাজি
হাক্কে তানি দের রদংবাচ
হাক্কে তানি দের ব-কাদি।
পিলাত বাঝেই সিলোনান
থেঙর বুজ্যা আঙুল্লোই
কোজেই দ্যা ধোল্ল্যে-
বিধু ধনপুদির পিনোনান॥
সিদা মারি কেইম তুলং
তোচ্যা না লাগেচ ও দাদু
বেইন বুনং।
আলু কুরি কামাত্তুন
নিত্য অকধা শুনেবে মামাত্তুন॥
বেদে ফিরি কুচ গরি
থগোই ও বিধু
বেইন সুদা কাম জুচ গরি॥
উগুন মারি পৈঝালি-
খারা খোইয়া বিঝালি
ধরি ন পাল্য বিধু ধনপুদি
কোচ্যাদাদার কৈজালি॥
ভরা বন্দুক তাক পেলে
এঝান সঙ্গি লাক্ পেলে
দৈয়্য মাধাত ঘি উত্ত
বেইন সুদা কাম কি গত্ত
ধানে কুজি কুচ ঝাদি
থলগোই ধনপুদি বেইনখাদি
আমে বোলেল ফাগুনত
থলগোই ধনপুদি-
তার দেবপাচ খাদিয়ান তেগেনত
গবা মাধাত তা বানা
ফুনিত দিলুং দাবানা
তুলের রাধামন মনত্তুন

www.pathagar.com

কদ কথা ভাবনা॥
সোর্বুয়া আমিলা করত নেই-
মুঝি দাগিয়্য ঘরত নেই।
ধরি খেলুং গাঙ ইজা
সর্ব দিন্ন ত' চিদা
কলা লাগেই হ্জারত-
সমাজ্যা যিয়ন বাজারত।
সুবারি কাবি খানে খান-
নিঘাল্যান কথানি নানাঘান।
আনিল ফাগুনে পেগোগান
একগেদা কথা কদে ন কদে-
তিনগেদা পথকেত্যা রিনি চান
বাচ্চুন কাবি তং গরি
কানে কানে ফং গরি।
নিঘাল্যান কথানি-
দুলু বাঝ' বিজনে
কদন কথানি দ্বিজনে।
চিগন ছরার কাবং ন
আগা চুচ্যাং যাবং প
চেই চেই গুরাভোন!
মন' কথানি ভাঙি ক
কারে লবে ভাঙি ক॥
গুল খেইয়া মুজুঙে
কারলই ঘর ধরিবে মুজুঙে।
আগা খেইয়া কপিদা
দিন্ন হলে ম' চিদা
রেত্তুয়া গরং ত' চিদা॥
জুম' লেজাত রেগোচকো
মরে ছারি না যেইচ বো।
ভুরে বানি তিরিচদি
তরলই যদি ধরি পারং গিরিত্তি
দোর্জ্যা কূলত বর ফেনা
সেক্কে পুরেম মর কেনা॥
দরি পাগেই ঘন গিত্যা
রেঝম কিনি রঙ পোত্যা
মুয়ান ফিরা ও বিধু মরকেত্যা!
বাচ্চুন কাবি গুচ্যাত্তে

www.pathagar.com

তা-গুরা ভোন্নরে পুচ্যাত্তো॥
খবঙ' কাবর মাধাত লং
আয় আয় গুরাভোন করত লং
গুলা গুলা ফুল সুদা
আজুরি বানি দ্য চুলচুধা।
সুবারি কাবি পানে খান
নোনেইয়া গরের নানাগান।
নুন' চুমা তেনেইয়ে-
শরীল জুরে দের নোনেইয়ে॥
ফুন্দি তুল্যা ধুল্যাপুক
খাদিত কি লোইয়চ-
ও বিধু ফুল্যাবুক?
হোইয়া বাচ্চুয়া সাজাঙ্গে
সেয়ান্য ন গরিচ ও দাদু!
লাজাঙ্গে॥
ছরমা কুরা ছ চরার
ধোল্যে বুগত গুরগুরায়।
গাঙত কাবি ধবল-ছাগি
থইয়্যং মধু তর লাগি।
দারু বাদি আদারে
ইচ্যা ছারি দিদুং নয় দাদারে॥
গাঙর কূল গাঙ জুবা
কি দি বানেলে রান জুরা।
পাদাত তলে খোচ্য বেঙ
ও বিধু তর ধবল দাবানাত
তুলং তেঙ॥
ভাদে রানি সরাঙ্গে-
সেয়ান্যা ন গরিচ ও দাদু!
ভারী গরিনে লাজাঙ্গে
মানজ্যে বন্নাম গরিবাক দরাঙ্গে।
কালি কুচ্যাল পেরাং স্যা
যদি রেদেবিলি বেরাং স্যা
পিধা দুগি সিঝেবাক
সমাজ্যা লগে রিঝেবাক।
কাম্মুয়া কুমত ধাগনি-
দিবাক গুত্তুরে ভাঙনি॥
চাল' রাকসা বেদ' বান

www.pathagar.com

নয়দে কধানি শত্তুরর
হ্য়দে সান॥
বচ্চিত বাঝেই ইঝা মাচ
কবাক শুত্তুরে মিঝা ভাচ।
বিন্যা রানি বিন্যা খেই
শত্তুরত্তুন হ্ঝে খেইচ॥
ভূইয়ত বেরাদন তিদিশাল
গায়গায় ন বেরেচ রেদেব্যাল।
দেবা কালা উত্তরে
মিঝা মাদিবাক শুত্তুরে॥
চগদায় কামাল্য থূরকোন
এক্কান কথা শুন্যং-
বেজার ন হোচ গুরাভোন,
চিল' লঘে শিগিরা
শুন্যং কধানি ইত্তিল্যা।
ভাদে রানি সরাঙ্গে-
বেজার গরচ ভিলি দরাঙ্গে॥
খেঙা মাধাত রাঙি ক
কাত্তুন কি কধা শুনিলে
ও দাদু ভাঙি ক।
কালা ভুরে ভাদত্তুন
চিত ন' পুরের কারত্তুন।
উরের পক্ষী খঞ্জনে
তুই দয়া না গোল্লে,
দয়া গরিব কোনজনে॥
তানি কাক্যা চরত্তুন
খেলি ন ফেলেচ ও দাদু! করত্তুন।
ঘচ্যা কাবি কুর গরি
খেলি ন' দিচ দুর গরি।
মঘ' বাঝি পিদলে
পরানে ন' মারিচ ক' শালে।
খেঙা মাধাত রাঙি ক
কাত্তুন কি কধা শুনিলে ভাঙি ক॥
ভাদে রানি সরাঙ্গে-
বেজার গরিবে ও বিধু দরাঙ্গে।
চাজা খুদি তক্ তক্ তক্
মোনঘরত উভা থক

www.pathagar.com

নিজ' পারার গাভুর লক
ভিন পারার গাভুর লক।
চালে বানি চিগন শন
ইধকুন সমাজ্যামায় ও বিধু!
তর কারে মন॥
জাদি পূজাত বিরিদ্দি
ভুলে বানি তিরিদ্দি
নিলবী ভোন্ন লই নিলংধনে
ধরিব ইন্ডিল্যা গিরিত্তি।
তল্লোই মল্লোই ও বিধু?
ধরিব কমলে গিরিত্তি॥
তেঙা ভাঙি ন কিনং
কাম করচ ন' শিগং
বেইন সুদা কাম ন জানং
তুবি নলি ন চুজং
ও দাদু একপিলে ভাত ন জিনং॥
দৈয্য মাধাত ঘি উত্তে-
কালা মিলা কি গত্তে।
গাব্‌দ্যা মাদল বেদে নয়
লোম লোম কলেয্য লদে নয়॥
পিধা দুগি থইয়চ নে
দেগচনে গুরাবোন দেগচ নে।
পার্বুয়া বাজর বর ধুরুক
দিনদিন কেঝান হর দেচমুলক।
পেক্কু যা দগরের চিং চিং চিং
মাবাবে' পালেব কবুয়া দিন।
যদি গিরিত্তি গরচ ও বিধু!
নেগে পালেব চিরদিন॥
বুন্য গাবুরে কুরাঘর
মাবাব' ঘরত বুহ্ র' হ্‌র।
দিন যার খেন্ যার কাল যার
ধরম যার করম যার কাল যার?
ঘরে বানি তুলি খাম-
কয়দিন গরিদে মাবাব'র ঘরত
ও বিধু গাভুর কাম॥
ছরা উজদে তেক গুনন
তমা মিলা জাদে ও বিধু

www.pathagar.com

কুম ন' জিনদে নেক জিননা॥
গাঝর বান্দরে কর খাদন
বিধুরে ভিন পারাল্যায় বো চাদন
পাদা কাবি তিন তারা
মাবাবে বো দেদন ভিনপারা।
চেলা মোঝে থ দিবাক
সোর্বুয়া উদিলে বো দিবাক।
মোচ্চুয়া কাবি বর চেলা
ঘিনে খেদুং নয় তর মেলা।
পাদা কাবি তিন তারা
নিজর আদাম্যা ভেইলক থাগদে
কিঙিরি বো যেবে তুই ভিনপারা॥
দৈয়্য মাধাত তুলং ঘি
দেদন মাবাবে গোত্তুং কি।
শুগররে দেদোক কুগুররে দেদোক
দিলে মাবাবে গোত্তুং কি॥
লাঘা চালোনদোই পুজং তুচ
দেদন মাবাবে মর কি দুচ॥
মিদিঙ্যা বাজর ফুনি চাগোই
সেক্কে কধক কোলুং ও দাদু
মান্‌জ্যে কিঅই ন চাদে
বো চাগোই॥
রাঙা খাদি সাদাঙত-
এঝ আঘং আদামত।
পানি খেলুং তবালই
এঝ দাদু বো চাগোই।
বান্যা দগানত ধন আঘে
ফলে বুজিলুং ও বিধু!
ভিন পারাত বো যেবার
তর মন আঘে॥
পিধা দুগি তেকচনে
ও বিধু তর সেই জামেইবুয়ারে
জীংকানিত কোনদিন দেখ্যচনে॥
কুমর' দগানত কিনং কা
ও পরান্যা চিগোনদা।
ঝুবুক গাঝর ক' বদ।
কাত্তুন শুন্যচ কি কধা।

www.pathagar.com

উরের পক্ষী খঞ্জনে
তুই ভাঙি ন কলে
ভাঙি কবদে কোনজনে॥
পাদা কাবি তিন তারা
আদাম্যা ভেইউন গম হলে
কন্যা বো নিদ মে ভিনপারা॥
ইজর' মাধাত পানি কুম
তুমি গম হলে-
কন্না খেদগোই তমার ধরা জুম॥
ভণ্ডরায় খেল পণ্ডিফুল
কি হালে তরিবং বুদ্ধি তুল॥
ঝুবুক গাঝর ক' বদা
যদি ধরচ ম কধা
গুলি গুলি পোই পাদং
চিদা ন' গরিচ মুই আঘং।
লাঘা কানিলই ঘি ছাগি
তরে রাগেই ন পাল্যে-
মরত হ্লংগে কি লাগি॥

আদিচরন কধা'

কলা লগেই হাজারত
একগেদা নিলংধন ভেইবুয়্যলোই
যিয়েই আমি বাজারত।
ভরা বন্দুক তাক পেলুং
আদিচরনরে লাক পেলং।
রাঙা খাদি সাদগুত
সেদিন্যা আদিচরনে যিয়ে
এক মন সুদালই বাজারত॥
চিগোন মরিজা না তানে
এক মন সুদা কয় তেঙালই বেজে
ভলা আদিচরনে ন জানে॥
ভরা বন্দুক তাগদন
বেআরিয়ে তারে দেগি-
ভুলত ফেলেবাত্যে দাগদন॥
পিলাত ধাগি সরগান
কিনিলাক ভুলেই নানাআন।
ভাঙ্যা শামুক কেজিল'

www.pathagar.com

এক মন সুদা ছ-পয়জেদি বেজিল॥
তুল্যন বাজারত দৈ পিলা।
তিন্ন পয়ঝেদি
কিনি ললগোই খৈমলা।
আর তিন্ন পয়ঝা
ধুদি গুচ্চত রাগেল
সেনে আদিচরন হ্যারেল।
ইঝর মাধাত ধাগনি
কলে কধানি ও গুরাভোন
ভাগুনী॥
দারু তুলি সাবুর্য়া গাছ
পিন্যে ধুদিয়ান পিঝে মুজুণ্ডে
বার' গেইত!
পুগে পঝিমে লাগুেল্লুয়্য
বেঙাকঙা কাণ্ডেল্লুয়্য
ছরাছরি রেগা বায়
পিজুম ধরি এগা বাই
ম্বিরান' ছেরেদি চেলে
রামমোন সীতামোন দেঘা যায়॥
কালি কুচ্যাল পেরাস্তে
চদর হ্ই হ্যাদে বাজারে রেরাস্তো॥
লাণ্ডেল দিয়ালী খজাগাছ
ম্বিকানভুন নিঘিলের পজাবাচ।
চালোন পানি ঘনেয়ায়-
সেনে ঘুম যেবার লক্কে
জাগা ন দুয়্যন সমাজ্যায়॥
সিবিদি বাঝেই পানানত
সমাজ্যা লগে পিঝরত থেলে
তে থায়গোইদে চানানত॥
মাদি বেঙেনা ঝুল হইয়ে
একগেদা তারার জুমলেজা ছরানত।
কাঙারা তগাদে কি হ্ইয়ে
পাগানা ধানশিঝা কয় চিনে
তা সদর ভোনুনরে ন চিনে।
তেঙা ভাণ্ডি পয়ঝা লর
ও তোনকক ইয়ান কা' জুম
পুঝর লর॥

www.pathagar.com

ভাঙ্যা শামুক কুত্ত্যন্দে
দাদার কি হ্োইয়ে কই
তা ভোনলগে হাজ্ত্যন্দে॥
বেদে ফিরি চাঝি দ্যন
গলি গলি হাঝি দ্যন।
পান লগে কচ্চানে
গজ্জং ভুইয়ত
ফর্বা গুইয়্য সান গরি
নিত্য ধোচ্চে ফার বেরেইনে
ফারাঙি রাজা দচ্ছানে॥
পান' লগে কচ্চানি
বারবুয়্য মক্যাবরালই ঘঝিলেয়্য
তার ঈল ন হয় ভেলে খাচ্ছুনি॥
বারা পুজি তিন কুলা
সেয়ান্যা জামেইলই
থাক্কোই সারা বঝরবুয়্য।
গিরিস্তি হ্দ নয় দিনমুলা॥
ঝিদিঙ্যা বাজর খেংগরং
ত' চোগ মুজুঙে
নাত্দি মলেগোই গম দেগং॥
দৈয়্য মাধাত ঘি তুল্ল্যন
দেদন মাবাবে কি গোত্তুং
ভঙরায় খেল পত্তিফুল
কেনে তরিবং বুদ্ধি তুল॥
ভুইয়ত বেরাদন জুনিঝাক
কইদুয়্যং কধানি শুনি থাক
গাঝ' বান্দরে কর খেবাক
যগন মদ বদল তুলি-
বো চেবাক।
গদা পারাল্যা কুরেবাক
আদাম্যা বুরাবুরিয়ে থুবেবাক
ধরাবান্ধা ধরিবাক।
তেল শিঝিরি তাঙেনেই
পুরান পিনোন পিনিনেই
মু-অ চুলানি
ঝেদাক কেদাক গরিনেই।
ভরা বন্দুক তাগিবে

www.pathagar.com

নিজ' শোরবুয়্যরে
আজু কইনে দাগিবে
কাবি খেলুং ধবল ছাগি
ও আজু মরে বো চর
তুই কার লাগি।
চিগন পিজি বের ন খায়
ও আজু গর্বা কুদুম সাং না খায়।
মরা গাঝত সেরোখোল
লাথ্যেই ফেলে দিচ
মদ' পোইয়ত্তুন নারিকুল॥
বেদে ফিরি কুচ গরি
ঘরত্তুন লামি যেইচ জুচ গরি॥
ছরা কুরে পাদং জাণ্ডি
নাজন নাত্তুয়া রঞ্জানি
ও দাদু গরং যদি সেঞ্জানি
লোগে সংসারে গরিবাক মে বন্নামি।
জাণ্ডি পাদি ধরং ক
লোগে সংসারে গরিবাক কলংগ।
ম্যা ম্যা দগরে ছাগলে
সেক্কে কবাক ধনপুদিরে ধোর্য্যে
পাগলে॥
বেদে ফিরি চাঝিবাক
লোগে সংসারে হাঝিবাক।
ধমোত দিলুং চারি-দাত্
ও দাদু! আমি হ্ইয়েই মিলাজাত।
গুচ নেই মিলার উচ নেই
উচ নেই মিলার বুঝ নেই।
চিগন মরিজা ন তানি
কধা বাত্তা ন জানি
ভাদে রানি সরাঙ্গে
মানজে বন্নাম গরিবাক দরাঙ্গে॥
তুবি নলি চাঝিলুং
বিধু ! মন' কধানি বুঝিলুং।
বাজার বেরেই মিদা লোচ
ভাঙি ন কোচ তালে কোচ।
বান্যা দগানত ধন আঘে
কলে বুঝিলুং বিধুত্তুন

www.pathagar.com

ভিন পারাত বো যেবার মন আঘে॥
বারা পুজি তিন কুলা
সেয়ান্যা জামেইলই
সারা জনম গিরিত্তি গরলই
গিরিত্তি হ্‌দ নয় দিনমুলা॥
মোরোঙ' মাধাত কানি ধোই
সেক্কে ফিরি এবেগোই রানি হ্‌ই।
উগুন মারি পৈঝালি
এধক গোল্লুং কৈঝালি।
বাজার' মিদা ন খেলে
ভেইয়্য মুয়ান ন চেলে।
মন' দুকখান মনত রোল
ভেইয়্য কৈঝালি পানিত পোল॥
গদা সংসারান বেরেলুং
কদ মানুচ দেগিলুং।
পান' লগে সুবারি খান
ন দেলুং নিঠুর ত' সান॥
রোগোনি পাদা খজা দিক
কাত্তুন পেলে ও বিধু এয়ান্যা
হাবুলাং রাজার কুগি চিত॥
তেঙা ভাঙি কি লোদুং
ও দাদু ম' দুঘ হাল' কধা
কি কোদুং।
ঝারত সমাদে শন চিরি
দেগেই ন পারং ও দাদু
বুক চিরি।
পাদা কাবং তিন তারা
দিলে বো মাবাবে ভিন পারা
দারু তুলি বনত্তুন
পানি খাংগে পহ্‌নত্তুন
দাদুরে কোনদিন পুরি ন ফেলেম
মুই মনত্তুন
শিক্যা তেঙালই ধান কিনিম
ঈদত উদিলে নাঙ গিনিম।
কবারিক পাদা ন দিচ্‌ ধেল্‌
বিঝুম গেলে ন দিচ গেইল্‌।
গচ্যা খলা আমোচ শাক

www.pathagar.com

রানি হ্ই ফিরংগোই বাচ্যেই থাক।
ধুন্দা গম হলে দাদিয়্য গম
মিলা গম হলে রানিয়া গম॥
ভাদ' পিলাত পানি লোই
ফিরি এযংগোই রানি হোই।
ভুরে বানি তিরিচাদি
সেক্কে ধরিবং ও দাদু।
তল্লোই মল্লোই গিরিত্তি॥
বেদে ফিরি চাঝিবাক
যদি ধরং রাণিমিলালই গিরিত্তি
ও বিধু লোগে সংসারে হ্াঝিঝাক।
জাদি পুজাত বিরিদ্দি
গাভুর মিলালই গাভুর মরত
ধরন দ্বিজন গিরিত্তি।
হক্কেং দগরের খাদি-ঝারত
কনদিন শুন্যচনি গাভুর লক্কে
গাভুর মিলা ফেলেইনে
রানিমিলালই গাভুর মরত
ধরন গিরিত্তি সংসারত॥
জুমত ছিদি উভা কোন
সংসারত তুই মর
ইক্কুয়্য গরি গুরাবোন
ললে গাভুরত তরে লোম
তরে ন পেলে থাগুর হোম॥
অঘোর ঝারত বাঘ মারি
তরে ন পেলে
যেমবোই ও বিধু দেশ ছারি॥
দুখ্যা দিনত ন থেবে
ত নোনেইয়্যা ভেইবুয়্যরে
আয় কনদিন ন দেবো॥
পানি ভরি পহ্নত্তুন।
দগরের পেক্কুয়া চিং চিং চিং
পুরি ন ফেলেচ কনদিনা॥
দগরের খেংগরং দিম দিম দিম
দিলে মনান তরে দিম
নিলে জনমত তরে নিম
বেজার ন হোচ কনদিনা॥

www.pathagar.com

রাঙা খাদি কালা পেইল্
কধায় কধায় পুগ' বেলান
পঝিমে গেল্।
বাঝি ভিদিরে মাঝি-মুম
লামিলে জুন' পহ্র ন যেইচ ঘুম।
জুন' পহ্রত ত' ইধু এইম
মরে তোগেচ্চোই বাচ্যেই থেইম॥
ভুরা দার্বুয়া চিরদন
ও বিধু! মুঝি দাগিং মামালই
ঘরকেত্যা ফিরদন॥
বেদে ফিরি কুচ গরি
গেলগোই রাধামন
ঘরকেত্যা জুচ গরি॥

ধনপুদির নাকশাফুল দেখানা
রাঙা খাদিত কালা পেইল্
ছ' কুরি গিরি আদমত
বেল জুর পরি যার
পূব' বেলান পঝিমে গেল্॥
কাপ্যা থেঙ্যা কর দিলাক
মেনকা কপুদি দ্বিবোনে
রান্যাত্তুন লর দিলাক।
রাঙা খাদি সাদাঙত
লুঙিলাক দ্বিবোনে
বেল জুর মাধান আদামত॥
বচ্চিত ধোল্য তুগুরে
ভুগি উদিলাক কুগুরে।
বেদে ফিরি কুচ গরি
ঘরত উধিলাক্কোই জুচ্ গরি॥
বেলাত বাজে তাত্তানি
ও মাধু ধনপুদি!
ঝাদি রানদোই ভাতপানি॥
বাঝি বেইয়া হুরেত তেত্
বিন্যা খেইয়্যা ভাতপানি
পুরে পেত্ ॥
ছুরি তাগল্লোই তোন কুদি
পুল্যাং অজর্য ধল্লগোই

www.pathagar.com

নোনেইয়্যা ঝিবুয়্য ধনপুদি॥
দারু বাদি তালিক্য
দেঘিল দেবনাগচ্ছা ফুল্ল আধিক্যা।
তেঙা ভাঙি পয়ঝা লর
তা মামাত্তুন বিঝার লর।
বেন' ফুল চেই দিবে
ও মামা! এ ফুল' নাঙান কি
কোই দিবো॥
ঘিলা খারাত দ্যাং হ্‌াদু
কপুদি কয়দে কি ফুল কি নাং
মুই-দ ন চিনং ও মাধু।
তাগল জুগাল্য খন্ডলে
মুই-দ ন চিনং গমদোলে।
সিদা দিলুং দুমুরে
এয়ানা্য দোল ফুল
মুইদ ন দেগং মামা উমরে॥
ঘিলা খারাত দ্যান হ্‌াদু
বেল্যা ভাতপানি খেই লোইদেই
ও মাধু!
দারু বাদি আদাত্তুন
কি ফুল কি নাং
পুঝার গরিচ্ছোই দাদাত্তুন॥
দেঘিনে ফুল্ল খুঝিয়ে বায়
মন' তুবোলে নাঝিনে যায়।
লাম্যে রেদোত জুন' পহ্‌র
হ্‌ল ধনপুদির মন-মাত্তল॥
বেলাত বাজের তাত্তানি
খেইদেই লন ভাতপানি
ছালা ঘরর কামানি।
কালি কুচ্যাল পেরাগোই
ও মাধু!
নিলংবী বোন্ন ইধু বেরাংগোই।

রাধামন' ইধু ধনপুদির যানা
ঘরায় দুঙুল্য ময়দানত
লামিল ধনপুদি উদানত
দিবুজ্যা ফুত্যে ঘচ্যাফুল

www.pathagar.com

পিন্যে দ্বিকানত চাম্বাফুল
গুজেয়ে চুলসুদাত-
তাম্মা আন্যে অচিনফুল॥
কবরক ধানে সুয়াত ভাত
নিঘিলের দ্বিকানত্তুন ফুলবাচ॥
বাগ' লেজাত চর দিল
রাধামন' ঘরকেত্যা-
কোচ্যা গাভুরী লর দিল॥
ঘিলা মারি পেলুং তাক
বান্যে ধনপুদি-
তার দেবপান খাদিয়ান
কেইয়া লাক॥
দগরের পেক্কুয়া চিং চিং চিং
মাঘে ফাগুনে ফেল্ল হিম
মানজ্য জীংকানি কোবুয়্য দিন।
বাঝি বেইয়্যা গত্ দিল
গাদ' কাঙারা লর দিল
বিধু ধনপুদি রাধামন ঘরকেত্যা
লাহ্দিয়ালী লর দিল॥
বেরার কাঙারা হ্া-গোচ্যা
ঘর' মুজুঙে পাগোচ্যা।
জালি পাগোচ্যার বলের ঝুপ
বাচ্যে ধনপুদি দেবপাচ খাদিয়ান
জ্বলের বুক॥
হ্ঝিং হ্ঝিং সান গরি
নাজং নাজং পুন গরি
দারু তুলি শিমোজ্যা
হইয়ে ধনপুদি-
অজল কলে অজল নয়
নিজ কলে নিজ নয়
বেচ ধাঙরঅ নয়
বেচ চিগনঅ নয়
হ্ইয়ে ধনপুদি হারকুচ্যা॥
জ্বলের চোগত জুনি রেইত
চিগন গরি ফার' গেইত
কেইয়া রঙান পহ্ন গরি
মাত্তুল মাজ্যা সান গরি

www.pathagar.com

পরী সান্যা দোল গরি
কাপ্যা থেঙা কর দিল
বিধু ধনপুদি দা-রাধামন' ইধু
লর দিল॥
চাজা খুদি তক্ তক্ তক্
মোনঘরত উভা থক্
উধোনে উধোনে বেরাদন
জুন' পোজ্যাত গাভুরলক॥
ছুরি তাগল্লোই তোন কুদি
হ্াঝি মাদেল্লোই ধনপুদি।
ভুগে কুগুরে উভা-মু
গায় গায় রাধামন চুধা-মু।
দগরের এঝরি বন' পেইক
চিত না জুরার কনকেইত।
বন্দুক মারি তাগেত্তে
বিদু ধনপুদি চোগ' ইঝারাদি
দাদা রাধামনরে দাগেত্তো॥
দারু বাদি পিবরে
কল ধনপুদি-
কি হ্ইয়ে দা কি হ্ইয়ে॥
বেনোর তলে বদলা
দাদুরে দেঘং মু' কালা।
শিল্ল ছরার পহ্ন পানি
থাক্কোই কবুয্য দিন মন বানি॥
পিদা দুগি তোগাত্তে
ধনপুদি তার হ্োঝো দাদারে
নোনেইয়্যা গরি বুঝাত্তে।
ফাগুন হ্াবা ফিরিল
জুম' সদরক ফুদিল
ধনপুদি তার দাদারে নাকশা ফুল্ল দেগেল॥
ও দাদু! এ ফুল্ল কি নাং
মরে এক্কানা কই দেনা।
হক্কেং দগরের বন' ঝারত
এ ফুল্ল নাঙান কি সংসারত।
পান' লগে সুবারি লোচ
এ ফুল হ্ইয়ে হ্োচ।
চেলে জনমত তত্তুন পেইম।

www.pathagar.com

পিনেই দিলে মুই পিনিম
গদা জনম্মুয়া নাং গিনিম॥
যোগী কাবর বিঝানি
পিধা দুগি সিজানি
ও গুরাবোন এ ফুল্ল নাং
কি হব বোন কি জানি॥
তাগল জুগাল্য খন্দলে
ন 'দ চিনং এ ফুল্ল মুই গম দোলে॥
দারু বাদি আদাত্তুন
পুঝার গল্লোই আজুত্তুন॥

ধনপুদির চলাবার' ইধু যানা

বদের দরি ঘন পাক
ইজরত বই আজু চলাবাপ।
মনে মনে ভাবি চার
পুরানি দিনুন কুধু যার।
গিরিয়ে কুজিল য়ংমা ধান
যিয়ে কালে ফিরি এদ নয়
পুরনি সান্য দিন মাধান॥
গাবদ্যা মাদল বেদ নয়
গাভুর' দিনুন এধ নয়।
কালা বুরে সোচ গরন
দিন দিন পরি যার বচ্ ধরম।
দারু বাদি তালিক্য
এনকালে দেল ধনপুদিরে
আজু চলাবাপ আধিক্যা॥
আয় আয় নাদিন উত্তি আয়
ইজরত আঘং গায় গায়
জুমত হাদি জাঙালে
কিত্তে নাদিন লুঙিলে।
বারে বাচ্যে জুন' পহ্র
হইয়ে নে নাদিন তর
মন পাগল।
সমাজ্যা বুঝ' ন পত্তে
সেনে বুজ্যারে তগত্তে॥
শিগারী কুগুর চৈ দিবে
ও আজু এ ফুল্ল নাং কি

www.pathagar.com

মে এক্কানা কই দিবে।
বত্যা দরি পাগেল
ধনপুদি আজু চলাবাবরে
নাগেশ্বর ফুল্ল দেগেল॥
বেরত তাঙেই মদ খাপ
হ্যাঝি উধিল চলাবাপ।
মরিজ' পাদা খায় ছাগল
ইবাত্যে তর মন পাগল।
গাভুর মন্দে শিক্কারি-
ঘুম যাগোই যা চুপ গরি
ধোল্য গাঝত করঙা
হাক্কে থান পেবদে চলামা
ফুগুদি কানাদি চেবদে
কবাল পুরেই দিবদে।
মজাঘরত উভা থক
উদান দিয়ালী গাভুরলক।
মিদা গুলি মলা খা
যা যা নাদিন ঘরত যা
গাভুরী বুগত দোলে তাক
উদের ধনপুদির মন' রাগ
ছ কুরি বুজ্যা মাধা জোল্
মরে দেগিনে হ্ইয়োচ ওল্।
কবাল ঘচ্ছোই পাথরত
তল্লোই পোত্তুং পাগলত
গাবদ্য মাদল বেদুং নয়
সালে নাদিন
কি ফুল কি নাং কোদুং নয়॥
উগুন মারি পৈঝালি
গরের ধনপুদি কৈঝালি।
বুজ্যা আজু কোচ পাং
গেল্লে জনমত হোচ্ লাং
হ্য়নে জানচ্ছে ফুল' নাং
জানিলে সালে কদে চাং॥
বত্যা দরি পাগেল
খাব' মদতান গিলিল
চলাবাবে হ্যাঝিল।
ভুইয়ত বেরাদন জুনিঝাক

www.pathagar.com

কইদ্যাং কধানি শুনি থাক।
বেন' তানা তাচ্ছি তুল
এ ফুল' নাং নাকশাফুল॥
থেঙা মাধাত রাঙি ক
এ ফুল্ল কুধু পায় ও আজু
ত' নাদিন্নরে ভাঙিকা॥
মাজ উজান্দে সুরে সুর-
ও নাদিন ও ফুল্ল কায়কুরে নেই
আঘে এ ফুল্ল ভালোকদুর॥
কুমার দগানত পিলাচক
ইধুক্কুন আঘ মিলালক
চাজা খুদি তক্ তক্ তক্
সাগর আঘন গাভুরলক
লামনী কাক্যা শন-চালেই
ন দুয়্যন তমারে মন পালেই।
কাম করচ না জানন
কি ফুল কি নাং ন চিনন।
নোনেয়া গল্লে চেদাক নয়
ও নাদিন-
তারারে চিত ধোই খাবেলেয়্য
তমারে এ ফুল পারি দিদাক নয়॥
হক্কেং দগরের বর্ ধুরত
আঘে নাগেচ্ছর ফুল কোদ্দুরত॥
গীদে গেংগুলী কি গেইয়ে
ও আজু!
নাগেচ্ছর ফুল' নাং ক্যা হইয়ে
দরি পাগাং ঘন' পাক
কইদুয়্যং নাদিন শুনি থাক।
শিক্যা তেঙা খাবুমত
আঘে দেব নাগচ্ছুফুল-
দোর্জ্যা কুলর তাবুমত।
পুরানি দিনত কি হ্ইয়ে
নাগলোগত জন্মেইয়ে
সেনে ন গশা নাং হ্ইয়ে।
ক্ষিরোদ সাগরত যেক্কেনে
দেব দৈত্য মন্থনে।
সাগর' বুগত উত্তে ফেনা

www.pathagar.com

বাসুগী নাগে ধোজ্যে ফনা।
বাসুগী ফেনা ধুব হইয়ে
নাকশা পাওর জোন্মেইয়ে।
বুগর রেনুত অমৃত পোল্
অতুল নাকশা হইয়ে দোল।
পরেদি দেবে হরিলাক
স্বর্গত নাকশা জন্মেলাক।
শোলোক ভাঙি পয়ারে
উরেই আনিল বুয়ারে।
বেন' তানা তাপছি তুল
মত্যত এলাক নাকশাফুল॥
শুনি ধনপুদির মন-পাগল
নাকশা পেবার হোল মাত্তল।
চিলে কুরা সুয়া মাল্য
আজু চলাবাবে কুয়্য ধোল্য।
মোনঘরত উভা থক
তমারে দেইয়্য ন পারন
গাভুরলক।
কেইয়্যাত বাজিলেয়্য চেদাক নয়।
আজা গোল্লেয়্য লদাক নয়
নাকশা পারি কেনদিন দিদাক নয়॥
বীজি খেইয়া খাজুরে
সালাম গর তুই আজুরে।
নিলে দোর্জ্যাত মুই ন নিম
দিলে নাকশা মুই পারি দিম
সিত্তুন এই বেজিম ধান
তল্লোই গরিম চুঙুলাং॥
বিদ্য সুন্দর গমপুদি
সোঝেই উদিল ধনপুদি।
কবাল-পরা বুজ্যাবুয়া
আরি পারা বিজাবুয়া।
সিবা কাবি আদারে
ছরাত যেই মালেইয়া দিচ্ছোই
মাছ কাঙারা ইজারে।
খবঙ' কাবর মাধত বান
সিত্তুন এইনে ও আজু!
হোঝে গরিচ্চোই মালী শুগরলই

www.pathagar.com

বুরা কালর চুঙু লাঙ॥
রাগে ধনপুদি হাঝিল
রাধামনরে তগা লুঙিল।
দাদুরে লাগত পেলগোই
ফুল্ল ধরি কলগোই।

রাধামনরে ধনপুদির ফুল কধা কনা
কুমার দগানত কিনং কা
ও পরান্যা চিগন দা।
বেন' তানা তাচ্ছি তুল
এ ফুল' নাং নাকশাফুল।
সিক্যা তেঙা খারুমত
ফুদন ইউন মেঘনা দোর্জ্যা
তারুমত॥
মঘ' বাঝি পিদলে
তোন' তাবা সিদলে
পারি দিবেগোই নাগচ্ছফুল
ও দাদু তুই কমলে॥
উগুন মারি পৈঝালি
গরা ধোজ্যে
নোনেইয়্যা ভোন্নুয়া কৈজালি॥
ঘিলা খারাত ঘেং ধরি
বাজি না পারের রাধামন
নোনেইয়্যা ভোন্ন-লই ধেং গরি॥
কল শেঝে পরানী
শুনিচ বিধু কধানি।
পানি খেইনেই পহ্নত্তুন
শুন্যং আগে আজুত্তুন।
বিলত চত্তন পাদিহ্যাচ
ভাদ আঝিন গেলেগোই
ফিরি পারিব কাদিমাচ।
বাদোইয়ে কুনেল সুরগীপাল
কাদিমাচ্যা ফিরিবাক বার্গীপাল।
পিলা কিনিবাক কুমারত্তুন
ফিরিবাক বার্গী নানাত্তন।
জুমত উধিল ছাবালা
ফিরিবাক বার্গী হাবালা

www.pathagar.com

হাবালা বার্গী পথ দিব
মাঘত পাদা ঝরিব
ফাগুনত পাদা কর দিব
বারিঝা সোমেই চারেব
মাঘ ফাগুন গেলেগোই
চৈদ' রাঝি কাজেব
বেন' তানা তাপ্ ছি তুল
সেক্কে ফুদিবাক ও বিধু!
ফুলের রাজা নাকশাফুল॥
পেক্কুয়্য দগরের চিং চিং চিং
মাঘে ফাগুনে-
ন দ ফুদন কনদিন॥
লাঘা চালনদই পুজং তুচ
ও দাদু মর!
নাকশাফুল পিনিবার ভজান হ্োচ॥
সুলি সুলি পোই চাঝং
কল রাধামন মুই আঘং।
দিলুং ভাতজরা গঙারে
যেবং ও বিধু সমারে॥
বারিঝা সোমেই চারেব
বিজু দিনুন কাজেব।
ভুরা দার্বুয়া চিরিবাক
সেক্কে নাগচ্ছফুল ফুদিবাক
বেন' তানা তাচ্ছি তুল
সেক্কে পারি দিম ও বিধু
দোর্জ্যা কূলর নাকশাফুল॥
ঝুবুক গাজর কবদা
সালে ধরিবেনি ম' কধা ॥
মঘ' বাঝি পিদলে
উগুধো গোজ্যং ত-কধার
ও দাদু মুই কমলে ॥
দাঙা আগুনে পুরের বন
দেঘে ন পারং পুরের মন।
বাজার' কোদোর খাজা চায়
সেয়ান্য কধা শুনিলে ও বিধু
মর পরানত আঝা থায় ॥
রাজা খাজানা কিত্তি গর

www.pathagar.com

শালে নাকশাফুল পারি দিবে ভিলি
ও দাদু তুই সত্য গর ॥
উরের পক্ষী খঞ্জনে
কাবর ধোইয়্যা বরগাঙে
যদি নাকশাফুল পারি ন দুয়্যং
ও বিধু বেলান ন উধোক মর নাঙে
রেদোত লাম্যে জুন' পহ্‌র
মনর কধা পুঝোর গর
বেন' তানা তাচ্ছি তুল
যদি পারি দুয়্যং নাকশাফুল।
রাজা-খাজানা কিত্তি গর
মে লবে ভিলি সত্য গর॥
বিদ্যা সুন্দর গম পুদি
সত্য গরের ধনপুদি।
উরের পক্ষী রঙ রাঙে-
যদি তরে ন লং-
বেলান ন উধোক মর নাঙে॥
মিদিঙ্যা বাজর বর ধুরুক
পিন্যাং ছরার মোরোংঙুয়্য
সত্য লারেলে ভুগ্‌ গরোক॥
ঝর' পানিয়ে ঘর ভিজে
সত্য ন লারিচ তুই পিঝে
সত্য লারেলে যমে পায়-
ঝারত গেলে বাঘে খায়।
চিগোন ধরি সাপ হব
সত্য লারলে পাপ হব।
রান্যা বেরেলে সাপ দেবে
ভিলি সত্য লারেলে পাপ পেবে।
লুদি চিবাং পুগে খায়
সত্য লারেলে বাঘে খায়।
মাজা খেল মিদুং পুক
চিদা ন গরিচ-
সমারে খেবং গোই একমা-দুধ॥
আগাঝ সারাল্যা হ্‌বংগোই
বার্গী জুর' সান রবংগোই।
অজল গাজত পরিবং
আগাঝে আগাঝে ভঙিবং॥

www.pathagar.com

অজল বৃক্ষ বর ছায়া
বুঝি ন পারি তার মেইয়্যা॥
আরি লগে সেরি লয়
সেয়ান্যা মিলা মুই সবায় নয়।
ঘরে বানি তেঁগেন চাপ
গোল্লং দাদুরে এগেম ভাব।
ঘর' মুজুঙে শাগ' হ্দা
জনম থাককে এক কধা।
দিলুং ভাত জরা গঙারে
থেলে থেবং সমারে
মলে মরিবং সমারে ॥
চোদ' চানে ফেললে পহ্র
সত্য রাগেচ দাদু তর
দোজ্যা কূলত মে নিবে
নাকশা ফুল পারি দিবে।
ফুলর বাঝে মন থবং
জনমে জনমে এক রবং।
ঘুমর বুড়ি লামিলাক-
যা যা ঘরত ফিরিলাক ॥

তোনপাত তগা যানার কধা
দৈয়্য মাধাত ঘি তুল্য
একদিন্যা রাধামনে কি গল্য।
ভরা বন্দুক তাগেত্তে
সঙ্গী সমাজ্যা দাগেত্তে।
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
সঙ্গী সমাজ্যা লুঙিলাক।
লাঘা কানিলই ঘি ছাগি
আমারে দাক্ক্যচ কি লাগি॥
সাঝির তলে জাম পাদি
শুন ভেইলক কান পাদি।
গাবদ্যা মাদল বেদং নে
তোনপাত তগা যেবং নে ॥
গাঙ' কুরে থায়দে ঘাত
কধক থেবং চুদো ভাত।
কুমার দগানত গিলাচক
সমারে নেযেবং মিলালক ॥

www.pathagar.com

চিগন ছরা পাদাবন
সমাজ্যা উজুলার রাধামন॥
হক্কেং দগরের বন ঝারে
যেবং কেল্যা সোমবারে।
দগরের খেংগরং দিম দিম দিম
তেম্মাং গল্যাক পুরাদিন॥
মুলি দুগি গাদালত
বেলান দুবি গেল্ পাদালত ॥
কাবি কুচ্যাল পেরেলাক-
উধনে উধনে গাভুরলক
জুন' পহ্রত বেরা লামিলাক ॥
পেজায় দগরের কুলকুলি
হ্ল ভরন্দি আদামত কলকলি॥
হে্দে ফুরেল কাদাবন
ধনপুদিরে দাগেরলই রাধামন।
গাবদ্যা মাদল বেবে নে
ও বিধু তোনপাত তগা যেবে নে॥
সাঙু বানি ঘ্যাং দগা
যেবং সমাজ্যালই তোন তগা
তোন' তাবা ছিদলে
ও দাদু তোনপাত তগা যর
সঙ্গী সমাজ্যায় কমলে॥
হক্কেং দগরের বন ঝারে
তোনপাত তগা যেবং সোমবারে।
মাদি বেগেনা ছাগিবে
সমাজ্যা যাদে দাগিবে॥
চালোন পানি ঘনাত্যা
রাজার ঘরর গণক্যা
তুইঅ দাগিচ সমাজ্যা
মুইঅ দাগিম সমাজ্যা॥
কাপ্যা থেঙা কর দিল
বাগ' লেজাত চর দিল
ধনপুদি সমাজ্যা-দাগা লর দিল॥
ভরা বন্দুক তাগের লই
মাদি বেগেনা চাগের লই
মেয়্যাবী বোন্নরে দাগের লই
কুঞ্জবী বোন্নরে দাগের লই

www.pathagar.com

উলু পারি পেক্কানত
কুরেলাক মিলালক এক্কানত॥
পান' লগে ছিবিদি
সপ্পানে গত্তন বিগিদি॥
সুবারি কাবি খানে খান
নিঘাল্যান কধানি নানাআন॥
ধানে কাবি তুচ্ তুচ্ তুচ্
কধা নিঘাল্যান জুচ্ জুচ্ জুচ্॥
লাঘা কানিলই ঘি ছাগি
কুঞ্জবী বোন্নুরে পুঝার লর
নিলংবি বোন্নুয়া পুঝার লর
সমাজ্যা দাগিলে কি লাগি ॥
থেঙা মাধাত রাঙি ক
কিত্তে দাগিলে ভাঙি ক ॥
সাঙু বানি ঘ্যাং দগা
সোমবারে যেবাক দাদাদাগী
সঙ্গী সমাজ্যায় তোন তগা।
কুঝি মক্যা সঙরে-
যেবংনি বোনলক সমারে ॥
গাবদ্যা মাদল বেবং-না
কল নিলংবী বেবং-না
কল কুঞ্জবী যেবং-না
বেক্কুনে কলাক যেবং-না ॥
পাঘানা ধানত পেইক পত্তন
গাভুর লগে রেং কাত্তন।
জাদি পুজাত স গত্তন
গাভুরী লগে গপ মাত্তন॥
উপ্তা মাজাত নুন থইয়্যন
বুরোবুরিয়ে ঘুম যেইয়্যন।
জাদি পূজাত স গত্তন
নিঝি হ্গলক দগত্তন।
গাদ' কুদুক্কুয়া খেবার চার
নিঝি রেত্তুয্য বিদি যার।
দৈয় মাধাত তুলং ঘি
পোত্ত্যা রাঝি পল্লগি।
দারু বাদি শঝ্য তেল
পুগদি উধা ধোল্য পুগ' বেল ॥

www.pathagar.com

দাক্কুয়া রাদা দাক্ দিলাক
আদাম্যা পারাল্যা জাগিলাক।
বেলাত বাজে তাত্তানি
বিন্যা খেইদেই ভাতপানি।
দৈয়্য মাধাত ঘি তুল্যাক
নিলংবী ছেয়্যাবী মেয়্যাবী
ফুজুকবী কামেচবী কি গল্যাক।
ঘরায় দুঙুল্য ময়দানত
যেক্কে লামিলাক উধানত।
নাদেই সুদা কাক্ গত্তন
তুবি আঙারা ভাগ গত্তন।
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
বাগ' লেজাত চর দিলাক
নিল' কুবুম বুগিনে
লুদি এক্কান ধরিনে
ধনপুদি ঘরকেত্যা লর দিলাক ॥
দৈয়্য মাধাত ঘি তুল্য
সেদিন্যা ধনপুদি কি গল্য।
গুলা খেইয়্যা চামোনি
খেইদেই লইনে ভাতপানি।
আলু কুরি কামাত্তুন
বিদায় মাগের মামাত্তুন।
গাবদ্যা মাদল বেবংনে
ও মাধু দাদাদাগী লগে
তোনপাত তগা যেবংনে ॥
দৈয়্য মাধাত্তুন ঘি লল
কপুদি ঝিবরে কি কল।
চগদায় কামাল্য ঘেরে আম
ছারি পাত্তুং নয়
পরি আঘে সাগর ঘর'কাম ॥
আমে বোলেল ফাগুনত
কমলে বাঝেইয়্যা খাদিয়ান
ফেলেই থইয়চ এঝ তেগেনত।
গোল্য থাগুরে ছাদি দান
কমলে বাঝেইয়চ খাদিয়ান।
জুমান পুরি গেল মোনধুরে
কক্কে কামেরেই দুয়্যন উন্দুরে ॥

www.pathagar.com

ছ মাচ বারিঝা পান-বরত
সবায় ন গরচ কামকরচ
গাবুরে বুনন জুর বারেং
সমাজ্যা লগে খাদি পিনোনে
ভোরেই ফেল্ল্যন ফুলবারেং ॥
ধুল' শব্দ দঙরে
কুঝি মক্যা সঙরে
কাবিবে খাদিয়ান কমলে
সুদো কাবিবে কমলে॥
এঝরি দগরের বনপেইক
ইরি দিদুং নয় কনকেইত॥
ছ মাচ বারিঝার পান-বরত
ধুংধাং গরি পিলা আঝেরেই
গরা ধল্য ধনপুদি কামকরচ ॥
চিগন মরিজা তানেত্তে
অগধা শুনি কানেত্তে ॥
সিবিদি বাঝেই পানানত
চন্দন গাজর চর্কাবুয়্য
নিঘাল্যা বিধু চানানত ॥
পার্বুয়া নিলে বুনং ফুর
ঘুরার চর্কা গুর গুর গুর ॥
চোগ' পানিয়ে ধারা বায়
পধর কিত্যা রিনি চায়।
সমাজ্যা এত্তন নি রিনি চায়।
চালোন পানি ঘনাত্ত্যা
হাক্কে এবাক সমাজ্যা।
ধুন্দা ভুইয়ত রেইশাগে
পধকেত্যা চেই আঘে॥
ঘরায় দুঙুল্য ময়দানত
সমাজ্যা লুঙিলাক উধানত।
ভরা বন্দুক তাগদন
তারে দেগি দাগদন॥
দৈয়্য মাধাত ঘি হল
বিধু ধনপুদি কি কল।
আলু কুরি বর কামা
ইরি ন দের মর মামা।
দরি বদি ঘন' পাক

www.pathagar.com

ইরি ন দের কন পাক।
লাঘা কানিলই ঘি ছাগং
ইরি ন দের কি গরং॥
বেদে ফিরি কুচ গরি
রাধামন' বোনুয়্য নিলংবী
কুবুম বোঝেলগই-
মুঝি ঘরত জুচ গরি॥
কুমার দগানত পিলাচক
ধনপুদি ঘরত উদিলাক মিলালক॥
তেঙা ভাঙি পয়ঝা লর
লাঘা কানিলই ঘি ছাগি
ইরি না দ্যার ধনুয়ারে কি লাগি॥
চাজা খুদি তক্ তক্ তক্
মোন ঘরত উভা থক
কধা কদন মিলালক।
কিও দাগন পিঝেই
কিও কদন জেদেই
কিও কদন মুঝি-
ইরি ন দুয়্যর কিলাগি॥
চগদায় কামাল্য ঘেরে আম
ছারি পাত্তুং নয় ঘরকাম।
বাঝিত দিলুং মাঝিমুম
ইজর' মাধাত
ধুপ ধুপ গরি গোচ্যেই আঘন
তার কানজাবা শিরা পানিকুম ॥
আমে বোলেল ফাগুনত
ন বুনি থইয়ে তার মরার খাদিয়ান
গুধি ভিদিরে তেগেনত ॥
এঝরি দগরের বনপেইক
ইরি দিদুং নয় কনকেইত ॥
উগুন মারি পৈঝালি
গরের নিলংবী কৈঝালি।
পার্বুয়া বাঝে সেনসেনায়
নিলংবী বোনে তেনতেনায়॥
চগদায় কামাল্য ঘেরে আম
তোনপাত তোগেই ফিল্লেগোই-
আমিয়্য বল দিবং ঘরকাম ॥

www.pathagar.com

নুন' চুমো তেনেয়ে-
নিলংবী কল' নোনেয়ে।
বাঝিত দিলুং মাঝি-মুম
সিত্তুন এলেগোই-
আমিয়্য তুলা বল দিবং পানি-কুম ॥
গাবদ্যা মাদল বেলেগোই
তোনপাত তোগেই পেলেগোই।
সেক্কে স্যা মুঝি-
বগরা মুয়ানদোই খেবেগোই॥
দরি বদি পাগেবে
বগরা মুয়ানদই চাবেবে॥
উগুন মারি পৈঝালি
খারা খোইয়্যা বিঝালি
থরি ন পাল্য কপুদি মুঝি
নিলংবী ঝিবর কৈঝালি ॥
খেল হ্রিঙে চ বিজি-
কল কপুদি য ভিলি।
চরন্দি ঘরা চরগোই-
যিধু ভঙিমা ভঙগোই॥
দৈয়্য মাধাত ঘি তুল্য
ফাল্যেই ধনপুদি কি গল্য।
কাল্লোং লদে পুল্যাং লর-
লুদি এক্কান ধরিনেই
নিল' কুবুম্মুয়্য বুগিনেই
ঘরায় দুঙুল্য ময়দানত
ফাল্যেই লামিল উধোনত ॥
দিবুজ্যা ফুদিল ঘোচ্যাফুল।
কানত পিন্ন্যন চাম্বাফুল।
কবরক ধানর খুদ ভাত-
নিঘিলের কানত্তুন ফুলবাচ ॥
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
বাগ' লেজাত চর দিলাক।
লাহ্‌রে লাহ্‌রে কধায় কধায়
মিলা লগে লর দিলাক॥
সুবারি কাবি খানে খান
কধা নিঘাল্যন নানা ঘান!
জাদি পুজাত চোজ্যন্দে-

www.pathagar.com

পিন্যাং ছরাত পোজ্যন্দে॥
বেদে ফিরি কুচ গরি
পুল্যাং বোঝেলাক জুচ গরি।
ছুরি তাগল্লোই তোন কুদি
কধা নিঘাল্যে ধনপুদি।
পানে খেইয়া সিবিদি
সপ্পানে গরের বিগিদি ॥
ধাবা চঙরা তিক্ কাত্তন
গাভুরী লগে শিক কাত্তন।
পারত বইনে পেইক চাদন
খাদি মেলি পান খাদন।
দাবু বাদি সাবপিত্
পিন্যাং ছরার দেনকুলে বাংকুলে
ফেলাদন মিলালক পানবিত ॥
দাঙা পরা শন খলা
বাহ্রা পুজি তিন কূলা
কাপ্যা সুবারী খেইদেই ললাক
দিনমুলা॥
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
সেপরে লাহ্রে লাহ্রে-
গাভুরী লগে লর দিলাক॥
সিলুম সিলেই চিগোন সুঝে
এত্তন গাভুরলক খ্যাং সুঝে
ধর্ম্ম থাগুরে চিং দেদন
এত্তন গাভুরলক রেং দেদন।
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
গাভুরী লগে রেং দিলাক।
গাভুরী লগে রেং দিলাক।
হোইয়া বাচ্চুয়া সাজেইয়ন
অদ্দেক পধত বাচ্যেইয়ন॥
সুবারি কাবি পানে খান
নাগর মাদা ধোল্য ধনপুদি।
নানাঘান।
চাজা খুদি তক্ তক্ তক্
হাক্কে লুঙিবাক গাভুরলক।
চিক চিক দগরের চিল- ছ
নিত্য শুনা যায় রেঙ'- র।

www.pathagar.com

তুবি নলি চুঝনে-
শুনলে রেঙ'-র বুঝনে।
ধাবা চাঙরা তাক্ পেলাক
আদ্দেক পধত গাভুরলগে
গাভুর মিলাউন লাক পেলাক॥
নাধেং কাবি ঘুরাদন
গাভুর লগে জিরাদন।
বান্দর দগরের খল্যাঙর
বোচ্যন গাভরলগে থেং-বাঙর॥
দারু বাদি আদাত্তুন
কল ধনপুদি এক্কান কধা
পুঝার গোত্তুং দাদাত্তুন।
দিলুং ভাতজরা গঙারে
যেদং নে দাদু সমারে ॥
ভাদ' লগে দৈ খেবং
সমারে ন গেলে ভাগ হ্বং।
থেঙা মাধাত রাঙি-ক
চেই চেই ও দাদু!
মন কধা ভাঙি ক ॥
কিনি সুবারী আধাপন
শুনি কল রাধামন।
ছরাছরি ইজনে দুলুবাঝ' বিজনে
তুমি যেবা দ্বিজনে আমি যেবং দ্বিজনে
ভরা বন্দুক তাক লবং
দ্বিজন দ্বিজন ভাগ হবং॥
ঘরত দিলুং মাঝি-বের
এ কধা শুনি বিধু ধনপুদি
তার অজলাঙ্যা দাদারে
হোঝো পানখিলিবুয়া জাজি দের॥
জুন' পহ্রত চান চাগোই
আয় আয় দাদু বিঝি দুয়্যং
ম-হাদে তুই পান খাগোই॥
ছরাছরি বিল হব-
তা হ্াদ পান খিলি খেলে
ও বিধু মর ঈল হব॥
ধুন্দা পাদা কুদদন
ধনপুদি কান্দ দেই

www.pathagar.com

গাভুরীলগে গলিগলি হাঝদন ॥
কাম্মুয়া কুমত ধাগনি
হে্তুয়া মারি মাগনি
যাদন বেগে পিন্যাংছরার লামনি ॥
পান' লগে সিবিদি
গরের রাধামন বিগিদি।
দিঘলী বাগত্তুন শামুক তুল
ভিজের পিনোন কোজেই তুল ॥
ধুমত দিলুং চারি-দাত্
তুমি অইয়্য মরত জাত
আমি অইয়্যেই মিলাজাত।
হোইয়া পাদি সাজাঙ্গে
সেন্যা গরিবার ও দাদু!
লাজাঙ্গে ॥
গুচ নেই মিলার উচ নেই
উচ নেই মিলার বুচ নেই
ঘিলা পারি হাজ পেচ্
উচ নেই মিলার লাজঅ বেচ ॥
বদা খলা চিন্দা বাচ
সঙ্গী সমাজ্যা কারে লাচ।
লাঘা কানিলই ঘি ছাগি
সমাজ্যা হলং সালে কি লাগি॥
উরের পক্ষী মেঘকোই সং
সঙ্গী সমাজ্যা বেক্কুন সং।
পেক্কুয়্য পাল্য ধুপ বদা।
গাভুর' লক্কে এক কধা।
হ্‌ল্যা কুনেদি রাঙা মেঘ
কেইয়্যা ফারক্কে পরান এক ॥
ও বিধু! গাভুর মিলাত্যে
হ্ইয়ন গাভুর মদ্দে
আধা লাঙ্যা আধা নেক ॥
পিলাত বাঝেই সিলোনান
একধা শুনি বিধু ধনপুদি
কোজেই তুলা ধল্য
রান সং তার পিনোনান ॥
শামুক পুরি সিবিদি গর
লল্ল পানিত রান' পহ্‌র।

www.pathagar.com

বাচ্ছুরি এরেই গাঙকুলে
ইরি দিলুং চাং ফুলে
লামের পানি রান-ধ্বলে॥
দগা দাবা চুন ঘর
পোজ্যে রানছাবা রঙ জুন'র পহ্র॥
পানদই খায়দে সিবিদি
গরের রাধামন বিগিদি।
গাঙত চরে ইজাবুয়া
কি দি বানেলে রানজরাবুয়া॥
চিবিত গাঝত রঙরাঙ'- খুল
জুর পরি গেল বরগাঙ কুল।
দোজ্যা কুলত বর ফেনা
কমলে পুরেবে মর কেনা।
মুলি দুগি বর পাদা।
কমলে হবে বর বাদা
হোইয়া বাচ্চুয়া সাজাঙ্গে
সেয়ান্যা ন কোচ ও দাদু!

লাজাক্তো ॥

শিল' কাঙারা দার ধরে
বলে ধত্তুং লাজ গরে॥
কলা লাগেই হ্াজারত
লুঙিলাক পিন্যাংছরার দোঝরত।
নলি তুবি চুঝনি
যাদন সে পরে
য়ংগমা-ছরা উজানি॥
লুই-এ মাচ্ছুন তগাদন
মাদি বেগেনা ছাগদন
ধিমাতিদা উগুরাদন
গাঙকুল্যা শাক ভাঙদন
কাত্তোল ধিঙি তগাদন
বাতবাত্যা শাক ভাঙদন॥
কাবি কুচ্যাল পেরাদন
য়ংগমা ছরার দেনকূলে বাঙকূলে
দ্বিজন দ্বিজন বেরাদন ॥
জাদি পূজাত উত্ত্যদি
য়ংগমা ছরার তান্নুমত
শোল্যা ফুলুন ফুত্ত্যন্দি॥

www.pathagar.com

বেন' তানা তাপ্ ছি তুল
মেঘনা দোজ্যার তান্নুমত
ফুত্ত্যন সেক্কে নাকশাফুল।
দেবা কালা ঝর আনে
নাকশাফুল বাচ বোই আনে॥
শোলোক ভাঙং পয়ারে
সে ফুল' পাউর-
নিত্য উরের বুইয়ারে॥
জাদি পূজাত চৈজ্যন্দে
কিজু মেঘনা সাগরত
কিছু দোজ্যকূল তান্নুমত
কিছু য়্যংগমা ছরানত পোজ্যন্দে ॥
দান্নু বাদি তালিক্য
উদিল দেবনাগচ্ছ ফুল ইক্কুয়্য
বিধু ধনপুদির লুইয়ানত আধিক্যা॥
গীদ' লগে রেং কারে
দেঘি ধনপুদির লুব বারে॥
রেণু চুমি ফুলত্তুন
পুঝার গল্য দাদাত্তুন।
নুন চুমা তেনেয়ে
ইবে নিচ্ছয় দেবনাকশাফুল
কল ধনপুদি নোনেয়ে ॥
শিগারী কুগুর চৈ দিবে
ইচ্যা নিচ্ছয় দেবনাকশাফুল
লই দিবে ॥
হোঝে ফুলুন চুলত পিনিম
জন্মম্মুয়া তরে নাং ঘিনিম ॥
কলা লাগেই হাজারত
পল রাধামন বিপদত
হে্দে ফুরেল কাদাবন
বুঝা ধোল্য রাধামন।
বেন' তানা তাপ্ ছি তুল
ধনর কধাত নেইদে ভুল
ইবা হামাক্কায়
দেবর কূলর নাকশাফুল ॥
কলা কাবি পেত্ থুরত
ফুত্ত্যন দেবনাকশাফুল বউত দুরত ॥

www.pathagar.com

পবাং লুদি ধনু কুচ
ও দাদু মর!
নাকশাফুল পিনিবার এগেম হোচ্॥
পেক্কুয়া দগরের চিং চিং চিং
ইচ্যা নয় ও বিধু!
এ ফুল্ল হামাক্কায় তরে মুই
পারি দিমবে ইক্কুয়া দিন॥
হোইয়্য বাচ্চুয়্য সাঝত্তে
মরে দাদু ভুলত্তে ॥
গাবদ্য মাদল বেদে নয়॥
দিম দিম কলেয়্য দিদে নয় ॥
দগরের ধুধুক্‌কুয়া ক্রতুক্‌তুক্
ক্রতুক্ তুক্
পুরি ফেলেদুং নয় ও দাদু!
তুই মে ফুল ন দিলে
মর এই মনদুগ ॥
বাচ্চুয়া কাবি শুচ্যাত্তে
দাদা রাধামন বিধু ধনপুদির
পিত্তান ধরি পুচ্যাত্তে।
দগা চিপ্পোই বচ্চি বেই
দেব নাকশাফুল ইধু নেই।
শিক্যা তেঙা খারুমত
ফুত্যন দেবনাকশাফুল
মেঘনা দোজ্যার তারুমত।
বিদ্যা সুন্দর গমপুদি
কল বিধু ধনপুদি ॥
জুর জুর ব বেলে
ইধু যদি ন থেলে।
এচ্যে নাকশাফুল কি ধলে॥
কুজি রান্যা তেঙোরি॥
এচ্যে দেবনাকশাফুল
ম' লুইয়ানত কেঙোরি ॥
থেঙা মাধাত রাঙি ক
এচ্যে কেনে ভাঙি ক।
কুগুরে খেল ঘুম' মদ
ভুইয়ত চরে জুনিঝাক
কইদুয়্যং কধানি শুনি থাক।

www.pathagar.com

বেন' তানা তাপ্ ছি তুল
ফুত্ত্যন দোজ্যা কুলে নাকশাফুল ॥
শোলোক ভাঙি পয়ারে
উরেই আন্যে সিত্তুন বুইয়ারে॥
কালবৈঝাগি ঝর আনে
নাকশাফুলন বয় আনে।
দারু বাদি শঝ্যতেল
বিধু পুগ' বেলান পঝিমে গেল্।
চালোন পানি ঘনাত্ত্যা
বাচ্যেই আঘন হ্বল সমাজ্যা।
সর্বুয়া আমিলা করত খেই
ইচ্যা দিনত ঘরত যেই।
পাদা কাবি তিন তারা
কেল্যা যেবং ফুলপারা ॥
রাজা খাজানা কিত্তি গর
দিন্ন মেউলো রেত্তুয়া ঝর
কেল্যা পারি দিবে ভিলি
ও দাদু তুই সত্য গর ॥
দগরে খেংগরং দিম দিম দিম
কেল্যা হ্যামাক্কায় পারি দিম।
দারু বাদি শঝ্যতেল
যদি ন দুয়্যং ও বিধু
ম' নাঙে ন উদোক পুগবেল॥
ঘুম তলই থং বদি
হ্যাঝিয়ে মাদের ধনপুদি।
কুমার' দগানত কিনং কা
নোনেয়ে দাদু চিগন দা।
শাওন রাঝি আগাঝ' চান
হ্যোইয়চ লাঙ্যা নয়দে সান।
পঙত ভরি মদ থইয়ং
গুরাত লগে খারা খোইয়ং
পিলাত ঘঝি সিলোনান
মুইঅ পিন্যং পিনোনান
তুইঅ পিন্যচ ধুদিয়ান।
ছ- মাছ বারিঝা পানবরত
খারা খোইয়েই গাঙ চরত
সিবিদি থলে খোল্যালই

www.pathagar.com

কধক খারা খোইয়েই ধুল্যালই।
দারু বাদি আদারে
ধাঙর হ্‌লং সমারে
কধক খেদমদ গোজ্যং দাদারে ॥
চারেয়া ধুন্দত পানি দুয়্যচ
কধক চুলানি তানি দুয়্যচ।
ভাঙা বারেং তুনি দ্যুং
ফুল গামছা বুনি দুয়্যং
ঝুবুক গাঝর ক-বদা
নিত্য শুনং ত কধা॥
ঘিলা মারি তাগত্তুন
তরে পেইয়ং লাঘত্তুন ॥
দাঙা আগুনে পুরের বন
গুরাত্তুন ধরি তরে মন।
বাত্তি পহ্‌রে ঘরান পহ্‌র
তর বলে মুই বল পাঙর
সুদা গাঝ' বাদানা
ফুনিত দিলুং দাবানা
তুইঅ ন গোল্যে ভাবনা
গাবদ্যা মাদল বেদুং নয়
হ্‌োঝো পানি খিলি খেদুং নয়
ঘরকেত্যাঅ মুই যেদুং নয় ॥
গীদে রেঙে জীংকানি
সত্য গোজ্যং পরাণী
বেন' তানা তাচ্ছি তুল
কেল্যা হামাক্কায়
পারি দিমবোই মুই নাকশাফুল।
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
বাগ' লেজাত চর দিলাক ॥
ঘরকেত্যা লর দিলাক
রাঙা হাদি সাদাঙত
ধুন্দা-কধা বাগোর-কধা
ঝুলি- তেঙেরা
জুর জুর পত্তে
লুমিলাক্কি গাভুরলক আদামত ॥
হ্‌ামত্তলে শুগরে
ভুগি উধিলাক কুগুরে ॥

www.pathagar.com

তেঙা ভাঙি পয়ঝা লর
কপুদি কন্যা বিঝার লর।
ভাতপিলাবুয়া তগাগোই
ও মাধু কি তোনপাত পেলাগোই ॥
ছুরি তাগল্লোই তোন কুদি
ভাত রানা বলগোই
চিগন বেবেই ধনপুদি ॥
য়্যে মাধাত ঘি তুল্য
কপুদি কন্যা কি গল্য।
তাচ্যা সুদা তুম গল্য।
হাচ্যপাদা মুম গল্য
বেলাত বাজে তাত্তানি
খেইদেই লইয়ে ভাতপানি।
বেদে ফিরি কুচ গরি
ঘুমত পলগোই জুচ গরি।
মুলি দুগি গাদালত
সেপ- পাদি বিঝেই
পলগোই বিধু ওগিরত ॥
জাদি পূজাত স গত্তন
নিঝি হ্‌গলক দগত্তন।
চোগত ঘুমে তাগিল
ঘুমর বুরি লামিল ॥

ফুল পারা
জাদি পূজাত চোজ্যেগি
পোহ্‌ত্যা রাঝি প্যেজ্যেগি।
দারু বাদি শঝ্য-তেল
ঝগঝগে উদেত্তে রাঙাবেল।
বেলান বাজে তাত্তানি
খেইদেই ললাক ভাতপানি ॥
ছুরি তাগল্লোই তোন কুদি
নোনেয়ে বোন্নুয়্য ধনপুদি।
আলু কুরি কামাত্তুন
পুঝার গল্য মামাত্তুন
আলু কুরি বর কামা
ফুলপারা যেদুংনে মর মামা ॥
ছ-মাচ বারিঝা পানবরত

www.pathagar.com

ছারি লইয়্যাং কামকরচ ॥
বাচ্চুন কাবি তাগলদি
বিদায় দিল কপুদি।
কুজি রান্যা হেল' বন
যিধু যেবে যা-
তর যে মন ॥
ভরা বন্দুক তাগেরলই
দা রাধামনরে দাগেরলই।
পাদা কাবি তিন তারা
যেইনা দাদু ফুল পারা ॥
গাবদ্যা মাদল বেবংনা।
যেলে ও বিধু যেবংনা।
কলা লাগেই হাজারত
ধার তাগলান ধরিনে
লামিল রাধামন উধানত ॥
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
ফুগংতলী -দ্যমুরা মুক্যা
দাদালই বেবেই লর দিলাক ॥
দোজ্যা তারুমত নাকশাফুল
যেবাক দ্বিজন দ্যোজ্যাকুল ॥
জাদি পূজত চৈজ্যন্দে
পিন্যাং ছরাত পোজ্যন্দে।
গাচ্ছুয়া কাবি রগুনি
সিত্তুন যাদন ফুগংতলী
দ্যমুবার উজানী ॥
বিন্যা চত্তন খোইয়া-কুরা
উদা ধোজ্যন দ্যমুরা।
এক কাপ উধি দ্বিকাপ যান
দ্বিকাপ উদি তিনকাপ যান
তিন কাপ উদি চেইর কাবত
চেইর ফুরেই পাচ কাবত
জাদি পূজাত চৈজ্যন্দে
পাচ কাব' মাধাত পোজ্যন্দে ॥
চগদায় কামাল্য ঘেরে আম
ঝরঝরে পরের কেইয়্যা ঘাম ॥
মোনত উধি ব খাদন
গাছত তলে জিরাদন ॥

www.pathagar.com

দুরন্দি আদামান রিনি চান
খল্যা মিলি পান খান।
ছরাত দিলুং চেই গধা
স্বর্গপুরী সান গরি
দুরত দেঘা যায় ধনপাদা ॥
অজল গাঝর ধুং-ক-ছ
সুঝেত্তি দাগি দের মোন-ব।
ছরা ছরি রেগা বায়
পিজুম ধরি সাঙু বাই
যিন্দি চেদ সাত
মোন' কাবে কাবে
রানি হুয়ানি দেঘা যায় ॥
জুম' লেজাত পানি কূয়া
মোন কাবে কাবে
ঘিরি আঘে রানি হুয়া ॥
পেক্কুয়্য রইয়ে তা-গানে
দুক্‌খ নেই তা মনে
দেগচনে ও বোন রানি হুয়া
দেলে মত্তুন মন কানে ॥
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
বাগ' লেজাত চর দিলাক
রাধামনদই ধনপুদি
ছ-কাব' মুক্যা লর দিলাক ॥
জাদি পূজাত চৈজ্যন্দৈ
ছ-কাব' মাধাত পোজ্যন্দৈ।
হে্ত্তুয়া মারি মাগনি
গাচ্ছুয়া কাবি রগুনি
সিত্তুন দেঘা যায়
সাত-কাব' মাধার তিগিনী॥
পিদা দুগি সিঝাদন
যোগী কাবর বিঝাদন
নাধেং কাবি ফিরাদন
সাত-কাব-মাধাত
রাধামন ধনপুদি জিরাদন ॥
অজল গাঝর ধুং-ক-ছ
সুঝেত্তি দাগি দের মোন'ব
উপ্ত মাজাত খেবার নুন

www.pathagar.com

যিন্দি চেদ সাত
ধূব ধূব গরি দেঘা যার
কাপ্যাজুম ॥
ছরাছরি রেগা বায়
পিজুম ধরি সাঙু বাই
পুগে পঝিমে উত্তরে দঘিনে
চেরোকেত্যান্দি দেঘা যায় ॥
পার্বুয়া বাঝর ধ-কাবি
জুম' লেজাত ছ-কাবি
তার অজলাঙ্যা দাদুরে
কেইয়্যা জুরে দের ধনপুদি
ব-দাগি ॥
উগুন মারি পৈঝালি
খারা খোইয়া বিঝালি
পানে খেইয়্যা সিবিদি
গরের ধন্নরে বিগিদি ॥
বেরায় গাভুরে ছাদিলই
ও বিধু ঘামান পুজি দে এক্কা
তর বুগত বান্যা খাদিলই ॥
বেরার পেক্কয়্য শিক্কারি
ধনপুদি কল
ন লাগেচ্চে এক্কা দিদ্দারি ॥
জুমত উত্তে বিজি খের
বিধু ধনপুদি তার এক-মু খাদিলই
বাঝং-ন-বাঝং গরি
তার অজলাঙ্যা দাদুরে বিঝি দের ॥
হ্দে ফুরেল কাদাবন
ও বিধু খাবেবে কমলে দেখ্যা ধন।
বাঝ উন্দুরর বুক্কুয়া ধুব
কধক দেগেবে চোগর লুব।
লুদি চিবাং পুগে খায়
ও বিধু আলগে আলগে
দেগেলে চোগে খায় ॥
চর্গাচর্গি কল' কাম
লাঙ্যা মেইয়্যা বল কাম।
গাদ' কাঙারা কলে ধর
পরানে মাগিলে বলে ধর ॥

www.pathagar.com

উরের পেক্কুয়্যা মেঘ কই সং
আয় আয় বিধু করত লং।
নুন' চুমা তেনেয়ে
শরীল জুরে দ্যাং নোনেয়ে ॥
সুবারি কাবি খানে খান
নাগর মাত্তন নানাআন।
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
সাত-কাব-মাধাত লর দিলাক।
চরন্দি ঘরা চৈজ্যন্দে
সাত-কাব-মাধাত পোজ্যন্দে ॥
পার্বুয়া বাঝর বর ধুবুক
সিত্তুন দোলে দেঘা যার দেচ-মুল্লুক
জুমত উত্তে কুঝি খের
রাধামনে ধনপুদিরে
দেচ-মুল্লুককানি চিনেই দের ॥
ছরাছরি রেগা বায়
পিজুম ধরি সাঙু বাই
পঝিম ধাগন্দি রিনি চেলে
দোজ্যা ধুবুয়া দেঘা যায়॥
শোলোক ভাঙি পয়ারে
তুবোল নাঝের-
সাগর' বুগত বুইয়ারে ॥
অজল বৃক্ষ তার ছায়া
কন্না বুঝে তার মেইয়্যা ॥
দ্বিবা চোগে যেদ্দুরত যায়
সাগর' তুবোল নাঝিনে যায়।
তুবোলে তুবোলে ঝিলিগ' খারা
সজায় সাগর ফেনার ধারা
আম্মক হ্ইনে চেই রলাক
গোজেন' ইধু বর চেলাক।
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
পঝিম' মুক্যা লর দিলাক।
চরন্দি ঘরা চৈজ্যন্দে
মেঘনা দোজ্যার তারেঙে তারেঙে
লুঙ্যন্দে।
কাবি কুচ্যাল পেরাদন
মেঘনা দোজ্যার তারেঙে

www.pathagar.com

রাধামনদই ধনপুদি বেরাদন ॥
বৈঝেক্যা সুদা ফগাদন
তারেঙে তারেঙে চিংচিঙ্যা মনদই
দেবনাগচ্ছ ফুল তগাদন ॥
দান্নু বাদি তালিক্য
দেল ধনপুদি-
দেবনাগচ্ছ ফুল আধিক্যা ॥
লাঘা বান্দরে কর খাদন
মেঘনা দোজ্যার তারেঙে তারেঙে
দেবনাগচ্ছ ফুল বুয়ারে ধুলদন ॥
নাধেং কাবি ফিরেলাক
গাঝ' ছাবাত জিরেলাক।
বেদে ফিরি কুচ গরি
গাজত উদং ও বিধু
থাক তুই জুচ গরি।
নুয়্য ঘরত হা বানং
দেবনাগচ্ছ ফুল পারিবার।
সা-বানং ॥
মঘ' বাঝি পিদলে
মাদিত থেদুং কি দোলে।
ভাদে রানি সরাঙ্গে
মাদিত থেবার দরাঙ্গে।
কলা দুবোত চাদ শামুক
গুজুরি এবাক বাঘ-ভালুক।
ঝারত দগরের এছুরি
মাদিত থেদুং নয় গায় গরি ॥
ভাদে রানি সরাঙ্গে
বাঘ-র-উন শুনিলে
জাগত উগুরি উদংগে ॥
ঘিলা খারাত দ্যং হ্যাদু
তুই-অ গাঝত থেবেগোই
ও দাদু!
রান্যা মাদি তেঙোরি
মুই গায়গায় থেদুং এ মাদিত
কেঙোরি ॥
চগদায় কামেরেল থুরকোন
যদি চিপ্পুরে তর গুরোবোন।

www.pathagar.com

ইধু নেইদে কন সংগী
বানিদেগোই মে-
দোজ্যা-বুগত এক্কান জলতুংগী ॥
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
জলতুংগী বাচ কাবা লর দিলাক।
বেল্যে উত্তন হ্‌রি- কুরা
উত্ত্যন আর দ্য-মুরা।
বাচ্চুন কাবি রগুনী
উত্ত্যন যেক্কে ফুগংতলীর তিগিনি
জাদি পূজাত চৈজ্যন্দে।
পুগ' ধাগত পোজ্যন্দে।
তামা পিলা তঝরা
পুগ' ধাগর বাচ্চুন
সূর্য তেজে পগরা ॥
বাগ' লেজাত চর দিলাক
উত্তর ধাগত লর দিলাক।
হিন্দু কামারে কা গোজ্যন
উত্তর ধাগ' বাচ্চুনত
পাবে পাবে গিরায় গিরায়
চ.মচিদিলায় বাহ্‌ গচ্যন
বাগ লেজাত চর দিলাক
দঘিন ধাগেদি লর দিলাক।
কাবি কুচ্যাল পেরেয়্যন
দঘিন ধাগর বাচ্চুনত
পাবে পাবে গিরায় গিরায়
হ্‌াবুয়া লুদিয়ে বেরেইয়ন ॥
ভরা বন্দুক তাক পেলাক
পুগে নয় উত্তরে নয়
দঘিনে নয়
পঝিম ধাগন্দি জলতুংগী-বাচ্চুন
লাক পেলাক ॥
পার্বুয়া বাচ্চুন সুঙসুঙ্যা
হ্‌ইয়ন বাচ্চুন ঘনাঘন্যা।
ইন্দ্ররে সালাম জানেল
ধার তাগলান তুলিল।
বেন' তানা তাপ্‌সী
তরে গোল্লুং মুই সাক্ষী ॥

www.pathagar.com

ধার তাগলান তুলিল
জলতুংগী বাচ্চুন কাবিল।
গুলো পারি জগনা
ফুনিত দিলুং দাবানা
কেনে তুলিম জলতুংগী
গরের রাধামন ভাবনা ॥
গাভা মাধাত তবনা
দেবরাজরে গোল্ল্য ভাবনা
বারোই দগানত খরম' খোল
ইন্দ্রপুরী গরম হোল।
দাবু বাদি পিবয়ে
চেল ইন্দ্র কি হ্ইয়্যে।
বিশ্বকর্মারে দাগিল
মানেইয়্যা পুরীত পাধেল ॥
বত্যা দরি পাগেল
সাগরত বাচ্চুন গারেল।
বিশ্বকর্মার বরে রাধামন
ফুলর জলতুংগী বানেল ॥
বচ্চিত ধোল্য তুগুরে
দিলুং ভাতজরা গঙারে
উত্তোই হ্বল জলতুংগীত
দাগি কল তে বিধুরে ॥
ধোজ্যা মাচ্ছুয়্য না ছারিম
ন্য পারিম দা ন পারিম।
কোচ্যা গাভুরী সাজিব
গুগুনো পিনোনান ভিজিব।
ললে জনমত তরে লোম
পিদত বুগিনে পার হোম ॥
হ্োইয়া বাচ্চুয়া সাজেল
ধনপুদিরে বুগিল
পাচ হারি ধান' বুঙ সান
বুগিনেই জলতুংগীমায় তুলিল ॥
দোজ্যা কূলে নাকশাবন
তারেং উধিল রাধামন
তারেঙ' উবুরে নাকশা গাছ
সিত্তুন এযের ফুলবাচ ॥
দৈয়্য মাধাত ঘি তুল্য

www.pathagar.com

গাঝ' উবুরে উধা ধল্ল্যা।
ধল্ল্যা বচ্চিত তুগুরে
বিধু ইন্দি শিক্কারে ॥
বত্যা দরি ঘনপাক
আধিক্যা গরি শুনিল রাধামন
আমাদি- ভাচ ॥
ফুল' খাদি বিঝনে
ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমি দ্বিজনে।
ধেলাত উধি হ্‌াবা খাদন
আমাদি-ভাচ মাদদন ॥
মনত হ্‌ইয়ে স্যাংসামা
ব্যঙ্গমি কর চা ব্যঙ্গমা।
হে্‌দে ফুরেল কাদাবন
কধক হো্‌জে রাধামন।
পানি খেইদে পহ্‌নত্তুন
এচ্যে ইধু দুরত্তুন
নুন' চুমা তেনেয়ে
ফুল পারিদের
তার নোনেয়েবিরে
কধক হে্‌ঝে নোনেইয়ে ॥
চেলে জনমত চেদে নয়
গেলে সমারে নিদে নয়
মরে কনদিন এসান্যা গরি
মন পালে তুই দিদে নয় ॥
শুনি হাঝিল ব্যঙ্গমা
কাত্ত্যে গরর তুই ভাবনা।
লরের বুইয়ারে গাঝ' ঝুপ
লুগেই আগে যমদুত।
বেন' তানা তাচ্ছি তুল
ধনপুদি নাঙে ছিনিলে ফুল।
যমদুত্ত্যয় দেগা দিব
সর্প হ্‌ইনে খুদিব ॥
এ কধা কইনে হ্‌লাক চুপ
হ্‌ল বেঙ্গমির মনদুক ॥
শুনি পেক্কুনর আমাদি ভাচ
পল রাধামন ভাবনাত।
গরম লোআন জুরেল

www.pathagar.com

বুগর দরান উধিল ॥
ভাবি চেল মনমায়
হ্‌ব বিধু গায়গায়।
পরি রব জীংকানি
গায়গায় হ্‌ব পরাণী ॥
চেলে জনমত তারে চাং
ভাবিল রাধামন ফিরি যাং ॥
কোচ্যা বুক্ক বর মাগে
ফুলর আঝায় চেই আঘে।
ধল্ল্যা বচ্চিত তুগুরে
দাগি কল দাদারে
ও পরানর চিগন দা
দঘিন' ধেলাবুয়াত এক্কা যা।
বেন' তানা তাচ্ছি তুল
সে ধেলাবুয়াত্তুন পারি দিবে মে
মন-জুরেয়্যা-নাকশাফুল
ইন্দি রাধা উভা-মু
দরে হ্‌ই আঘে চুধামু ॥
দেগি দাদারে মু-কালা
হ্‌ল ধনপুদির মুকালা।
কেইয়্যা দরে শিরশিরায়
কোচ্যা বুক্ক গিরগিরায়
ধল্ল্যা বচ্চিত তুগুরে
রিপ রিপ গরি দেগে দাদারে।
দাবু বাদি আদাত্তুন
দর উধিল বুগত্তুন।
রাঙা খাদি সাদাঙর
ধনপুদি কল
লামি আয় দা দরাঙর ॥
শোলোক ভাঙি পয়ারে
ফুলুন নাচ্চন বুইয়ারে।
মনে মনে ভাবিল
পুরনি দুক্‌খ তুলিল।
চেয়্যং বিধু মন এগেম
সত্য জোজ্যং মুই রাগেম।
কাবর ধোইয়া বরগাঙে
পরান দিম মুই তর নাঙে।

www.pathagar.com

কবা বিনি ফুদেল্লোই
সেনে দাদা দঘিন' ধেলাবুয়াত
উজোরলই ॥
শিবাং পাদা আগ চেইয়ে
ফুল' ধেলাবুয়া লাক পেইয়ে।
কেনে কেনে দাদারে
জামুরা সাপ ইক্কুয়্য তাক চেইয়ে ॥
খেলাক বান্দরে থুরকোন
যদি চিপ্পুরে তদ্দারে
জনমত্তে রিনি চা ও চিত্তি
গুরোবোন ॥
চোরন্দি ঘরা চরি যেইম
সর্বুয়া আমিলা করত খা
এঝ বেল ন দুবে ও চিত্তি
ঘরত যা ॥
বেন' তানা তাচ্ছি তুল
এইয়্যা ঈরি দুয়্যঙর মুই
ত-ইন্দি চিত্তি নাকশাফুল।
হোঝে ফুলুন চুলত পিনিচ
যাবত্তরি বাজচ নাং ঘিনিচ
বিধিয়ে চেলে মরিনে চেইম
স্বর্গত যেইনে চেই থেইম।
দিলং ছরাত ছেই গধা
গুনি দাদার এই কধা।
ছাগল কুরো মানেত্তে
গুজুরি গুজুরি কানেত্তে ॥
পানি খেইয়্যা পহ্নত্তুন
ধেল চঙরা বনত্তুন
এক্কা আজুর বিচ্‌ঝারা মন্দরবুয়্য
ঈদত তুলি চা দা মনত্তুন ॥
চিগন মরিঝা ন তানে
বুরা বেত্তই ন বানে
আঁ পরানী!
আগ' বিচঝারা মন্দরলই
সর্বাঙ্গ কেইয়্যা মর ন মানে ॥
নলি ভরি সুজন বার
থোক্কে কমিব

www.pathagar.com

ইক্কু বেজত্তুন বেচ
সর্ব বিঝে মর উজান বার ॥
সর্বুয়া আমিলা করত খা
যা যা বিধু ঘরত যা
ভাদে রানি চোরেবে
হাক্কে এবাক বাঘ ভালুক
ভূত দেবেদা তুই দোরেবে ॥
লেগা শিগি আগুরত
সুদা ফুদিল পাগুরত
সে কধা কইনে
পোরি গেল রাধামন
অকুল দোর্জ্যা সাগরত ॥
দেবেদা পূজা শিক্কারি
ধেল চঙরা তিক্কারি
সেনে সাগরত ঝাবেই পল
জলতুংঙীত্তুন-
বেবেই ধনপুদি ঝামমারি।
নারা কাবি ছ-বনা
গঙ্গীমারে গল্ল্য ভাবনা।
বাঝা কাদোর' খাজাদি
জুমান কাবি ধাঝাদি
সে মা গঙ্গী-
রাধামনরে লইনে উধিল
সাগর' বুক্কত ভাঝাদি ॥
চিলে ক রো সুপ দিল
উধি গঙি লুক দিল।
শামুক ভাঙি দুজুরি
উধিল সমুদ্র গুজুরি
হেদে ফুরেল কাদাবন
চিগন ছরা পাদাবন
জোয়ার লামিনেই
গাঙ কূলে কূলে
ভাঝা ধল্ল্য-
নোনেইয়্যা দাদা রাধামন ॥
লামের সাগর গুজুরি
যাত্তে কামা ওঝরি
যাত্তে বিধু সাজুরি ॥
সাবে বান্‌ল্য রনপুদি

www.pathagar.com

বিদ্যা সুন্দর গমপুদি
দাদারে ধরি করত ললগোই
জলতুঙীত-
নোনেইয়্যা বোন্নুয়া ধনপুদি॥
ভরা বন্দুক তাগিল
মাদি বেগেনা ছাগিল
চেরোকেত্যান্দি-
আন্দার রেত্তুয়্য লামিল ॥
নিঝি হ্গলক দগত্তন
বাঘ আলুগে গুজুত্তন
লাঙ্যা লাঙনি দগত্তন
ভুত পেরেদে র-গর্ত্তন।
আন্ধার রেত্তুয়্য ঘোনেই যার
দুঘর নিঝি বিদি যার
চোগর পানি ধারা বার
বিধু ধনপুদি কানি যার ॥
পানি খেইনে পহ্নত্তুন
ঈদত তুলি মনত্তুন
বিচঝারা মন্দরবুয়্য
শিক্কে কোনকালে আজুত্তুন ॥
চিদে মনে এক হ্ল
বিচ ঝারা মন্দরবুয়্য দি-চেল ॥
দৈয়্য মাধাত ঘি তুল্য
সেনে যমে কি গল্য।
ভরা বন্দুক তাগিল
বাঘ' রূপ ধরি
দাদারে খেবাত্যে গুজুল্য ॥
সাবে বানল্য রনপুদি
বিদ্যা সুন্দর গমপুদি
বাঘ না দোরেল
পরান' বোন্নুয়্য ধনপুদি ॥
মাদি ঘিলা ন পেল তাক
উধিল যমর মন' রাগ
ফিরি গেলগোই বন' বাঘ ॥
দাবু তুলি ধুব-ছরা
সেনে বেবেই ধনপুদি
দ্যা ধরিল দাদারে বিচ ঝারা ॥
পিজুম ধরি রেগা হ্ল

www.pathagar.com

সেনে পদ্মা দেঘা দিল
হ্যাঝি বিচ্ছান তুলি লল ॥
পেরা ভুইয়ত চরে দোক
চেনে চিগনদা খুলিল
মূর্চ্ছা ভাঙি তার দ্বিবা চোক ॥
মুরো উধিলে ব- নিঝাচ
সেনে উধিনে ইরি দিল
চিগনদা রাধামনে
লাম্বা গরি ব-নিঝাচ ॥
ভরা বন্দুক তাগিলে
কল রাধামন
মে কিদ্যা বিধু
আধ ঘুমত্তুন জাগেলে ॥
ছরাত দিলুং চেই গধা
বিধু কল মুল কধা।
দুঘর নিঝি বিদি গেল্
পুগন্দি উধি নূয়্য বেল্।
নুয়া বেলে পহ্র ছারিল
দা-রাধার ঘুম ভাঙিল।
পানি খেইনে পহ্নত্তুন
হোঝে পিনে দিল
বিধু ধনপুদির চুলসুদাবুয়্যত
নাকশাফুলুন দা মুধত্তুন ॥
সাগর' পানিয়ে ভাঝেইয়ে
তুবোলে সমুদ্র নাজেইয়ে।
পানি খেইনে পহ্নত্তুন
ন হ্যারায় তুয়্য দা
বিধুর ফুলুন মুধত্তুন ॥
দগরের পেক্কুয়া চিং চিং চিং
মানজ্য জীংকানি কোবুয়্য দিন
দাদার বেবের কোচপানা ॥
থেব পিত্তিনীত চিরদিন ॥
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
বাগ' লেজাত চর দিলাক
হ্যাঝিয়ে খুঝিবে দা রাধালই
বেবেই ধনপুদি-
ধনপাদা-মুক্যা লর দিলাক ॥

www.pathagar.com

রাঙা খাদি সাদাঙত
লুঙ্যন বিন্যা আদামত
বিজি খেইয়্যা খাজুরে
দিল আগ ফুলুন আজুরে
বেরত তাঙেই মদখাপ
ছেপ বর দিল চলাবাপ ॥

ধনপুদির মেলা কধা

খল্যা মেলি পান খাদন
ধনপুদিরে বো চাদন।
বগরা মুঝি কপুদি
কয়দে ঝিবরে বো দি।
বিধুর শুনি রাগ বারে
হ্রোচ ধাব্রজ কাম গরে।
তাগল' লাগ সানেইবুয়া
দেঘা আন্লাক্ জামেইবুয়া
আদাম্যা গুরা খাপ্যেই চান
আদিচরনরে রিনি চান
সাঝিত্ তলে ঝামপাদি
নোনেইয়া বোন্নুয়া ধনপুদি
পিজুম বাচ্চুয়া ধোজ্যেগোই
সাঙু পাগেই পোজ্যেগোই।
সিত্তুন ঘরত উত্ত্যোগি
সাঝিত্তলে বোচ্যেগি।
মরিচ বাদের ধনপুদি
কামত বাচ্যে কপদি
পানে খেইয়া সিবিদি
গত্তন আদিচরনরে বিগিদি
মেলা ঘরর জামেইবুয়া
কুবুয়া কদে ত বোবুয়া ॥
হাত ভরেইনে দৈ খেইয়ে
থিক্ দি আদিচরন চেই
রইয়ে ॥
ফুলর কাবর বিঝেইদি
বোচ্যে ধনপুদি
মা কপুদির পিঝেদি
বিজি খেল খাজুরে
দেগেই দিল আদিচরন

www.pathagar.com

এইয়্যা ম-বোবুয়া
মুজুঙে কপুদি মুঝিরো॥
গেনে ধূলে নাঝদন
জগার জগার হ্াঝদন।
মুজি কপুদি কাজিল
দা-আদিচরন লাজেল
সালাম গরি পোজ্যেগোই
পিরা ভাবি ভুলে ভলানাথ
ধুন্দা ওগইবুয়াত বোচ্যেগোই
পান' লগে সিবিদি
উল্যেই পল্ল পিঝেদি
ফেল্ল হ্াত্তান বিঝিদি।
দৈয়্য মাধাত ঘি হ্ব
কল কপুদি কি হ্ব।
পাল্লে হুচকারে বেরেইয়্য
পাত্তে মদতান ন খেইয়্য॥
গাঙত বেরাদন পাদিহাচ
মুয়ত্তুন নিগিলের মদবাচ
বুগত ফুদিল শক্তি শেল্
ঘরত্তুন চিত্তি লামি গেল্
আজু ঘরত বোচ্যেগোই
গুজুরি গুজুরি কান্যেগোই।
বোত্য দরি ঘনপাক
কল অজু চলাবাপ।
ভাদে কারবে থেই পেবে
দিলে ম'বাবে- যেই পেবে॥
জামেই চানা ফুরেল
কপুদি মুঝি হ্াঝিল।
লবিয়ত হল ঘর-ভর।
জামেই চাদন বেক-পারা।
ধরাবান্ধা গরিলাক
নিয়ম দস্তুরে ধরিলাক।
তেঙা দিবা দ্বি-কুরি
সাত কুম মদ দক্ গরি॥
ইজা যাদন সুরঘাত্ত্যা
শুগর ইকুয়া ন মুত্ত্যা।
বরাঙা খনি মৈলা পাক

www.pathagar.com

রূবারাদি ধরিলাক।
কেইয়্যাত বানি ঘুঙুরি
কানত ধোল্যাক ঝুমলি ॥
হ্‌াদত দিবাগি তাজ্জুরে
কানত দিবাগি বাজ্জুর।
কুজি বাগু লাগিব
শিগল দ্যা চরাং লাগিব।
দ্বিবা হ্‌াঝলি চল্লিঝে
থেঙত খারু পত্তিঝে ॥
ইয়ানি বেক্কানি দি পেবা
ধুলে দগরে নি পেবা
দিলাক ভাতজরা গঙারে
বো নিবাক্কে সোমবারে ॥
পারাপরঝি ভেইলগে
কধা কলাক যা যা ধগে
জামেই দেগানা ফুরেল
লবিয়ত সবিয়ত থুম হ্‌ল ॥
চরন্দি ঘরা চর দিলাক
বো চেইয়্যাগুন লর দিলাক
মেলা বাজার গোজ্যন্দে
খরজ' চিদাত পেজ্যেন্দে ॥
পুগ' বেলান পঝিমে গেল্‌
সাপ্তা যগন বিদি গেল্‌
দাভা তেঙা গন্যন্দি বো খজা মানুচ লুঙ্যন্দি ॥
মিলেই মন্দে লুম্যন্দে
বেক্কুনে ঘরত উত্ত্যন্দে
ধুলে সানেই বাজাদন
ধনুয়্যরে বো সাজাদন ॥
খুঝি রাঝি মদতানি
খাদন মেলার ভাতপানি।
মিলেই মন্দে জুগাল্যাক
পোহ্‌ত্যা রাঝি বো নিবাক।
বাদ্য বাজেই সারাঙ্গ
গরিবাক চুমুলাং আরাম্ভ।
ফুলখাদি থং বদি
চুঙুলাঙ' পানি কুম
গাঙত ভরা গেল

www.pathagar.com

নোনেইয়্যা বোনুয়্য ধনপুদি।
চরন্দি ঘরা চোজ্যেগোই
চালাগি বুদ্ধি ধোজ্যেগোই
চুঙুলাঙ' পানিকুম্ম লই
রাধামনদাগী ঘরত উত্ত্যেগোই
মেলাঘরত জোল হ্‌ল
ধুলদগবুন থামিল।
ছারল্যা বেলান করা পহ্‌র
জয়মঙ্গলে দাগি কর।
সাক্ষী গরি গঙ্গীমা
ঘরত উত্ত্যেগি লক্ষ্মীমা
পরান দিলে মুইঅ দিম
লামেই ন দিম কনদিন॥
কুগুরে ভুগিলাক উভামু
নীলগিরি মোইঝ্যালই
কপুদি মুঝি
হ্‌লাক বেক্কুনে চুধামু॥
গাঝত ফুত্ত্যন রেগোচ কো
কল জয়মঙ্গল
সাধিনে উত্ত্যেগি পূদ' বো।
কার' কধা শুন্দু নয়
ম' পুদবো মুই দিদুং নয়॥
আদাম্যা বলাক বিঝারে
দাগিলাক চলাবাপ খীঝারে।
তেম্মাঙত বলাক বেক্কুনে
সালিচ ছিরেলাক দচজনে।
নালিচ গোচ্যে ধনীরাম
আদিচরন' বাব' নাং।
মকদ্দমা সিরেলাক
জয়মঙ্গলরে দাগিলাক।
ধনীরামরে চেই পেবে
খরচ বেক্কানি দিই পেবে।
জয়মঙ্গলে খেল খাম
ইয়ত ফুরেল সালিজ কাম॥
দাবু বাদি শিঙরি
পেল রাধামন দিঙিরি।
গেনে ধুলে বাজাদন

www.pathagar.com

সঙ্গী সমাজ্যা নাঝদন।
ঘরায় দুঙুল্য ময়দানত
কানের ভলা শিধানত।
মদ' রঝিয়ে পেলাং বার
মেলাঘরত ভাঝিনে যার।
দুমে গর্ত্তন ক্রুতুক্ তুক্ ক্রুতুক্ তুক্
লামিল দাদার মনত সুক
ছারিল বিধূর মনর দুক ॥
ইজা উযাদন সুরঘাত্যা
শুগর কাবিলাক ন-মুত্ত্যা।
বেরাত তাঙেই মদকাপ
চুঙুলাং অঝা সাজিল
চলাবাপ।
ফাগুনত বোলেন ঘেরেআম
দাদালই বেবেই তেনা
গরিলাক ॥
হোঝে জনমত চুঙুলাং ॥
বিজি খেইয়্যা খাজুরে
সালাম গোল্যাক আজুরে।
খুলি মেলি মনর ভাব
সেপ্ বর দিল চলাবাপ ॥
জন্মে জন্মে এক খেদা
চিদে মনে এক রদা
ঘর- গিরিত্তিত সুখ পেদ ॥
জাদি পূজাত চিরিদ্দি
উজন্যা হ্দ গিরিত্তি ॥
কালি কুচ্যালে দুবা হোক
গুত্তি গুদুরি দেল্ বারোক
নাদিনে পুদিনে ঘর- ভরোক ॥

২. চাকমাদের আদিকবি শিবচরণ চাকমা রচিত "গোজেন লামা"

এক লামা

উজোনি ছরা লামোনি ধার–
ন' উদে সৃত্তি জলত্কার।
জল' উগুরে বস্যে থল্,

বানেল' গোজেনে জীব'সকল।
আরেয়্যে মানেয়্যে যার জনম,
আগে সামাল দ্যাং তার চরণ।
চানে সূর্য্যে সদর ভেই
সালাম দ্যাং মুই ভূমিত্ থেই।
সোম্মুগে সালাম দ্যাং পুগেদি;
পোজিমে সালাম দ্যাং পিজেদি;
উত্তরে সালাম দ্যাং বাঙেদি;
দোগিনে সালাম দ্যাং দেনেদি।
মরে বিধির দ্যাং হোক।
তিন দেব' চরণত্ সালাম থোক।
ন' বুঝে তিন দেবে সেই সকল
বর্ কমল আর ফুল কমল,
মা স্বরস্বতী সালামত–
যোগেই দিদোগি গীদ' পদ।
সালাম জানেই তপ'জী
ধর্মশীলা সন্যাসী,
এগামনে ভজঙর–
সালাম জানেলুং দেব'সগল।
পূজোর গুরু মানেলুং
আহ্জার ছালাম জানেলুং।
মত্য-পুরীত জনম যার,
তার চরনে নমচ্কার।
দচ্ মাচ্ দচ্ দিন দুক্ পেইয়ে
জম্বু দীবত্ জন্মেয়ে।
পুরেই চেলুং চোগ্ ভরি।
মা বাব' পারা নেই দেচ্ ভরি।
পোর্বুয়া বুঝে ইঙিদে আগারে
এযের মানেই লুক্ সংসারে।
মা বাব' চরনত্ ভূজিলে
সগল তিথ্য ফল পায় ভিলে।
জ্ঞানী ধ্যানী সালাম দ্যাং
পোর্বুয়া পোণ্ডিত ভূজিলং।
বেগরে সালাম মুই দিলুং,
গীদ' সাধনান সাধিলুং।
গীদ একলামা ফুরেইয়ে,
বুঝিলে বুঝিব মানেইয়ে।

www.pathagar.com

ধি-লামা

তদাত্ বেরেই ধুপ কাব্র,
গোজেন'চরনত্ ভূজ'ঙর;
আগে সালাম দ্যং শিবচরণ
মাঘং গোজেনর দুই চরন।
ছাবাত্ তলে রাগেদ
একালে উকালে তোরেদ'
জন্মে জন্মে দেগা ওহ্ক!
চিদে মনে এগা হোক!
দেবংশি গোজেনে ন' দুঝি,
অবুঝ মানেইয়ে ন' বুঝি।
শুনো শুনো পোর্বুয়া ভেই
দ্বিবে অক্খরে তোরি যেই।
গুরু সাধি নাং পেইয়ে।
অনা গুরুরে পার হোইয়ে।
সাধি আনং আর জনম্
সগল দান গরঙ'র এই জনম।
জুরি ন পাল্যে কুয়ত্ পেভে
তরি ন'পাল্যে দুগ পেভে
ন' রলে ধন মান সাধনে-
থরিব মানেইলগ ফুল দানে।
গুরু চরনত্ সার গরে,
বংশ ধনে কি পার গরে?
এগা মনে ভূজিলে
সগল তিথ্য ফল পায় ভিলে।
দয্যা দেলে সার গরে,
অপার পানি সাগরে
তিরিচ্ তিন জাদি ভাচ্ পাত্তুংগোই মুই অ ঘরে।
ভূজিলে মানেইলগ এই কালে ;
যমে ন' থরিব ঐ কালে ;
যে বর্ মাগে সে বর্ পায়
গোজেনে বর্ দিলে ন ফুরোয়।
গোজেন' মেইয়া উদ' নেই,
ভূজি পারিলে দুক্খ' নেই
পরম বৃক্খ' ভর্ দিয়া
বুঝি পারে কন্না তার মেইয়া?
সগল জীবে বেদায় ওহ্ক,
চিদে মনে এগা ওহ্ক।

www.pathagar.com

পরম গোজেনে বুঝিব'
চরণে সালামে পায় ভূজিব।
ধর্ম সাধ'নান পায় ভিলে,
গোজেন'তুন বর মাগিলে।
গীদ' দ্বি লামা ফুরেল,
সালাম জানেবার কাজেল'।

তিন লামা

তদাত্ বেরেই কাবরে,
আরাধনা গরঙর হাত জুরে।
দুখ্যা কুলে ন যেদুং
সুখ্যা কুলে মুই এদুং,
আহ্‌ধে ন' গোত্তুং জীব'বধ,
যুগে যুগে ন পোত্তুং নরগত।
পরম দুক্‌খ' মর ন' অহ্‌দ'
চিদে চজ্জা ন' থেদ'।
দান'বান শীল'বান অহ্‌দুংগী
লোগে ন' গর্ত্তাক কলংগী।
পীরে ব্যাধিয়ে ন ধত্ত,
অজল নীজ দাত ন' অহ্‌দ'।
পরা ন' পেদুং ধনেদি,
উনো ন' অহ্‌দুং জনেদি।
অবুঝ জন্ম ন' অহ্‌দুং,
তিদে কধা ন' শুন্দুং।
কানে ন শুন্দুং কুকধা,
পরেয়্যায় ন'কধাক অগধা।
পোর্বুয়া পন্ডিক যে দেঝত্
জন্ম ওহ্‌দুংগোই সে দেঝত্।
আহ্‌রন্দি রাজার দেচ্ ন'পেদুং,
অঘাদে অপধে ন' পোত্তুং।
যেধক্ চিদে ওহ্‌ক তরিদুং,
জ্ঞানী গুণী লাহ্‌গ পেদুং।
গীদ' তিন লামা ফুরেলুং,
বেগ'রে সালাম জানেলুং।

চের লামা

তদাত্ বেরেই কাবরান,
ভূজিলুং গোজেনর চরনান।

www.pathagar.com

গীদে রেঙে উল্লোঝে,
সাধঙর সাধ'নান কেলাঝে।
দুখ্যা জন্ম ন' অহ্দুং,
অপধে অঘাধে ন' মত্তুং।
বাব্ মা পত্তাক্কোই সুদিনোত্,
জন্ম অহ্দুংগোই সে দিনোত।
জ্ঞানী কুলোত্ জন্মোদুং,
দানে ধর্মে মুই অহ্দুং।
জাদে কূলে থেদুংগোই,
চানে শিক্যায় হোদুংগোই।
মা বাব্ ওহ্দাক পূণ্যবান
সুঘে থেদুং জনমান।
সাত ভেই সাত বোন লাক্ পেদুং,
ননেহ্য়্যা গুরোবো মুই ওহ্দুং।
সনার ধুলোনত্ ধুলেদাক্ ,
দেবর ভঙানি ভঙেদাক।
জেত্ থা সমারে জেদেঙা,
হুরো সমারে হুরোঙা।
কালি কুচ্যালে দুবা ওহ্ক,
গুলি গুদুরি দেইল বারোক্।
ধনে জনে ভত্ত ঘর,
ধানে ভরন থেদ'গলাঘর।
সংগী সমাজ্যে পাং পাহ্রা,
ইত্তো কুদুমে ঘর ভরা।
কধা বাত্তায় মু মিধে,
কাদেদুং জনমান নিচিদে।
গীদে রেঙে গম গলা,
দানে শীলে ধনবলা।
মাধা জগা চুল ধরোক,
চানে শিক্কেই দ্বিবা চোক,
বেঙা অহ্দ' চোগ' ভং
মুজুঙ দাত্ত্ ন' অহ্দ' সং।
চাহ্দে দোল অহ্দ'বেক্কানি
বানেদ' গোজেনে কেইয়ানি।
কেইয়ান পেদুং দেব' গরন,
বাহ্রা অঝার বুক ভরন।
চানে শিক্কেই গরনে,
রূবে রঙে সপ্পানে।

www.pathagar.com

রাজা-বাদাত্ পান হেদুং,
গুরু সাধি নাং পেদুং।
সাধি ঘরত্ জন্মেদুং,
পোর্বুয়া পোভিক মুই ওহ্দুং।
দোর্জ্যা কোরোলি পায় গুন্দুং,
আগাজ' চানতারা গুনিদুং।
লোগে হ্াঝি মাদেদাক্,
সর্বলোগে পুজিদাক্,
দেলে শুত্তুরে ভূজিদাক্ ।
আহ্দে পেদুং লেগা বর,
কেইয়াত পেদুং রূব'বর।
গীদ চের লামা ফুরেয় যার
তদা সাধঙর আরকবার।

পাচ লামা

তদাত্ বেরেই ধুব কাবর,
গোজেন' চরণত্ ভুজ'ঙর।
চরণে সালামে ভূজিলে,
সগল তুত্ত্য পায় ভিলে।
রদে বলে মুই অহ্দুং
গোজেন,রে ভুজিদুং।
সাত আহত্ সাতফুট মুই অহ্দুং,
গোজেন'ত্তুন বর মাঘং।
দেনে মাগং ধন বর্,
বাঙে মাগং জন' বর্।
ধনে সম্পদে সব্ পুরা,
জুরি পাত্তুংগোই এহ্ত্ ঘোরা।
যে বর মাঘে সে বর্ পায়,
গোজেনে বর্ দিলে ন'ফুরোয়।
আহ্ল্যা অহ্লে কাম সাধি,
জুম্মোয়া অহলে ধন সাধি।
দেবান অহ্লে বীর সাধি,
রাজা অহ্লে চক্রবত্তি সাধি।
কেইয়াত পেদুং সাসজানা,
তিরিচ্ তিন জাদ'ত্তুন পেদুং হাজানা।
হাদে পাল'ঙে বোই হেদুং,
তিরিচ্ তিন জাদি ভাচ্ মুই পাত্তুং।
গীদ পাচ লামা ফুরেই যার
তদা সাধঙর আরকবার।

www.pathagar.com

ছ-লামা

তদাত বেরেই কাবরে,
আরাধনা গরঙর আহ্ত জুরে।
মা বাব'ত্তুন ভক্তি লং,
সাত ভেই সাত বোন বর্ মাগং।
এগারশ চুরাশি সন (?)
ফলানা বারে সাধঙর এগামন।
আহ্দে ধালি পানিয়ে
মা স্বরস্বতী সাক্ষীয়ে।
চরণে সালামে ভজঙর,
গোজেন'ত্তুন বর্ লঙর।
গীদ 'ছ-লামা ফুরেইয়ে।
বুঝিলে বুঝিব' মানেইয়ে,
কুধু গেলা সংগী ভেই ?
সাধনা সাধিয়োই লঘে যেই।
ছলামা ইয়োত্ ফুরেল—
গোজেন চরণত্ মন্ রল।

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

১. বাঁশি : মিতিঙ্গা বাঁশের আগার অংশ ১৮´´- ২০´´ লম্বা এবং ৮ সেন্টিমিটার বেড় পরিমাণ নল দিয়ে এই বাঁশি তৈরি করা হয়। নলের মুখ থেকে ৫´´ ইঞ্চির মধ্যে ১´´ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বালম্বি ছিদ্র করে ভিতরের অংশ বিন্‌বিনি নামের মৌমাছির কালোমোম দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। ছিদ্রের মাঝামাঝি স্থানে মুখের উপর শুকনা বাঁশের পাতা বা কাগজ দিয়ে অর্ধেক বন্ধ করতে হয়। ছয়টি ছিদ্র বিশিষ্ট এই বাঁশির মুখে ফুঁদিলে বেরিয়ে আসে সুন্দর শব্দ। আত্তুবা বাঁশ অর্থাৎ কচি থাকতে যে বাঁশের আগা ভেঙে গিয়েছে এমন বাঁশের নল দিয়ে তৈরি বাঁশি দ্বারা চন্দ্রহরণ মন্ত্র সুরে যুবতী রমণীকে বশীকরণ করা যায় বলে কথিত রয়েছে।

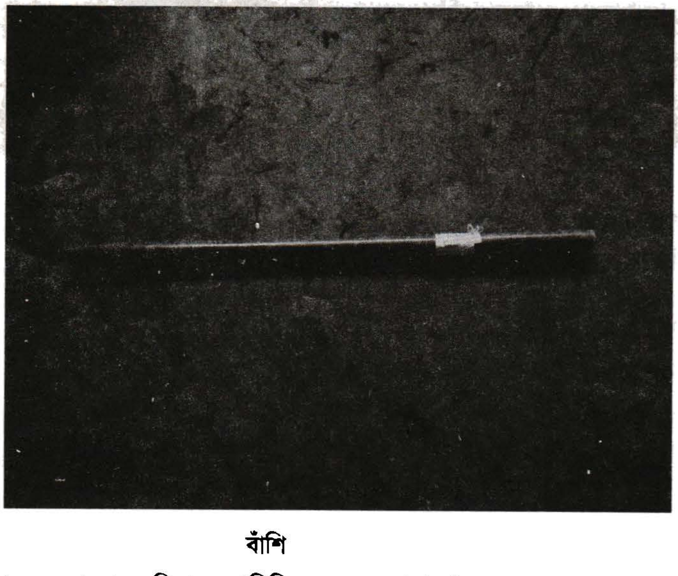

বাঁশি

২. ধুদুগ : ধুধুগ বাদ্য হিসাবে পরিচিত হলেও সাধারণত জুমের ফসল রক্ষার কাজে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। আবার গভীর বনের শিকারীরা একে অপরের সন্ধান নেয় এই ধুধুকের সংকেত শব্দে। দুই প্রান্তে গিড়া থাকে এমন বাঁশের পর্বখণ্ড নিয়ে মাঝখানে বুকটা ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা এবং প্রস্থ ২´´ ইঞ্চি পরিমাণ ছেটে ফেলে এটি প্রস্তুত করা হয়। এটি উদরের একপার্শ্বে ঠেকিয়ে একহাত লম্বা একটি গাছের কাঠি দিয়ে ধুধুকের গায়ে দ্রুত লয়ে আঘাত করে বিভিন্ন তাল সৃষ্টি করা যায়। জুমের টংঘর থেকে রাত্রে বাজানো

www.pathagar.com

ধুধুকের শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যায়। এই ধ্বনি প্রতিধ্বনি চারিদিক নিস্তব্দ পাহাড়ের বনাঞ্চল মুখরিত হয়ে ওঠে। এই রূপ আরেকটি ধুদুগ মাটিতে রেখে দুই কাঠিতে ধুদুগের তাল রক্ষা করে বাজাতে হয়, এটির নাম 'দগর'।

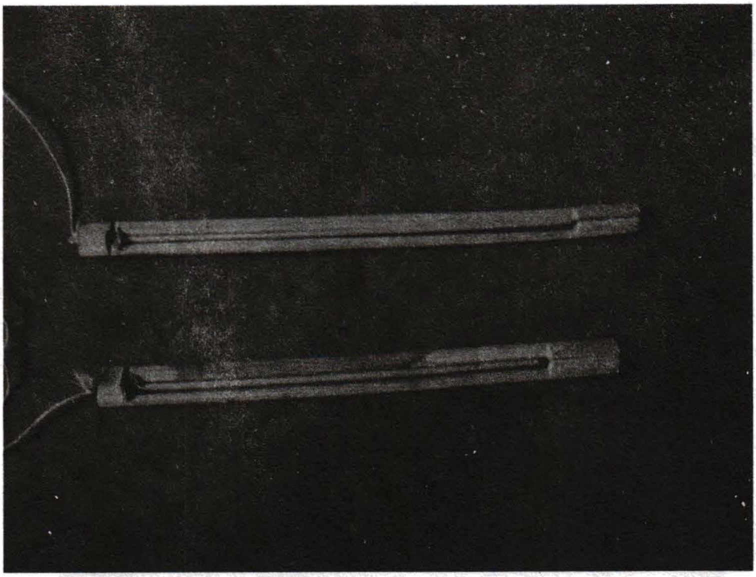

হেংগরং

৩. হেংগরং : হেংগরং নামে বাজনা বাদ্যটি অতি পুরানো কালের। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি এটা দৈর্ঘ্য পাঁচ এবং প্রস্থ হাফ ইঞ্চি বাদ্যটি দুই রানের মাঝখানে আরও একটি জিহ্বা বা রীড থাকে। কঞ্চির মাথায় ঝুটিতে বাঁধা ছয় ইঞ্চি লম্বা সুতা থাকে। হেংগরংটির মাঝখানের রীডটি জিহ্বায় লাগিয়ে থেকে থেকে সূতাটি টানতে টানতে মৃদু তানে নানা ধরনের রাগ রাগিনীর ঝংকার তোলা হয়।

সাধারণত মেয়েরা হেংগরং বাদ্যটি বাজিয়ে থাকে। তারা মনের অব্যক্ত গোপন ভাষা আত্মপ্রকাশ করে, লুকানো রহস্য ভাষা ব্যক্ত করে অন্তরালে বা বিছানায় শুয়ে এ যন্ত্রের মর্মস্পর্শী সুরশ্রী ধ্বনি।

৪. জান্দুরা : বাঁশের ন্যায় উদ্ভিদ বিশেষের দ্বারা প্রস্তুত। দীর্ঘ প্রস্থ প্রায় এক হাতের মত হবে। কাঠিগুলি পাশাপাশি সাজানো থাকে। তার একপৃষ্ঠে ধরে অন্য পৃষ্ঠে করতলঘাতে বাজানো হয়।

৫. শিঙা : গয়াল বা মহিষের শিং দ্বারা তৈরি এই বাদ্যের ধ্বনি এবং শঙ্খের ধ্বনির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে শঙ্খের ধ্বনির চেয়ে এই শিঙার ধ্বনি বহু দূরে চলে যায়। শিঙের আগার অংশ কিছু কেটে ফেলে সেই ছিদ্রের মুখে ফু দিলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। বন্যপশু পাখি তাড়াতে জুমক্ষেতে এটি প্রায় বাজানো হয়।

www.pathagar.com

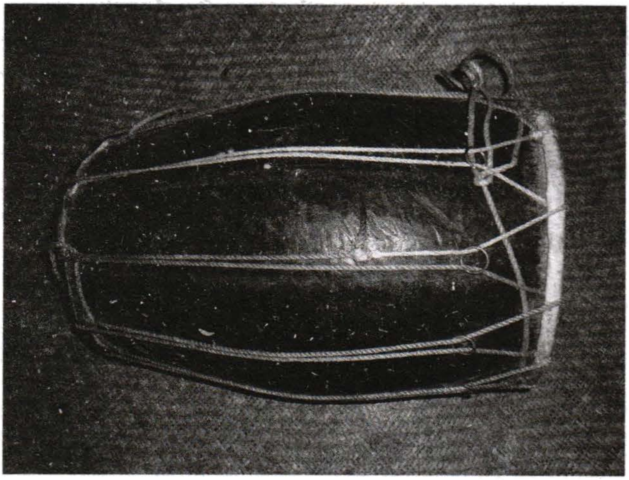

ঢুল বা ঢোল

৬. ঢোল : এটি দেশীয় ঢোলের মতই। কারও মৃত্যুর অব্যবহিত পরে স্নানাদির সময় এবং অন্তেষ্টিক্রিয়াকালে এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। এজন্য প্রায় গ্রামেই 'ঢুল' সংরক্ষণ করা থাকে। তা না হলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে হলেও হাওলাত করে ঢুল আনা হয়।

৭. চুমা : চুমা নামে এই বাদ্যটি বাঁশের এক প্রস্থ চোঙ্গ বা নল। এক প্রান্তে গিরা এবং অপর প্রান্তে মুখ রেখে এক প্রস্থ বড় ডলু বাঁশের লম্বা চুমা বা চোঙ্গ দ্বারা এই বাদ্য সহজেই তৈরি করা যায়। দুই হাতে দুইটি চুমার গিরার অংশ মাটিতে ঠুকিয়ে ঢোলকের শব্দের মতো দুম দুম শ্বদ বের হয় এবং বিভিন্ন তালের বাজনা সৃষ্টি করা যায়।

বেলা বা বেহালা

www.pathagar.com

৮. বেলা : বেলা শব্দটি বাংলায় বেহলা। গেঙখুলী গায়করা তাদের গীত ও সুর ছন্দের সাথে এই বেলা যন্ত্রটি ব্যবহার করে থাকে, বলা যায় এই বাদ্যটি তাদের একমাত্র সহায়ক। পাহাড়ি পটু কারিগরেরা মারল গাছ দিয়ে খুব সুন্দর বেলা তৈরি করে থাকে।

পাংখোয়াদের বাদ্যযন্ত্র (লা সাকনা মানরোয়া)

১. সিয়াল রাকি (গয়ালের শিং) ২. ডার সন (ছোট্ট পিতলের ঘনটি) ৩. ডার পুই (মং বা বড় ঘন্টা) ৪. খোয়াং (গাছের তৈরি ঢোল) ৫. থেই খাং (এক কৌটা বাশ) ৬. রুয়া খোয়াং (বাঁশের ঢোল) ৭. রুয়া টিংটাং (বাঁশের গীটার)

তথ্যসহায়ক

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, সুগত চাকমা, প্রকাশনায়- গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা, প্রকাশ কাল- ২০০৯, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি
২. বাংলাদেশের আদিবাসী : এথনোগ্রাফিয় গবেষণা, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ৬২ প্রবাল হাউজিং, রিংরোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, গবেষণা ও সম্পাদনা : মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খবশী, পল্লব চাকমা, মংসিংঞো মারামা ও হেলেনা বাবলি তালাং
৩. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি, সম্পাদনা- ফিলিপ গাইন ও পার্থ শংকর সাহা, প্রকাশক- প্রকাশ কাল- ২০০৭, সোসাইটি ফর এনভাইরনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা
৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখোয়া ভাষা ও সাহিত্য, লেখক- শাওন ফরিদ, প্রকাশ কাল- ২০০৬
৫. এড. মিহির বরণ চাকমা, সভাপতি, জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল (জাক), রাঙ্গামাটি
৬. মি : মৃত্তিকা চাকমা, কবি, নাট্যকার ও প্রকাশক, রাঙ্গামাটি
৭. মি : লাল ছোয়াক লিয়ানা পাংখোয়া, প্রকল্প সমন্বয়কারী, গ্রীণ হিল, রাঙ্গামাটি
৮. মি : সঞ্জয় তঞ্চঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
৯. থোয়ই চ প্রু খিয়াং, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি
১০. নিকোলাই পাংখোয়া, বসন্ত পাংখো পাড়া, রাঙ্গামাটি
১১. রন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, সংস্কৃতি কর্মী, ভোয়াল্যা, রাঙ্গামাটি
১২. মিজ. নুকু চাকমা, প্রোগ্রাম অফিসার, এআরএ ডি প্রজেক্ট, সিআইপিডি, রাঙ্গামাটি
১৩. মি : পার্থ প্রতিম তালুকদার, পিপিআইআর প্রকল্প, কপো সেবা সংঘ, রাঙ্গামাটি
১৪. মিজ. সীমা দেওয়ান, সংস্কৃতি ও মানবাধিকার কর্মী, বনরূপা, রাঙ্গামাটি
১৫. মি : তিমথি খিয়াং, সিডি প্রকল্প, সিএইচটিডিএফ, ইউএনডিপি, রাঙ্গামাটি
১৬. মি : উ রাখাইন কায়েস, সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মী, রাঙ্গামাটি
১৭. মিজ. মিলি প্রু মার্মা, ছাত্রী, বয়স- ১৪, রাঙ্গামাটি

www.pathagar.com

লোকউৎসব

১. বিঝু, সাংগ্রাই, বিসু, বৈসু

তিন পার্বত্য জেলায় আদিবাসীরা অনেক উৎসব পালন করে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিঝু। পুরানো বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে এ উৎসবের শুরু।

এ উৎসবকে ত্রিপুরারা 'বৈসু' চাকমারা 'বিঝু' তঞ্চঙ্গ্যারা 'বিসু' আর মারমারা 'সাংগ্রাই' বলে থাকে। এই চার সম্প্রদায়ের নামকে একত্র করে এই উৎসবের নাম এখন বৈসাবি। এ উৎসব প্রতিবছর ইংরেজি এপ্রিল মাসের ১২, ১৩ ও ১৪ তারিখ এবং বাংলা চৈত্র মাসের ৩০ ও ৩১ তারিখ এবং নতুন বছরের বৈশাখের ১ তারিখ পালন করা হয়।

এ সময় অবশ্য পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম উৎসব মুখর থাকে। চাকমারা বিঝুর প্রথম দিন সারা বাড়ি ঘর পরিষ্কার করে। ভোর সকালে নদীতে ফুল ও প্রদীপ ভাসিয়ে এ উৎসবের উদ্বোধন করে। ঐ দিন ঘর ফুল দিয়ে ঘর সাজানো হয়। বাড়ির পোষা মুরগী, কুকুর, বিড়াল এমন কী পাড়ার অন্যান্যদের পোষা প্রাণীকে সে দিন সবাই খাবার খাওয়ায়। পরের দিনকে চাকমারা বলে মূল বিঝু। মূল বিঝুর দিন সবাই বিশেষ করে ছোট ছেলে মেয়েরা ভোর সকালে উঠে নদীতে স্নান করতে যায়। স্নান করে নতুন জামা কাপড় পরে।

সে দিন সবার বাড়িতে 'পাজন' রান্না হয়। পাজন শুটকি দিয়ে রান্না করা এক ধরনের নিরামিষ। প্রত্যেক বাড়িতে এটি রান্না হয়। পাজন ৩০-৪০ পদ সব্জি মিশিয়ে রান্না হয়। এর সাথে পিঠা ও অন্যান্য মিষ্টান্ন তৈরি হয়। একটু বেলা হলে ছেলে মেয়েরা আশে পাশে দল বেধে আত্মীয় প্রতিবেশীদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। অনেককাল আগের বিশ্বাস হচ্ছে যদি ৭ ঘরের পাজন খাওয়া যায় তাহলে সারা বছর শরীর ভালো থাকবে। এজন্য সবাই চেষ্টা করে ৭ ঘর ঘুরে আসতে। এ জন্য সবাই চেষ্টা করে এটা করতে।

এছাড়া এই দিন সবাই গুরুজনকে প্রণাম করে ও মন্দিরে ভান্তেদের পাজন ও পিঠা পৌঁছে দিতে যায়।

নতুন বছরের প্রথম দিন চাকমারা পাজন ও অন্যান্য মিষ্টান্ন তৈরি করে। এই দিন কেউ কোন পরিশ্রমের কাজ করে না। এ দিন বয়স্করা সবার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে ও আত্মীয় প্রতিবেশীদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। বিকালে সবাই মন্দিরে যায় ও নতুন বছরে ভালো থাকার জন্য সবাই সবার জন্য প্রার্থনা করে।

www.pathagar.com

ফুল বিঝুর দিন নদীতে ফুল ও প্রদীপ ভাসানো পর্ব

সাংগ্রাই উৎসবে মারমাদের পানি খেলা পর্ব

মূল বিঝুর দিন খাওয়া দাওয়া পর্ব

www.pathagar.com

২. রাজ পুন্যাহ্

রাজ পুন্যাহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র পাহাড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মহা আনন্দ ও মিলনের পুণ্য লগ্ন। এই দিনটা সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে রাজা কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এই পুন্যাহ্'র দিনে মৌজার হেডম্যানরা প্রজাদের নিকট হতে খাজনা উসুল করে রাজ ভাণ্ডারে জমা দেওয়ার জন্য রাজ দরবারে সমবেত হয়।

এই পুন্যাহ্ উপলক্ষ্যে রাজ দরবারের আশেপাশে তিনদিন ব্যাপী মেলার আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে দূর-দূরান্ত হতে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। রাজা গণ্যমান্য আমন্ত্রিত অতিথি ও হেডম্যানদের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে একটি বিশিষ্ট কারুকার্য শোভিত মণ্ডপে রাজকীয় পোশাক পরিহিত হয়ে উপবেশন করেন। রাজ দরবার জন সমাবেশে পরিপূর্ণ হলে তোপধ্বনি সহকারে খাজনা উসুল করার কাজ শুরু হয়। রাজার আমলা বৃন্দ খাজনা জমা নেওয়ার সমস্ত কার্যাদি সম্পাদন করে। চাকমা সার্কেলে এই পুন্যাহ অনুষ্ঠান নিয়মিত অনুষ্ঠিত না হলেও বোমাং সার্কেলে প্রতি বৎসর এই পুন্যাহ্ অনুষ্ঠিত হয়।

৩. বিবাহ্ উৎসব

চাকমাদের বিবাহ্ উৎসব

অভিভাবক কর্তৃক পাত্র-পাত্রী নির্বাচন পদ্ধতি

ক. প্রস্তাব প্রেরণ ও মতামত (সম্মতি বা অসম্মতি) সংগ্রহ : পাত্রের অভিভাবক নিজ উদ্যোগে অথবা নিকটাত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিবাহযোগ্য ও পছন্দনীয় পাত্রীর খোঁজ নেয়। বিবাহযোগ্য ও পছন্দসই পাত্রীর খোঁজ পেলে আত্মীয় বা পাড়ার কোনো বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে সেই পছন্দনীয় পাত্রীর বাড়িতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছার কথা পৌঁছে দেওয়া হয়।

চাকমা ভাষায় এ ধরণের ইচ্ছা প্রকাশকে 'উদা লনা' (খোঁজ নেয়া) বলা হয়। পাত্রীপক্ষের জবাব ইতিবাচক হলে বিবাহের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্বগুলো শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে বিবাহের চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হয়। যদি প্রস্তাবের বিপরীতে নেতিবাচক জবাব আসে তাহলে সেই পরিবারের সাথে বিবাহ সম্পর্কের উদ্যোগ সেখানেই শেষ হয়।

ব্যাখ্যা : পাত্রপক্ষের প্রস্তাব পাওয়ার পর পাত্রীপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয় না। পরিবারের ঘনিষ্ট আত্মীয় যথা : পাত্রীর পিতৃকূল ও মাতৃকূলের বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের মাধ্যমে পাত্রের পরিবারের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থান, পাত্রের ব্যক্তিগত চরিত্র ও গুণাবলি সম্পর্কে গোপনে খোঁজখবর নেয়। এতে যদি পাত্রের পরিবারের সাথে (বৈবাহিক) সম্পর্ক স্থাপন না করার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পায়, তাহলে পাত্রীপক্ষ পাত্রপক্ষের প্রস্তাবে নেতিবাচক সাড়া দিতে পারে। আর যদি পাত্রপক্ষের পরিবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সম্মতি দেয়ার মতো অনুকূল মনে হয়, তাহলে পাত্রীপক্ষ ইতিবাচক সাড়া দেয়।

www.pathagar.com

চাকমাদের বিবাহ

একবার সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে মত দেয়ার পর বিবাহের চূড়ান্ত অনুষ্ঠান পর্বের পূর্ববর্তী ধাপ/পর্বগুলো শুরু হয়ে যাওয়ার পর পাত্রীপক্ষ তাদের সম্মতি প্রত্যাহার করে নিতে পারে না। অনুরূপভাবে পাত্রপক্ষও বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে পারে না। কারণ পাত্রী নির্বাচন ও বিবাহ পূর্ব আনুষ্ঠানিকতা বা পর্বগুলো শুরু হয়ে যাওয়ার পর ঘটনা সমাজে জানাজানি হয়ে যায়। তাই যে কোনো পক্ষ বিবাহের উদ্যোগ থেকে সরে গেলে সমাজে অপরপক্ষের সম্মানহানি ঘটে। পাত্র বা পাত্রী যে পক্ষই অপরপক্ষের মান বা সম্মানহানি ঘটায় সে পক্ষই অপরপক্ষকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ 'লাজভার' দিতে বাধ্য।

খ. **কনে দেখা (বৌ চা যানা)** : পাত্রীপক্ষের ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার পর পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রীপক্ষকে জানিয়ে নির্ধারিত একটি শুভদিনে পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বয়োজ্যেষ্ঠ কয়েকজন লোকসহ সামর্থ অনুযায়ী মদ, পান, সুপারী, নারিকেল (কমপক্ষে একজোড়া), শুটকি মাছ, কয়েক প্রকারের পিঠা নিয়ে পাত্রীর বাড়িতে যান এবং সেদিনই বিবাহের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেন। পাত্রীপক্ষের আনুষ্ঠানিক সম্মতি লাভের পর পাত্রীপক্ষের দাবী-দাওয়ার বিষয়গুলো চূড়ান্ত করার জন্য পাত্রপক্ষকে কয়েকবারই পাত্রীপক্ষের বাড়িতে যেতে হয়।

উভয়পক্ষের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনে কনে দেখা পর্বে বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই বিবাহের/বিয়ের শুভ দিনক্ষণ নির্ধারণ ও পাত্রীপক্ষের দাভা (পণ) যথা : কনে সাজানোর পোশাক, অলংকারের প্রকার, সংখ্যা এবং প্রত্যেকটি অলংকারের ওজন নির্ধারণের জন্য পাত্রপক্ষের তরফ হতে দ্বিতীয়বার পাত্রীপক্ষের বাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়বার পাত্রীপক্ষের বাড়িতে যাওয়াকে চাকমা কথায় দ্বিপুর (দ্বিতীয় সফর) বলে।

www.pathagar.com

দাভা বলতে নগদ টাকা, চাউল ও দ্রব্যসামগ্রী, যেমন : কিছু নগদ টাকা, ২০/২৫ সের বা এক/দুই মণ চাউল, বিবাহ উপলক্ষ্যে ভোজের জন্য কমপক্ষে একটি শুকর ইত্যাদি দাবি করা হয়ে থাকে। উভয়পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই দাভার পরিমাণ নগদ টাকায় ও অন্যান্য সামগ্রী নির্ধারণ করা হয়।

অনুরূপভাবে পাত্রীকে উপহার হিসেবে দেয়া অলংকারাদির প্রকার ও প্রত্যেকটির ওজনও উভয়পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। দ্বিপুর বা দ্বিতীয়বার পাত্রীপক্ষের বাড়িতে গিয়েও বিয়ের/বিবাহের চূড়ান্ত দিন, তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই তৃতীয়বার যাওয়ার প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে।

সাধারণত তৃতীয়বারে পাত্রীর পক্ষের বাড়িতে যাওয়ার পরই বিবাহের চূড়ান্ত দিন, তারিখ নির্ধারণ হয়ে যায় বলে এই পর্বকে মদ পিলাং গজানি (গছানি) বলা হয়।

গ. **থক ধরা যানা (বিবাহের প্রস্তুতির ব্যাপারে শেষবারের মত খবর নেয়া) :** বিবাহের দিন, তারিখ নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর উভয়পক্ষে বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি যথা : বিবাহের ভোজে নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা, ভোজের মাছ-মাংসের পরিমাণ, নিমন্ত্রিতদের জন্য মদ চোলাই, চাল, ডাল ইত্যাদি খরিদ করা শুরু হয়ে যায়। বিয়ের নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে পাত্রীপক্ষের দাবিকৃত দাভা যথা : শুকর, চাউল ও নগদ টাকা এসব পাত্রপক্ষের পরিবারের একজন সদস্য বা নিকটাত্মীয় নিজ দায়িত্বে পাত্রীপক্ষের বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

এছাড়াও নির্ধারিত দিনে পাত্রীপক্ষ বিবাহ অনুষ্ঠান বা মেলা সম্পন্ন করতে প্রস্তুত আছে কিনা বা পরিবারের সবাই সুস্থ আছে কিনা কিংবা কোনো অনিবার্য কারণে বিবাহের দিন পিছিয়ে দিতে হবে কিনা ইত্যাদি খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য পাত্রপক্ষের কোনো একজন আত্মীয়কে অনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রীপক্ষের বাড়িতে যেতে হয়।

ক. **কনে/বৌ আনতে যাওয়া (বরযাত্রী) :** পাত্র ও পাত্রীপক্ষ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে 'বৌ হজা যেয়ে' (বৌ আনার দল) ও 'বৌ বারে দিয়া' (বৌকে বরের বাড়ি পৌঁছানো) দলের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করে নেয়। বরপক্ষ থেকে 'বৌ হজা যেয়ে' দল বেজোড় সংখ্যক বৌ আনার জন্য যায়। 'বৌ হজা যেয়ে' ও 'বৌ বারে দিয়া' দলের সদস্যদের মধ্যে যুবক-যুবতীরা সংখ্যায় বেশী থাকে। উভয় দলের বাকী সদস্যদের মধ্যে থাকে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা, যারা বর ও কনেপক্ষের প্রভাবশালী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তবে বরপক্ষের কয়েকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য সদস্য থাকেন তারা হলেন যথাক্রমে : সাবালা, বৌ আদনি (কনের পথ প্রদর্শক) ও 'ফুর বারেং বুগনি' (কনে সাজানোর পোশাক ও অলংকারাদি বহনের জন্য কারুকার্যময় ঝুড়ি বহনকারী)।

'বৌ আদনি' হলেন বরের ঠাট্টা সম্পর্কীয় যথা : আপন বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নানু (নানী) বা অনুরূপ সম্পর্কের একজন প্রৌঢ়া মহিলা। 'সাবালা' হলেন বরের ঠাট্টা সম্পর্কীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বিশেষত আপন অথবা কাকাতো, জেঠাতো বোনের স্বামী (ভগ্নিপতি) সম্পর্কের একজন সমর্থ পুরুষ যিনি বরপক্ষ ও কনেপক্ষের যুবতি মেয়েদের সাহায্যে কনেকে অলংকারাদি পড়ান। তাকে অবশ্যই স্বপত্নীক হতে হয়। তার আরেকটি কাজ হলো, কনের পিতা-মাতা বা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মতিতে

www.pathagar.com

কনেকে বাপের বাড়ি তুলে আনা, এমনকি কনের অনিচ্ছা প্রকাশের আবেগকে সামলে আনা।

খ. বৌ তুলানা (বধুবরণ) : কনে নিজ বাড়ি থেকে বরের বাড়ি পৌঁছুলে কলসির উপর রাখা মোমবাতি/সলতে জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং বাড়িতে বৌ তোলার (বধূবরণ) অনুমতি দেয়া হয়। বৌ তোলার অনুমতি পাবার পর বরের ছোট ভাই বা বোন বা বরের নিকট আত্মীয় সম্পর্কের একজন ছেলে অথবা মেয়ে বাড়ির মূল প্রবেশ পথে একটা পিঁড়ি পেতে কনের পা ধুইয়ে দেয়। অতঃপর বরের মা (যদি সধবা হন) অথবা অন্য একজন সধবা বয়স্ক মহিলা প্রবেশ পথের দুইপাশে রাখা দুটি কলসির গলায় বাধা সাত প্রস্থ সুতা কেটে কনের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে বেঁধে দেয়। এরপর বৌ'কে ফুল ঘরে (ফুল দিয়ে সাজানো কনের জন্য নির্ধারিত কক্ষে) নিয়ে যাওয়া হয়।

চুমুলাং (পুজা) : চাকমা সমাজে বিবাহের মূল অনুষ্ঠান হলো চুমুলাং। 'চুমুলাং' অনুষ্ঠানে একজন ওঝা বা পুরোহিতের দরকার হয়। তাকে বর-কনের উপরিস্থ 'খেইল্যা কুদুম' (গুরুজন সম্পর্কীয়) হতে হয়। চুমুলাং এর সময় একই বেদীতে দুটি পুজার ঘট বসানো হয়। বরের জন্য নির্দিষ্ট সামমুয়াতে চাল ও কনের জন্য দেওয়া হয় ধান। 'সামমুয়া' হলো বাঁশ-বেতের তৈরি ঢাকনাযুক্ত একপ্রকার পাত্র বা ঝুড়ি। চুমুলাং পুজায় একটি শুকর, তিনটি মুরগি (মোরগ) ও মদ উৎসর্গ করা হয়। ওঝা মন্ত্রপাঠ করে থাকে। চাকমা ভাষায় চুমুলাং এর দেবতা (দেবী) হলো পরমেশ্বরী। চুমুলাং পুজার মাধ্যমে নবদম্পতির দাম্পত্য জীবন শুরু করার জন্য সমাজের উপস্থিত সকলের সম্মতি গ্রহণ করতে হয়। চুমুলাং পুজার পরিচালনাকারী ওঝা বিয়ের একজন প্রধান সাক্ষী রূপে গণ্য হয়ে থাকে।

জদনবানাহ্ : চাকমা সমাজে বিয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের নাম 'জদনবানাহ্'। 'জদনবানাহ্' এর অর্থ হলো, বর-কনের জোড়া বাঁধা বা জোড়া বন্ধন। এই অনুষ্ঠানটি মূলত সামাজিক আচার নির্ভর। এতেই বর-কনে সমাজের স্বীকৃতি লাভ করে। এখানে মন্ত্রোচ্চারণের কোনো বালাই নেই। বরের বড় ভগ্নিপতি সম্পর্কীয় একজন 'সাবালা' এসে নবদম্পতির জন্য সাজানো একটি কক্ষে বরের বামে কনেকে বসিয়ে উচ্চস্বরে বিয়েতে উপস্থিত জনমণ্ডলীর মতামত প্রার্থনা করে- 'অমুক আর অমুকের জদনবানি দিবার উঘুম আঘেনে নেই'। অর্থাৎ অমুক আর অমুক বর-কনের জোড়া বাধার হুকুম (অনুমতি) আছে কিনা, সবাই তেমনি উচ্চস্বরে 'আছে-আছে' বলে স্বীকৃতি জানালে সেই সাবালা ব্যক্তিটি সাত হাত লম্বা এক খণ্ড সাতা বস্ত্র দিয়ে বর-কনে উভয়ের কোমরে জড়িয়ে বেঁধে দেয়। সমাজে যাতে গোপনে কোনো অবৈধ বিয়ে হতে না পারে সেজন্য এরূপ বিধি-বিধান চালু রাখার মূখ্য উদ্দেশ্য। আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পরে আবার সমাজের অনুমতি নিয়ে বাঁধন খুলে দেয়া হয়। উপবিষ্ট বর আর কনে তখন তড়িৎ গতিতে যার যার আসন থেকে উঠে দাঁড়ায়। সমাজের বিশ্বাস, আসন থেকে যে আগে উঠতে পারে সেই সারাজীবন অপরজনের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারে।

খানা সিরানা/খানা সিরেদেনা : খানা সিরানা/খানা সিরেদেনা-এর অর্থ হলো সমাজের দায়-শোধ করা। বিবাহ কার্যে সমাজের স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে বর

www.pathagar.com

সমাজের কাছে ঋণী হয়। তার এই ঋণ বা দায়-শোধ করতে সে বাধ্য। খানা সিরানার মাধ্যমে সমাজের কাছে তার এই দায়-শোধ হয়ে যায়।

বিয়েতে সামর্থ অনুসারে একটি সামাজিক খানা দেয়া (ভোজের আয়োজন) এক প্রকার বাধ্যতামূলক। এর ব্যত্যয় ঘটলে সামাজিক দন্ডের বিধান আছে। বিয়ের খানায়, 'টক' জাতীয় একটি অপরিহার্য তরকারী (ব্যঞ্জন) থাকে, যাকে চাকমা ভাষায় 'খাদা' বলা হয়। 'খাদা' খাওয়া না হলে 'খানা সিরানা' ব্যাপারটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়'। এই 'খানা সিরেদেনা' কাজ সামাজিক বৈধ বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ। খানা সিরানার পর এই বিবাহ সম্পর্কে সমাজের আর কোনো প্রকারের আপত্তি বা দাবি-দাওয়া থাকে না। যারা বিয়ের 'খানা সিরেদেনা' পর্ব সমাপ্ত করে না তাদের মৃত্যু হলে সমাজের লোকেরা তাদেরকে শ্মশানে নেয়ার সময় কাঁধের নীচে করে নেয়া হয়, কাঁধে তুলে না।

বরের শ্বশুরালয় গমন (বেষুত ভাঙ্গা যানা) : বিবাহ কার্য সম্পন্ন হবার পরের দিন, অগত্যা দ্বিতীয় দিনে বর ও নববধুকে কনের পিতার বাড়িতে যেতে হয়। এই যাবার নাম চাকমা কথায় 'বেষুত ভাঙ্গা' বলে। এই বেষুত ভাঙ্গার কাজ সম্পন্ন না করে নবদম্পতি সহবাস ও একত্রে বসবাস করতে পারবে না। এমনকি 'বেষুত ভাঙ্গা' সম্পন্ন না করে বর ও নববধুর অন্য কারো বাড়িতে যাওয়া নিষেধ। বেষুত ভাঙ্গা যাবার সময় সাধারণত নবদম্পতি বাড়িতে তৈরি নানা রকমের পিঠা শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাই। কোনো কারণে কনের পিতার বাড়িতে নির্দিষ্ট সময়ে 'বেষুত ভাঙ্গা'য় যাওয়া সম্ভব না হলে নিকটস্থ কনের স্বগোত্রীয় গুরুজন সম্পর্কিয় কোনো পুরুষ আত্মীয়ের বাড়িতে 'বেষুত ভাঙ্গা' সম্পন্ন করা বিধেয়। তাও সম্ভব না হলে চিরসবুজ ছায়াযুক্ত গাছের ছায়ার তলে বেষুত ভাঙ্গার কাজ সম্পন্ন করার বিধি আছে। যথাসময়ে বেষুত ভাঙ্গার কাজ সম্পন্ন হলে বাড়িতে নববধুসহ 'বুরপারার' কাজ সম্পন্ন করতে হয়। অধুনা 'বুরপারার' পরিবর্তে বৌদ্ধ ভিক্ষু (পুরোহিত) দ্বারা 'ফারেগ' (মন্ত্র) শুনা হয়।

তঞ্চঙ্গ্যাদের বিবাহ উৎসব

১. **তেম্মাং (শলাপরামর্শ) :** বিবাহযোগ্য পাত্রের পিতা-মাতা, অভিভাবক বা আত্মীয়স্বজন তাদের পছন্দনীয় পাত্রীর সন্ধান পেলে অথবা পুত্রের মনোনীত বা পছন্দের পাত্রীর খোঁজ পেলে ঘরোয়া বৈঠকে শলাপরামর্শ করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

২. **বউ পুছা গরানা :** প্রাথমিকভাবে পাত্রীপক্ষের সম্মতি পাওয়া গেলে শুভদিন নির্ধারণ করে পাত্র পক্ষকে পাত্রীর বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যেতে হয়। পাত্রীর বাড়িতে এক জোড়া নারকেল, পান-সুপারী, পিঠাসহ নানা উপকরণ নিয়ে 'বউ পুছা গরানা' যেতে হয়। এভাবে তিনবার পাত্রীর বাড়িতে যেতে হয় এবং তৃতীয়বারে বিয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। বিয়ের প্রস্তাবের প্রথমবারেই পাত্রীপক্ষ রাজী হয় না। তবে ইচ্ছা হলে পাত্রপক্ষের দ্বিতীয়বারের প্রস্তাবে পাত্রীপক্ষ বিয়ের সম্মতি দিতে পারে। বিয়েতে পাত্রীপক্ষ সম্মত হলেই পাত্রপক্ষের নিয়ে যাওয়া উপকরণ সামগ্রী গ্রহণ করে এবং পাত্রপক্ষকে আপ্যায়নের মাধ্যমে বিয়ের শুভদিন ও দাভাসহ বোয়ালী/সাজনী সামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

www.pathagar.com

তঞ্চঙ্গ্যা বর-কনে

৩. **দাভা :** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে কনেপণ (দাভা) প্রথা প্রচলিত আছে। পাত্র বা তার পিতাকে পাত্রীর পিতার নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ পণ হিসেবে পরিশোধ করতে হয়। এই পণ প্রথাকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় 'দাভা' বলে। দাভা পরিশোধ করা সামাজিক নিয়মে বাধ্যতামূলক। তবে মনোমিলনে বা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে হলে পাত্রীর বাবা পাত্রপক্ষের কাছে দাভা বেশি দাবী করতে পারেন। কন্যা পালিয়ে গেলে বা পিতার অমতে বিয়ে করলে পিতা তার কন্যাকে তিনবার পর্যন্ত নিজ হেফাজতে ফেরৎ পাবার অধিকার রাখেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দাভার পরিবর্তে পাত্রীর মাকে 'দুধলী পয়সা' (মেয়েকে বুকের দুধ খাওয়ানো বাবদ) হিসেবে কিছু টাকা উপঢৌকনস্বরূপ দেয়া হয়।

৪. **সাজনী :** তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের সামাজিক/নিয়মিত বিয়েতে কনে সাজানোর কাপড়-চোপড়, অলংকার ও প্রসাধনী সামগ্রী পাত্রপক্ষের কাছে দাবী করা হয়। এসব সামগ্রীকে সাজনী বলা হয়। কনেপক্ষের দাবী করা সাজনী দিতে বরপক্ষ বাধ্য থাকে এবং এটি কনের সম্পত্তি বা স্ত্রী ধন হিসেবে গণ্য হয়। বউ পুছা গরানার এ সকল আনুষ্ঠানিকতার পর কোনো কারণে যদি কনেপক্ষ বিয়েতে অসম্মতি জানায়, তাহলে সমাজের কাছে সেটা অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় এবং পাত্রের বাবা কিংবা অভিভাবকের নিকট পাত্রীর বাবাকে সামাজিক দন্ড হিসেবে ক্ষমা প্রার্থনা করে 'লাজভার' (জরিমানা) দিতে হয়। পাত্রপক্ষের বেলাতেও অনুরূপ অপরাধের জন্য দন্ড দিতে হয়। সাধারণত যে পাত্রীর বউ পুছা গরানা হয় সেই বিয়ের প্রস্তাব ভেঙ্গে না গেলে অন্য কোনো পাত্রের পক্ষ থেকে সেই পাত্রীর জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেয়া সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ।

৫. **বউ খজা যানা (বরযাত্রী যাওয়া) :** বিয়ের (সাঙা) দিন বরকে সাজিয়ে নিয়ে বয়স্ক একজন পুরুষ ও একজন মহিলা (এ'দুজন বরের বাবা ও মায়ের ভূমিকা পালন

www.pathagar.com

করে থাকেন) কনের সাজনী সামগ্রীসহ বরযাত্রীর সাথে রওয়ানা হয়। সাজনী সামগ্রী ভর্তি 'ফো-কাল্লুং' নেবার জন্য বরের চেয়ে বয়সে ছোট একজন কিশোরী বা যুবতিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। বরের বন্ধু বা দুলাভাই সম্পর্কিত একজনকে অবশ্যই সাথে থাকতে হয়। তিনি সর্বদা বরের পাশে থেকে বিয়ের অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন এবং বরের পক্ষে কথা বলেন। তাঁকে 'সাবালা' বলা হয়। প্রথমে সাবালা, এরপর বর ও বরের পেছনে 'ফো-কাল্লুং' বহনকারী, এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে পুরুষ ও মহিলা মিলে বেজোড় সংখ্যক বরযাত্রী দল রওয়ানা হবার রীতি আছে। আবার নতুন বউ নিয়ে জোড় সংখ্যা মিলিয়ে বরযাত্রীদের ফিরে আসার নিয়ম রয়েছে।

৬. **জামাই তোলা (বরবরণ) :** কনের বাড়িতে বরযাত্রীদল পৌঁছার সাথে সাথে বিয়ের আসরে কনেকে লুকিয়ে (বউ লুগানা) রাখা হয়। কনের চেয়ে ছোট বয়সের একজন কিশোরী বাড়ির দরজায় বরের বাবা-মা ও বরের পা ধুয়ে দিয়ে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়। কনের ভাবী বা ভাবী সম্পর্কের একজন মহিলা যার কোনো সন্তান মারা যায়নি এমন অথবা ভগ্নিপতি সম্পর্কীয় একজন পুরুষ এসে একটি ডিম হাতে নিয়ে বরের মাথার চারপাশে ঘুরিয়ে পেছন দিকে ছুড়ে ফেলে দেন। এরপর তিনি নিজের ডানহাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে বরের বামহাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল ধরে বরকে ঘরে তুলে নিয়ে কনের পাশে বসিয়ে দেন। এ সময় বর ও কনে উভয়ের মাঝখানে পর্দার আড়াল রাখা হয়। কনের জন্য আনা সাজনী সামগ্রী দিয়ে বউ সাজানো শেষে সেই পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়।

৭. **ল্লাত্তংবানা বা ফং গরানা :** কনেপক্ষের একজন 'সাবালা' বিয়ের অনুষ্ঠানে বর ও কনেকে ঘনিষ্টভাবে পাশাপাশি বসিয়ে দিয়ে একটি সাদা কাপড় দিয়ে উভয়ের কোমড় বেঁধে দেয়। এরপর কনের ডান হাতের তালুর উপর বরের ডানহাতের তালু রেখে সাবালাকে মঙ্গল ঘট হাতে নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের কাছে পর পর তিনবার বিয়ে সম্পন্ন করার অনুমতি চাইতে হয় (অমুকের লগে অমুকের ল্লাত্তং বানি দির/ফং গরি দির, হুগুম আগে নি নেই)। সকলে সমবেত কণ্ঠে সম্মতি জ্ঞাপনের (আছে, আছে, আছে) পর সাবালা মঙ্গল ঘটের পানি বর-কনের হাতের তালুতে ঢেলে দিয়ে ল্লাত্তংবানা/ফং গরানা সম্পন্ন করে বিবাহ কর্ম সমাজসিদ্ধ করেন। এ সময় 'সাবালা' ও উপস্থিত সকলে সমবেত কণ্ঠে 'পাত-তুরুতুরু' শব্দে বিয়ের শুভ সূচনা করেন। এরপর বর ও কনেকে সাবালা ৭ বার ওঠা-বসা করান। এটাকে বলা হয় 'নাচে দেনা' (আনন্দে নৃত্য করা)। বিয়ের দিনে 'চুমুলাঙ' পূজা করা হয়।

৮. **চুমুলাঙ পূজা :** চুমুলাঙ পূজা একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান ছাড়া বিয়ে সমাজসিদ্ধ হয় না বা স্বামী-স্ত্রী রূপে একের ওপর অপরের প্রতি সামাজিক অধিকার জন্মায় না। এই অনুষ্ঠানে ডিম, মোরগ-মুরগি ও মালা (পুরুষ) শুকর ইত্যাদি বলি দিতে হয় এবং মদ পরিবেশন করতে হয়। পরমেশ্বরী, লক্ষ্মী, কালিয়া, নেই নাইঙ্যা বা রাক্ষল্যা দেবতার উদ্দেশ্যে 'ওসা' (ওঝা) দিয়ে চুমুলাঙ পূজা করা হয়। বিবাহের ভবিষ্যত ভাল-মন্দ দেখার জন্য ওসা'কে দিয়ে চাম্বা

www.pathagar.com

দেখা হয়। (মৃত মোরগের ঠোটের নিচের যামী ও জিহবা দেখে ভাল-মন্দ গণনা করে ভবিষ্যৎ বাণী করাকে 'চম্বা চানা' বলে)। আধুনিক তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বর্তমানে চুমুলাঙ পূজার প্রচলন কমে গিয়ে অধিকাংশ বিয়েতে বৌদ্ধ ভিক্ষু এনে ধর্মীয় আচার পালন করা হয়।

৯. **সেফ মাগানা :** ল্যাত্তংবানা অনুষ্ঠানের পর নবদম্পতিকে মাথায় পাগড়ী (খবং ও ভং) পরিয়ে উপস্থিত গুরুজন ও গণ্যমান্য বয়স্কদের ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হয়। আশীর্বাদকারীরা তুলাতে সামান্য থু থু (সেফবত্তা) দিয়ে নবদম্পতির সুখ ও মঙ্গল কামনা করে তাদের মাথায় গুঁজে দেয়। এতে তুলা, চাউল, খই এসবের ব্যবহারেরও প্রচলন আছে।

১০. **খানা সিরানা :** বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে কনের বাড়িতে আসা বরযাত্রী, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনসহ ও আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী ভোজে আপ্যায়ন করা হয়। এটিকে 'খানা সিরানা' বলে। এই ভোজ বা খানা না দিলে সেই বিবাহিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার লাশ কাঁধে না তুলে হাঁটুর নিচে রেখে অসম্মানজনকভাবে শ্মশানে নেওয়া হয়।

১১. **বউ তুলানা (বধুবরণ) :** বিয়ের পর ৭ দিন পর্যন্ত (বর্তমানে ১/২ দিন) বরকে শ্বশুর বাড়িতে থাকার নিয়ম আছে। এরপর নতুন বউ নিয়ে বরযাত্রীরা বরের বাড়িতে ফিরে এলে বউ তুলানা (বধুবরণ) অনুষ্ঠানে বর-বধুকে ফুল দিয়ে সাজানো ঘরে নিয়ে বসানো হয়। এসময় বৌদ্ধ ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করে এনে মঙ্গল সূত্র শ্রবণের মধ্য দিয়ে মাঙ্গলিক আচার সম্পন্ন করা হয়। বউ তুলানা উপলক্ষে বরের বাড়িতেও ভোজের (খানা সিরানা) আয়োজন করা হয়।

১২. **সেফ মাগা যানা :** বরের বাড়িতে ২/৩ দিন অবস্থানের পর কনের বাপের বাড়িতে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে যেতে হয়। নবদম্পতি, সাবালা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনসহ কনের বাড়িতে পান-সুপারী, নারিকেল ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী নিয়ে 'সেফ মাগা যানা' বা আশীর্বাদ নিতে যেতে হয়।

মালেইয়া দাগানা : গ্রামের কোনো লোকের জুমচাষের জঙ্গল কাটা, অথবা জুমে ধানের বীজ বপন করা অথবা ফসল কাটা ও তাড়াতাড়ি ফসল ঘরে তোলার জন্য গ্রামবাসীদের সাহায্য দরকার হলে সে জনবল সাহায্য হিসেবে পায়। কোনো ব্যক্তির পারিবারিক কাজে গ্রামবাসীর এই সাহায্য চাওয়াকে চাকমা ভাষায় 'মালেইয়া দাগানা' (জনবলের সাহায্য চাওয়া) বলা হয়। বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান এই প্রথার নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন : 'কোনো কারণে কারও জুম কাটা দেরি হয়ে গেলে, ঠিক সময়ে জঙ্গল কাটা না হলে, কাটা জঙ্গল শুকাবে না, ভাল পোড়া যাবে না, ফলে ভাল ফসলও হবে না। তখন পাড়া-পড়শীর সাহায্য নিয়ে সে কাজে সমতা আনতে পারে। সেক্ষেত্রে পাড়ার ঘরে ঘরে গিয়ে সে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে আসে। তারপরের দিন প্রতি বাড়ি থেকে দা-কুড়াল নিয়ে এক একজন লোক এসে তার কাজটি একদিনেই সম্পন্ন করে দিয়ে যায়। এদের কোনো মজুরি দিতে হয় না। শুধু খানা দিলে চলে। খাওয়া বা ভোজের আয়োজন অবশ্য একটু ভালোই দেয়ার রেওয়াজ আছে। গৃহস্থ অস্বচ্ছল হলে অনেক সময় এমনিতেই সবাই মিলে কাজ করে দিয়ে আসে। জুমে নিড়ানি দেয়ার বেলায় কিংবা

www.pathagar.com

ফসল কাটার সময়ও মালেইয়া ডাকা যায়। নিঃসন্দেহে এটি একটি খুব ভাল প্রথা। এতে পারস্পরিক সহানুভূতি আর সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়। সামাজিক বাঁধন সুদৃঢ় থাকে।

মারমাদের বিবাহ উৎসব

পাত্রপক্ষের প্রস্তাব ও কনেপক্ষের সম্মতি এ দুটি বিষয় মারমা সমাজের নিয়মিত/ সামাজিক বিবাহের প্রথম পর্ব। সচরাচর পাত্রপক্ষের উদ্যোগে এ পর্ব শুরু হয়। এ পর্বে সাধারণতঃ পরিচিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি অথবা নিকট বা দূরসম্পর্কীয় কোনো আত্মীয় বিয়ের প্রস্তাব বাহক বা মাধ্যম হিসাবে সামাজিকভাবে বিবাহ বন্ধনের জন্য নৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এক পক্ষের প্রস্তাব অপরপক্ষের নিকট পৌঁছে দেন। পাত্রীপক্ষের অভিভাবকের 'হ্যাঁ' সূচক সম্মতি পাওয়া গেলে পাত্রের পিতা-মাতা কিংবা বন্ধু-বান্ধব অথবা গুরুজনরা বেজোড় সংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে প্রথাগতভাবে ব্যবহার্য উপকরণসহ (যেমন : ১ বোতল মদ, ২৫টি সুপারী, ১ বিড়া পান, বিন্নি ভাত, মিষ্টি, চিনি, আঁখ, ১ জোড়া নারিকেল ইত্যাদি) পাত্রীপক্ষের বাড়িতে যান। তারা পাত্রীপক্ষের বাড়িতে গিয়ে এক বোতল মদ (মারমা ভাষায় যাকে 'হ্লাক্ফক্ অইং' বলা হয়ে থাকে) পাত্রীর মা-বাবাকে প্রদান করে বিয়ের প্রস্তাবে তাদের মতামত গ্রহণ করেন। পাত্রীর মা-বাবার সম্মতির পর মেয়ের মতামত নেয়া হয়। মেয়ের সম্মতি পাওয়া গেলে পাত্রপক্ষের দেয়া মদের বোতল পাত্রীপক্ষ গ্রহণ করে অনুরূপ আর এক বোতল মদ পাত্রীর পরিবার থেকে পাত্রপক্ষকে দেয়া হয়। এসময় উভয়পক্ষের হাসি-ঠাট্টায় মদ পানসহ বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়। অধুনা এসব রীতি কদাচিৎ অনুসৃত হয়।

পাত্র-পাত্রী কোন্ রাশির জাতক-জাতিকা এবং তাদের বিয়ের শুভলগ্ন ইত্যাদি দেখার জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন একজন গণককে (মারমা ভাষায় বিদ্বাংছ্রা) ডাকা হয়। উপস্থিত সকলের সম্মুখে জাতক-জাতিকার রাশিফল, বিয়ের দিনক্ষণ ও তারিখ বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। এক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর জন্মবারও বিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

সবকিছু শুভ লক্ষণযুক্ত হলে পাত্রী পাত্রপক্ষের গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। এসময় পাত্রপক্ষ একটি থামী, রূপা বা স্বর্ণের একটি আংটি দিয়ে পাত্রীকে আশীর্বাদ করেন। মারমা সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানের দু'দিন পূর্বে পাত্রের বাবা বা অভিভাবক নিজ বাড়িতে গৃহ দেবতার উদ্দেশ্যে 'চুং-মং-লে' পূজার আয়োজন করে। উক্ত পূজায় দেবতার উদ্দেশ্যে একটি শুকর ও পাঁচটি মুরগি বলি দেয়া হয়। অতীতে বিবাহের দিন, তারিখ ধার্য হবার পর পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রীপক্ষের বাড়িতে একটি মোরগসহ বিয়ের নিমন্ত্রণ পাঠানো হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা বা তাম্রমুদ্রা পাঠানোর রেওয়াজও লক্ষ্য করা যায়। (বান্দরবান পার্বত্য জেলা সদরের ৩২৪নং চেমী মৌজার অন্তর্গত ক্রাউ পাড়া নিবাসী কোনো মারমা পরিবারের মেয়েকে যদি ভিন্ন পাড়ার কোনো মারমা যুবক বিয়ে করতে আগ্রহী হয়, তবে বরপক্ষের তরফ হতে কনের বাড়িতে একটি শুকর, এক আড়ি চাউল, এক কেজি হলুদ, এক কেজি লবণ, এক কেজি মরিচ ও বার বোতল মদ উপঢৌকন পাঠাতে হয়।

www.pathagar.com

বিয়ের নির্ধারিত দিনে পাত্রের বাড়ির প্রবেশ দ্বারে কলা গাছের দু'টি কচি চারা বসিয়ে তার পাশে 'রিজাংও' (সাদা সুতো দিয়ে পেচানো দু'টো পানি পূর্ণ কলস) এবং 'সিফাইক্ও' (বিন্নি চাউল থেকে তৈরি পানীয়) রাখা হয়। বউ আনতে যাবার দিনে একটি সেদ্ধ মোরগ, চিংরে (মদ তৈরির হবার পূর্বে ভাত, পানি ও মুলির সংমিশ্রণ) এক বোতল, মদ এক বোতল, একটি থ্বিং (মারমা মেয়েদের নিম্নাংশের পরিধেয় কাপড়) একটি বেদাই আংগি (উর্ধাঙ্গের পোশাক), একটি রাংগাই আংগি (বক্ষবন্ধনী), ১ জোড়া কাব্যাং (পায়ের খারু) একটি গ্বং (মাথার বন্ধনী) নিয়ে পাত্রের মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধবসহ (আবার কোনো কারণে পাত্রের মা-বাবা না থাকলে একজন মুরুব্বী যিনি প্রথমা স্ত্রীর সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে দাম্পত্য জীবন-যাপন করছেন তার নেতৃত্বে) বাদ্য-বাজনা সহকারে কনের পিত্রালয়ে যান। গ্রামাঞ্চলের বিয়েতে বরপক্ষ কনে নিয়ে ফিরে যাবার পথে কনের সমবয়সী ও বন্ধু-বান্ধবীরা বাঁশ ফেলে পথরোধ করে। এ সময় তাদের দাবি অনুসারে মদ ও নগদ অর্থ উপহার দিয়ে কনে নিয়ে যাওয়ার আনন্দ উপভোগের রেওয়াজ আছে।

বিবাহের মূল অনুষ্ঠানটি 'উবদিদাই' বা 'ম্‌তে ছ্‌রা/আখা ছড়া' (বিবাহের মন্ত্র জানা ব্যক্তি) দ্বারা বরের বাড়িতে পরিচালিত হয়। তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে মন্ত্রপূত জলপূর্ণ পাত্রে এক গুচ্ছ জামের কচি পাতা ডুবিয়ে তা দিয়ে বর ও কনের মাথায় পাঁচ-সাতবার পবিত্র জল ছিটিয়ে দেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের মূল পর্বে কনের ডানহাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সাথে বরের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি যুক্ত করে তাতে পবিত্র জল ছিটিয়ে দেয়া হয়। এ অনুষ্ঠানকে মারমা ভাষায় 'লাক্ থেক্ পোই' বলে। মারমা সামাজিক রীতি অনুসারে 'লাক্ থেক্ পোই' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহকে সমাজসিদ্ধ করা হয়।

বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী 'উবদিদাই' বা 'ম্‌তে ছ্‌রা/আখা ছড়া' এমন একজন ব্যক্তিকে হতে হবে, যিনি বিপত্নীক বা বিচ্ছেদ প্রাপ্ত নন (মারমা ভাষায় একে 'আএ্রাইং থোওয়াক্' বলা হয়)। বিয়ের মূল অনুষ্ঠানে আশীর্বাদ এর সময় 'ম্‌তে ছ্‌রা/আখা ছড়া' তার হাতে থাকা একটি তলোয়ার- এর মধ্যে পাঁচ প্যাঁচে পেঁচানো সুতার কুণ্ডলী জড়িয়ে রেখে সেখান থেকে আশীর্বাদ প্রদানকারীদের দেন। এই কুণ্ডলী থেকে প্রথমে বরের হাতে সুতার কুণ্ডলি এমনভাবে পরিয়ে দেয়া হয় যাতে তলোয়ার এবং হাতের মাঝে কোনো ব্যবধান না থাকে। এরপর বর নিজে অপর একটি সুতার কুণ্ডলি তলোয়ার থেকে ব্যবধান না রেখে কনের মনিবন্ধে পরিয়ে দেয়। কনে বরকে প্রণাম করে তা গ্রহণ করে। নবদম্পতিকে আশীর্বাদের জন্য আসা অতিথিকে 'ম্‌তে ছ্‌রা' এক আঙ্গুল পরিমাণ মদ (জুংখাই) পরিবেশন করেন।

একটি মোরগ বধ করে আস্ত সিদ্ধ করার পর 'ম্‌তে ছ্‌রা/আখা ছড়া' সেই মোরগের জিহ্বার অংশ (মারমা ভাষায় 'চাইংগা') টেনে প্রথমে বর ও কনের মা-বাবাকে এরপর ক্রমান্বয়ে উপস্থিত সকলকে দেখান। 'চাইংগা' যদি বাম দিকে হেলে থাকে তাহলে মনে করা হয় যে, বর যদি কনের আত্মীয়স্বজনদের সাথে মিলেমিশে জীবিকা নির্বাহ করে, তাহলে সর্বাধিক উন্নতি করবে এবং ডান দিকে হেলে থাকলে মনে করা হয় এর উল্টো ফল হবে। এরপর সিদ্ধ মোরগটিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ মিশিয়ে খাওয়ার উপযোগী করে বর-কনের জন্য একটি পাত্রে পরিবেশন করা হয়। বর ও কনে একত্রে এক পাত্রে

www.pathagar.com

খাওয়ার এই অনুষ্ঠানকে 'লাক্ ছং চা-চ' বলা হয়। মারমা সমাজসিদ্ধ বিবাহে 'লাক্ ছং চা-চ' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা অপরিহার্য। এরপর থেকে তারা স্বামী-স্ত্রী রূপে সমাজের স্বীকৃতি লাভ করে। বিয়ের এই সামাজিক আনুষ্ঠানিকতাকে 'মেয়াপোই' বা 'মাঙলা ছং পোই' বলে। বিবাহ অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা পঞ্চশীল গ্রহণ এবং মঙ্গল সূত্র পাঠসহ পিণ্ড দান ইত্যাদি ধর্মীয় আচার পালনের রীতিও বর্তমান মারমা সমাজে প্রসার লাভ করেছে। এ ধরনের অনুষ্ঠানাদিতে মদ পরিবেশন, চাইংগা, চুংমাংলে এসব আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করা হয়। এসবের পরিবর্তে ফুল, খৈ, মিষ্টান্নজাতীয় দ্রব্যাদি দিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

ত্রিপুরাদের বিবাহ উৎসব

সামাজিক/নিয়মিত বিবাহ : সামাজিক রীতি অনুসারে একজন অচাই (ওঝা) দ্বারা কাথারক দেবতাকে পূজা দিয়ে বিয়ের শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়। পাত্রের যে কোনো নিকটাত্মীয়কে পাত্রীর বাবা-মা বা অভিভাবকের কাছে দুই বোতল মদসহ প্রথম দফা প্রস্তাব নিয়ে যেতে হয়। পাত্রীপক্ষ এতে সম্মতি জানালে দ্বিতীয় দফায় পাত্রীর বাড়িতে গিয়ে কনে পণ বা দাফা এবং গহনা পত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধনী সামগ্রীসহ মায়ের দুধের দাম পরিশোধের দাবী সম্পর্কে কথাবার্তা পাকা হয়। কনের বাবা-মা বা অভিভাবকের সাথে পাত্রপক্ষের কথাবার্তা চূড়ান্ত হলে বরযাত্রা এবং বধূবরণের দিন ধার্য করা হয়। বরযাত্রী যাবার আগে পাত্রের বাড়িতে দ্বিতীয়বার কাথারক পুজা দিয়ে শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়। গুরুজনদের আশীর্বাদ গ্রহণের পর কনের বাড়ির উদ্দেশ্যে বর ও বরযাত্রীরা রওয়ানা হয়।

বরযাত্রীরা কনের বাড়িতে পৌঁছুলে বিয়ের নানা আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী বোতল নৃত্য ও গীত পরিবেশন করা হয়। এরপর বরযাত্রীসহ আমন্ত্রিত অতিথিদের ভোজন শেষে কনেকে নিয়ে বরযাত্রীদল বরের বাড়িতে ফিরে আসে। কনের বাড়িতেও কাথারক পূজা হয়। বরের বাড়িতে সাজানো বিয়ের আসরে বর-কনেকে আনার পর বরের বামপাশে কনেকে বসিয়ে উভয়কে পেছনদিক হতে একটি নতুন চাদর দিয়ে জড়ানো হয়। এ সময় বরের পাশে দু'জন বালক ও কনের পাশে দু'জন বালিকা থাকে। 'কাইজালাইমুং' অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা এরূপ বালকের বয়স ১২ বছর ও বালিকার বয়স ১০ বছর এবং উভয়ের পিতা-মাতাকে স্বপত্নীক ও সধবা হওয়া বাধ্যতামূলক।

বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানের জন্য রান্না করা মুরগির দু'টি রান ও জড়া পাকানো দুই জড়া ভাত দু'টি আলাদা পাত্রে নিয়ে বর ও কনের সামনে রাখা হয়। এ সময় অচাই (ওঝা) আরেকটি পাত্রে রাখা বীজযুক্ত তুলা ও চাউল নিয়ে মন্ত্র পড়ে বর-কনের মাথার ওপর সাতবার ঘুরিয়ে নিজের মাথার পেছন দিকে ফেলে দেয়। অচাই ও পরিবারের অভিভাবকসহ গুরুজনরা বর ও কনের মাথায় তুলা ও চাউল দিয়ে আশীর্বাদ করে। বর ও কনের পেছন থেকে জড়িয়ে দেয়া চাদরের দুই প্রান্তকে বিবাহ পরিচালনাকারী অচাই অনুষ্ঠানের দশজনকে সাক্ষী রেখে এবং চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র ও বসুমতিকে সাক্ষী করে বেঁধে দিয়ে বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করে। অতঃপর বর ও কনে তাদের সামনে রাখা ভাত-মাংস

www.pathagar.com

ও মদ স্পর্শ করে শপথ নেয় যে, এ সকল মঙ্গল দ্রব্য সাক্ষী রেখে তারা স্বেচ্ছায় দু'জনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তারপর উভয়ের সামনে রাখা ভাত ও মাংস একে অপরকে নিজ হাতে খাইয়ে দেয়। বিয়ের আসরে এ সকল আচার-অনুষ্ঠান পালনের দ্বারা ত্রিপুরা সমাজে প্রচলিত রীতি অনুসারে 'কাইজালাইমুং' সম্পন্ন হবার মধ্য দিয়ে বিয়েকে সমাজসিদ্ধ করা হয়।

পাংখোয়াদের বিবাহ উৎসব

পাংখোয়া সমাজে পাত্র ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব আদান-প্রদান এবং কনে পণ নির্ধারণের জন্য উভয়পক্ষের মতামত নিতে ঘটক নিয়োগ করা হয়। পাত্রপক্ষের ঘটককে 'নিপারেল' এবং পাত্রীপক্ষের ঘটককে 'নুনারেল' বলা হয়। পাত্রপক্ষের দুইজন ঘটক পাত্রীর বাবা বা অভিভাবকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায়। বিয়ের প্রস্তাব দেবার পর কনেপক্ষ রাজী হলে দ্বিতীয় দফায় পাত্রপক্ষের ঘটক কথাবর্তার মাধ্যমে কনের পিতাকে বায়না (ইনকাই) হিসেবে কিছু টাকা (পূর্বে ২টি রৌপ্য মুদ্রা) প্রদান করে। 'ইনকাই' গ্রহণের পর সেই পাত্রীর জন্য অন্য কোনো পাত্র বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে না। বিয়ের কথা চলাকালীন পাত্রীপক্ষও যদি বিয়েতে মত পরিবর্তন করে তার জন্য সমাজের কাছে জরিমানা (লেইসাপুই) স্বরূপ একটি মাদী গয়াল দিতে হয়। পাত্রের ঘটক তৃতীয় দফায় কনের বাড়িতে গিয়ে কনে পণের টাকা ও বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করে। প্রাচীন সমাজে কনেপণ বাবদ ৩০ টাকা হতে ১৫০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হতো। এরপর কনের মুখ দেখার জন্য টাকা (পূর্বে ৩০ টাকা পর্যন্ত) দিতে হয়। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার পূর্বে পণের টাকা (মান) এককালীন অথবা বিয়ের পর কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। নতুবা বর তার শ্বশুরের কাছে কায়িক শ্রমের বিনিময়ে 'মান' শোধ করতে বাধ্য থাকে। কনের 'মান' হিসেবে নির্ধারিত টাকার শতকরা ১০% ভাগের ওপর কনের মামার দাবী থাকে। অন্যথায় মামা আপত্তি জানিয়ে বিয়ে স্থগিত করতে পারেন। আবার বিয়েতে উপঢৌকন হিসাবে ভাগ্নীর দাবি করা সামগ্রীও মামাকে দিতে হয়। পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষের ঘটক 'নিপারেল' ও 'নুনারেল'কেও পণের টাকা হতে বখশিস দিতে হয়। 'মান' বাবদ প্রাপ্ত টাকা হতে কনেপক্ষের আত্মীয়স্বজনকে 'সুইবাং' (বখশিস) দিতে হয়। 'সুইবাং' গ্রহণকারী আত্মীয়স্বজনকে কনের শ্বশুর বাড়ি যাত্রার সময় সহযাত্রী হতে হয়। বিয়েতে ভোজের আয়োজনে 'নিপারেল' ও 'নুনারেল'কে উঁচু আসনে বসিয়ে সম্মানের সাথে আপ্যায়ন করতে হয়। বিবাহের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান প্রথমে পাত্রীপক্ষের বাড়িতে হয়। কনের শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া একটি মুরগিকে পরদিন ভোর বেলায় 'লুকার্থা' অনুষ্ঠানে মরিচ ছাড়া রান্না করে কনেপক্ষের 'নুনারেল' ও বরপক্ষের 'নিপারেল' এবং বর-কনেসহ উভয়ের দুইজন বন্ধু, মোট ছয়জনে মিলে আহার করে। 'লুকার্থা' অনুষ্ঠানের দিনে সূর্য উঠার আগে স্বামী-স্ত্রী তাদের দুই বন্ধুসহ চারজনে মিলে পাহাড়ি ছড়া বা নদী থেকে পানি তুলে আনে। নববধূর তুলে আনা এই পানিকে পবিত্র পানি মনে করা হয়। পাংখোয়া সমাজে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচলনের পর বর্তমানে 'রোয়েই' অনুষ্ঠানের দিনে খ্রিষ্ট ধর্মীয় রীতি অনুসারে চার্চ বা গীর্জায় বিবাহ সম্পন্ন হয়।

www.pathagar.com

খিয়াংদের বিবাহ রীতি

পরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তি, নিকটাত্মীয় এবং সমাজের প্রবীণদের সাথে বিবাহের আয়োজন করা পাত্রপাত্রী উভয়পক্ষের অভিভাবকের বেলায় বাধ্যতামূলক। অন্যথায় গ্রামের গণ্যমান্য ও প্রবীণ ব্যক্তিরা বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে না। এই রীতির সামাজিক উদ্দেশ্য হলো বিবাহ উপলক্ষে পাত্র-পাত্রীর পরিবারে কি ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন তা নির্ণয় করা। এরপর পাত্রের পিতা-মাতা নিকটাত্মীয়সহ পাত্রীর বাড়িতে গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিবাহের দিন, তারিখ ধার্য করেন। পূর্ণিমার সময় বুধ ও বৃহস্পতিবারকে বিবাহের জন্য শুভদিন হিসাবে গণ্য করা হয়। ভাদ্র ও কার্তিক মাসে খিয়াং সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। বিবাহের দিন বর ও বরযাত্রী দল কনের বাড়িতে পৌঁছলে তাদেরকে বিয়ের অনুষ্ঠান স্থলে এনে বসানো হয়। আমন্ত্রিত সকল অতিথির সামনে বর-কনেকে বসিয়ে উভয়ের হাতের উপর হাত রেখে 'লাকশোঙ' অনুষ্ঠান করা হয়। 'লাকশোঙ' অনুষ্ঠানে বর-কনেকে মুখোমুখি বসানো হয়। কনের আসন হতে বরের আসন কিছুটা উঁচুতে হয়। বর-কনের মাঝখানে একটি থালায় সিদ্ধ করা আস্ত একটি মুরগি, এক বোতল মদ ও ভাত রাখা হয়। বর প্রথমে মদ পান করার পর সিদ্ধ করা মুরগির গলার নিচের অংশ টেনে বিবাহের শুভাশুভ যাচাই করে। এরপর নবদম্পতি উপস্থিত গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। বিবাহ অনুষ্ঠানের পর বরের হাতে একটি দা এবং কনের হাতে একটি কাস্তে তুলে দেয়া হয়। এটাকে খিয়াং সমাজে সৎ জীবনযাপনের প্রতীক ও আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের পর বরযাত্রীরা ফিরে গেলেও বরকে কনের বাপের বাড়িতে তিন/পাঁচ/সাত দিন পর্যন্ত থাকতে হয়। বউ নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে আসার পর পাত্রের বাড়িতে একই রকমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'লাইতু' খিয়াংদের বিবাহ রীতি অনুসারে বর ও কনে বিবাহ অনুষ্ঠান শেষে বরের বাড়িতে ফিরে যায় এবং বরের বাড়িতে পুনরায় 'লাকশোঙ' অনুষ্ঠান হয়। 'শিওরি পই' সহ বিয়ে হলে কনের বাড়িতে এক রাত অবস্থানের পর সকালে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বর-কনে উভয়ে বরের বাড়িতে ফিরে যায়। 'শিওরি পই' অনুষ্ঠানে বর ও কনের পাশে মদের (জু) জাবার কলসীর ভেতর পানি ঢেলে দিয়ে কলসির মুখে দুটি সরু নল বসানো হয়। অনুষ্ঠানে আগত গণ্যমান্য অতিথিরা নল দিয়ে কলসি থেকে মদের জাবার পানি পান করে। বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের কারণে কনের মায়ের বুকের দুধের দাবীস্বরূপ (পূর্বে ২টি রৌপ্য মুদ্রা) মূল্যবান কোনো সামগ্রী বা নগদ অর্থ বরপক্ষকে অবশ্যই দিতে হয়। খিয়াং ভাষায় এটিকে 'চিই মন' বলে। 'চিই মন' বাবদ ১০১ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া যে গ্রাম বা পাড়ায় বিবাহ হয় সেই গ্রাম বা পাড়ার হেডম্যান/কার্বারীকে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষকে 'চিরিপেইলা' বাবদ (পূর্বে ৭ টাকা) বর্তমানে ১২ টাকা প্রদান করতে হয়। 'লাইতু' খিয়াংদের সমাজে 'চিরিপেইলা' রীতির প্রচলন নেই। 'লাকশোঙ' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহিত দম্পতি খিয়াং সমাজের স্বীকৃতি লাভ করে। খিয়াং সমাজের আদি বিবাহ রীতির বাইরে বর্তমানে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্ম অনুসারী খিয়াংরা নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুসরণের পাশাপাশি কিছু সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানও পালন করে। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী খিয়াং সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠান চার্চের পুরোহিতের মাধ্যমে চার্চের রীতি অনুসারে হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

৪. পাংখোয়াদের অন্যান্য উৎসব

পাংখোয়ারা আনন্দ-উৎসব, গান-বাজনা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে খুবই পছন্দ করে। আদিকালে পাংখোয়ারা নিজস্ব আয়োজনে বিভিন্ন পার্বণ, উৎসব, উদযাপন করতো। উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান উৎসবের নাম গুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. **নাউ মারিয়াম লাক্** (Nau Mariam Lak) **বা বাচ্চাদের উৎসর্গ উৎসব** : পাংখোয়া সমাজে এই সামাজিক অনুষ্ঠানটি বৎসরের শেষ দিকে পাড়ার সকল ছেলেমেয়েদের নিয়ে আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠান সকল পাড়াবাসী ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষ, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। মূলত বাচ্চাদের সারা বছরের সু-স্বাস্থ্য কামনা করার উদ্দ্যেশেই এই উৎসব। অনুষ্ঠানে প্রচুর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

২. **সুন থা মাজির** (Sun tha Mazir) **বা মানত করা উৎসব** : এই উৎসবের নির্দিষ্ট কোন সময় নাই। যেহেতু এটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান তাই বৎসরের যে কোন সময়ে এটি আয়োজন করা যেতে পারে।

নিম্নে যে সব উৎসবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সব ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান। যে কেউ যে কোন সময় এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন। নিম্নের উৎসবগুলো বড়-ছোট ক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে যেমন 'আর রিয়াল' এর চেয়ে 'সা বুক সুন' বড় এবং 'সাবুক সুন' এর চেয়ে 'বুক হ্লাং জেম' বড় ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, যে উৎসবে যত বেশি বড় ও যত বেশি সংখ্যাক পশু/প্রাণী বলি দেয়া হবে সেই উৎসব তত বেশি বড়।

৩. আর রিয়াল ফুয়ার (Ar Rial Phuar)
৪. সা বুক সুন্ (Sa buk Sun)
৫. বুক হ্লাং জেম (Buk Tlang zem)
৬. খুয়াং চই (Khuang chawi)

পাংখোয়া সমাজে এসব উৎসব এখন আর পালন করা হয় না। তাই এসব উৎসবের নামগুলোও আজকাল ছেলেমেয়েদের কাছে অনেকটাই অপরিচিত। খৃষ্টধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে ইদানিং এসব উৎসবের পরিবর্তে পাংখোয়ারা শুভ নবনর্ষ, বড়দিন, জন্মদিন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিপর্যায়ে বিশেষ উদ্দ্যেশ্য নিয়ে পাড়াবাসীদেরকে একসাথে খাওয়ানোর রীতি অনুসরণ করছে।

www.pathagar.com

লোকাচার

১. চাকমাদের কজই পানি লনা
(শিশুর জন্মশুদ্ধি ও সামাজিক আচার)

চাকমা সমাজে গর্ভবতী মহিলাকে নিজের স্বামীর ঘরে বা স্বামীর গোষ্ঠীভুক্ত কারো ঘরে সন্তান প্রসব করতে হয়। কোনো কারণে সেটা সম্ভব না হলে সন্তান প্রসবের জন্য পৃথক ঘর করে দিতে হয়। শিশু জন্মের পর প্রসূতিকে অশুচি মনে করা হয়। এ সময় তাকে রান্না ঘরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। 'কজই পানি লনা' (কাঁচা হলুদ, ঘিলার শাঁষ, চাল, ইজিং (বন্য হলুদ) ও সোনা, রূপা ভিজানো পানি) অনুষ্ঠানের পর প্রসূতি শুদ্ধ হয় এবং রান্না ঘরে প্রবেশের অনুমতি পায়। চাকমা পরিবারে শিশু জন্মের সাথে সাথে শিশুর মুখে মধু দেয়া হয়। জন্মের সাত দিন পর 'ঘিলা-কজই-পানি' দিয়ে শিশুর চুল ধুয়ে দিয়ে তাকে পবিত্র করা হয়। এ অনুষ্ঠানটিকে 'কজই পানি লনা' বলে। এই অনুষ্ঠানে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয় এবং ধাত্রী বিদায় করা হয়। মাস কয়েক পরে নাপিত ডেকে শিশুর মাথার চুল ফেলে দেওয়া হয়। মাতৃগর্ভ থেকে যে চুল নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে তাকে 'বিচ্চুল' (বিষচুল) বলা হয়। এ চুল মুড়ানোর আগে মা তার শিশুসহ অন্য কারো ঘরে যেতে পারে না। শিশু জন্মের পর এ সকল আচার-অনুষ্ঠান অবশ্যই করণীয় ও পালনীয় রীতি হিসাবে চাকমা সমাজে স্বীকৃত।

২. মারমা শিশুর জন্মশুদ্ধি ও সামাজিক আচার

মারমা সমাজে শিশু জন্মের সময় প্রসূতিকে পরিবারের আলাদা ঘর বা কামড়ায় (মুইজাং) রাখা হয়। শিশু জন্মের পর নাভীরজ্জুকে ক্লাইসং (বাঁশের পাতলা ফালিকে ধারালো করে) দিয়ে কাটা হয় এবং নাভীরজ্জুর উচ্ছিষ্ট অংশ ও প্রসূতির প্রসবকালীন কাপড় বাড়ির এক কোণে পুঁতে রাখা হয়। তারপর নবজাতকের শরীর সামান্য গরম পানি দিয়ে মুছে দেয়া হয়। কোনো কারণে সন্তান ভূমিষ্ট হতে দেরী হলে বা প্রসূতি কষ্ট পাচ্ছে মনে হলে মুরগি কেটে 'মুইখ্যং' পূজা করা হয়। শিশু ভূমিষ্ট হবার দিন থেকেই প্রসূতির পাশে এক কোণে একটা নতুন চ্ফো (চুলা) রেখে মাটির হাঁড়িতে প্রয়োজন মত গরম পানি ব্যবহারের জন্য রাখা হয়। এ সময় প্রসূতির মাথা ব্যাথা হলে চমুক্নাক্ (মেথী) ও জদুস্ি (জায়ফল) গুড়া করে নাকে ঘ্রাণ নিতে দেয়া হয়। প্রসূতিকে ৭ (সাত) দিন পর্যন্ত মুইজাং (আতুড় ঘর) এ থাকতে হয়। নবজাতককে ৭ (সাত) দিনের ভেতর চুল ছেটে দেয়া হয় এবং কান ফোঁড়ানো (ছিদ্র করা) হয়। তবে কোনো অনুষ্ঠান করা হয় না।

www.pathagar.com

মারমা সমাজে শিশু জন্মের পর 'ম্‌দেতং পোই' একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শিশু ভূমিষ্ট হবার সময় উপস্থিত সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এ সময় মা ও সন্তানের অনাগত ভবিষ্যতের মঙ্গল কামনা করে আরাহ্‌ (মদ) ও আচাহ্‌ (খাবার) দিয়ে সকলকে আপ্যায়ন করা হয়। 'ম্‌দেতং পোই' অনুষ্ঠানে যদি ওয়াইংদেছ্‌রামা (ধাত্রী) উপস্থিত থাকতে না পারে তাহলে পরে আবার তাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর রীতি মারমা সমাজে প্রচলিত আছে।

মারমা জনগোষ্ঠী জন্মান্তরবাদ ও জ্যোতিষতত্ত্বে বিশ্বাস করে। পূর্ব পুরুষদের কেউ একজন নবজাতক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এ বিশ্বাস থেকে অনেকেই পূর্ব পুরুষের নামানুসারে নবজাতকের নাম রাখেন। আবার অনেকে বিদ্বাংছ্‌রা (জ্যোতিষি) এর মাধ্যমে জ্যোতিষ শাস্ত্র বিচার অনুসারে নামকরণ করেন। মারমা পরিবারে জন্ম নেয়া প্রথম সন্তানের নামকরণের সময় অনেক পরিবার শিশুর নামের প্রথম অক্ষর হিসেবে 'উ' যুক্ত করে, যেমন– উবানু, উমংপ্রু, উনুপ্রু ইত্যাদি। আবার সন্তান যদি পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ হয়, তাহলে তার নামের শেষে 'থুই' যুক্ত হয়, যেমন– অংসাথুই ইত্যাদি। মারমা সমাজের কক্‌দাইংসাসহ কয়েকটি গোত্রের সন্তানের নামকরণের সময় 'মুইখ্যং পোই' নামের সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের রীতিও রয়েছে।

৩. তঞ্চঙ্গ্যা শিশুর জন্মশুদ্ধি ও সামাজিক আচার

তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারে শিশু জন্মের সময় প্রসূতিকে সাহায্য করার জন্য ধাত্রী (অসা-মেলা) ডাকা হয়। শিশু ভূমিষ্ট হবার পর তার নাভিরজ্জু বাঁশের ফালি থেকে নেয়া 'দুলুক্‌' (তীক্ষ্ণ ধারালো) দিয়ে কাটা হয়। নবজাত শিশুকে সহনীয় গরম জলে স্নান করিয়ে মায়ের পাশে শুকনা কাপড় জড়িয়ে রাখা হয়। অশুচি সময় পর্যন্ত প্রসূতিকে আঁতুর ঘরে সন্তানসহ থাকতে হয়। এ সময় তার ব্যবহার্য জিনিস ছাড়া সংসারের অন্যান্য জিনিসপত্র স্পর্শ করা তার জন্য নিষিদ্ধ। অশুচিকাল শেষ হলে (এক পাত্র পানির মধ্যে 'ঘিলা' নামক বীচির শাঁস এবং 'কশৈই' নামের বনৌষধি, হলুদের টুকরাসহ সোনা ও রূপা রেখে) 'ঘিলা-কশৈই পানি' বা পবিত্র পানি প্রসূতি ও নবজাতকের উপর এবং আঁতুর ঘরের চারিদিকে ছিটিয়ে শুচিশুদ্ধ করা হয়। এ অনুষ্ঠানকে 'কশৈই-পানি লনা' বলে। অনুষ্ঠানের দিনে ধাত্রী বা 'অসা মেলা'কে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয় এবং তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পরিশোধ করা হয়। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের রীতি অনুসারে এই অনুষ্ঠানকে 'নাঈ কাবা তাভা' দেওয়া বলা হয়। এরপর প্রসূতি সংসারের স্বাভাবিক কাজকর্মে অংশ নেয়।

৪. ত্রিপুরা শিশুর জন্মশুদ্ধি অনুষ্ঠান

সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর 'কুচাই' নামক গাছের ফল অথবা পাতার সাথে কাঁচা হলুদ ও ঘিলার ভেতরে থাকা সাঁশ নিয়ে একত্রে গুঁড়ো করে একটি বাঁশের চোঙায় অথবা পাত্রে পানির সাথে মেশানো হয়। সেই পানিতে আমপাতা বা 'চাখানা' নামের এক জাতীয় ঘাসপাতা চুবিয়ে প্রসূতি ও ধাত্রীর গায়ে ছিটানো হয়। এরপর উভয়ে নদীর ঘাটে এসে

www.pathagar.com

ডুব দিয়ে স্নান করে শুচি শুদ্ধ হয়। সেই নদীর ঘাটে বা ছড়ায় মোরগ বলি দিয়ে পূজা দিতে হয়। সন্তান প্রসবকালে উপস্থিত ধাত্রী এবং ধাত্রীকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যকারীদের 'আবিয়াক সুমানি' অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হয়। পাড়ার রাস্তার চৌমাথায় একটি ডিম দিয়ে 'লাম্প্রা মাতাই'কে পূজা দিতে হয়; যেন শিশুর মায়ের ওপর অপদেবতার দৃষ্টি না পড়ে। অচাই (ওঝা) দ্বারা সেই পূজা শেষে নিমন্ত্রিত অতিথিদেরকে ভোজে আপ্যায়ন করা হয়। তারপর একটি কুলাতে কলাপাতা বিছিয়ে তার ওপর জলপূর্ণ ঘটে আম্রপল্লব ও সিঁদূর দিয়ে মঙ্গলঘট সাজিয়ে স্থাপন করা হয়।

ঘটের সামনে কুলাতে ৩/৫/৭টি মাটির প্রদীপে সলতে দিয়ে সরষের তেলে চুবানো হয়। নবজাত শিশুকে ধাত্রীর কোলে দিয়ে এক বোতল মদ, নগদ টাকা ও এক জোড়া পরনের কাপড় (নিজ সামর্থ অনুসারে) ধাত্রীর হাতে তুলে দিয়ে সন্তানের মা'কে বলতে হয় 'আপনার পরিশ্রমের মূল্য দিলাম'। ধাত্রী এ সময় নবজাত শিশুকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে সন্তান বুঝে নিতে বলে।

এরপর অচাই (ওঝা) সহ ৩/৫/৭ জন মিলে শিশুর জন্য তাদের প্রত্যেকের পছন্দের নাম রেখে নিজ হাতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়, যার প্রদীপটি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত জ্বলতে থাকে, তার রাখা পছন্দের নাম দিয়েই শিশুর নামকরণ হয়। জন্ম শুদ্ধি অনুষ্ঠান উপলক্ষে শুকর বা ছাগল বলি দিয়ে পাড়া-পড়শি ও আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ খাওয়ানো হয়।

৫. খিয়াং শিশুর জন্মশুদ্ধি ও সামাজিক আচার

খিয়াং সমাজে একজন গর্ভবতী মহিলাকে নিজ পরিবারের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি কক্ষে রাখা হয়। সেই কক্ষে গর্ভবতী মহিলার স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ প্রবেশ করতে পারে না। অবশ্য পরিবারের মহিলাদের জন্য নিষেধ নেই। সন্তান প্রসবের পর প্রতিবেশী মহিলারা প্রসূতির জন্য এক বোতল মদ, একটি রান্না করা মুরগি ও এক মোচা ভাত (কলা পাতায় মোড়ানো ভাতের পুটলি) ও পরনের কাপড় পৌঁছে দেয়। ভূমিষ্ট সন্তান মেয়ে হলে পাঁচদিন এবং ছেলে হলে ছয়দিন প্রসূতিকে আগুন পোহাতে হয়। এসময় ঘরে ঢোকার দরজার সামনে মাটির পাত্রে তুষের আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। আগুনে হাত গরম না করে কাউকে ঘরে প্রবেশ বা নবজাতককে স্পর্শ করতে দেয়া হয় না। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি মাকে একমাস অশুচি মনে করা হয়। যে কারণে এই একমাস সময়ের মধ্যে প্রসূতি অন্য কোথাও বেড়াতে যেতে পারে না। এমনকি তাকে পরিবারের রান্না ঘরেও প্রবেশ করতে দেয়া হয় না।

সন্তান জন্মের ছয়দিন পরে বয়োবৃদ্ধদের ডেকে পিতা-মাতার পছন্দ অনুসারে সন্তানের নাম রাখা হয়। খিয়াং জনগোষ্ঠীর খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা তাদের পরিবারে শিশু ভূমিষ্ট হবার ৬ দিন পর 'ওপেল' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাড়া-পড়শীর জন্য ভোজের আয়োজন করে। এসময় সমাজের বয়োবৃদ্ধ বা প্রবীণদের উপস্থিতিতে বাবা-মায়ের পছন্দ অনুসারে শিশুর নাম রাখা হয়। খিয়াং জনগোষ্ঠীর যে কোনো ধর্মানুসারী পরিবারে শিশু ভূমিষ্ট হবার পর 'ওপেল' অনুষ্ঠান করা হয়।

www.pathagar.com

৬. পাংখোয়া শিশুর জন্মশুদ্ধি ও সামাজিক আচার

পাংখোয়া সমাজভুক্ত কোনো পরিবারে শিশু জন্মের সময় উপস্থিত ধাত্রী ও সাহায্যকারীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর নিয়ম রয়েছে। সমাজের প্রাচীন রীতি অনুসারে শিশু জন্মের পর বাড়ির সিঁড়ির গোড়ায় একটি শুকর ছানা এবং নদীতে একটি মোরগ বা মুরগি অবশ্যই বলি দিতে হয়। শিশু জন্মের পর নবম দিনে কিংবা এক মাস পর পারিবারিকভাবে নামকরণ অনুষ্ঠান হয়। পুত্র সন্তান হলে একটি লাল মোরগ বধ করা হয় এবং ৫ পাত্র মদসহ পাড়ার সকলকে আপ্যায়নের আয়োজন করা হয়। আর কন্যা সন্তান হলে দুটি মুরগি ও তিন পাত্র মদের আয়োজন করে পাড়ার সকলকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। সামর্থ্যবান পরিবারে শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠানে শুকর, গয়াল বা গরু বধ করে গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ খাওয়ানো হয়। অনুষ্ঠানে গ্রামের যিনি ওঝা তিনি সবার আগে আহার গ্রহণ করেন। পাংখোয়া জনগোষ্ঠীর লোকজন খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর বর্তমানে খ্রিষ্ট ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান হয়। বাবা-মা তাদের নবজাত শিশুকে নিয়ে গীর্জায় প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এ সময় নবজাতকের জন্য প্রেষ্টরের আশীর্বাদ গ্রহণ করা হয়।

৭. ব্যুহচক্র

এটি সাধারণত মাঘী পূর্ণিমার দিন বৌদ্ধ বিহারগুলোতে পালিত হয়। বাঁশের তৈরি বেড়া দিয়ে বিশাল ব্যুহ তৈরি হয়। তাতে দুইটি মাত্র দরজা রাখা হয়। এই দরজা দিয়ে পূণ্যার্থী দর্শকবৃন্দ প্রবেশ করলে ঘুরতে ঘুরতে সহজে বের হবার পথ খুঁজে পায় না। দিশাহারা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাঝখানে একটি মঞ্চ তৈরি হয়। ঐ মঞ্চে পবিত্র বুদ্ধমূর্তি রাখা হয়। পুণ্যার্জনের লক্ষ্যে পূণ্যার্থী দর্শকবৃন্দ ঘুরতে ঘুরতে ঐ মঞ্চটিতে পৌঁছাতে পারলে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে তাদের মনোসকামনাদি ব্যক্ত করেন এবং সকলে ব্যুহটি প্রদক্ষিণ করে পূণ্যার্জন করে।

৮. কঠিন চীবর দান

কঠিন চীবর দান বৌদ্ধদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রধান দান। এ দানের কতগুলো নির্দষ্ট নিয়ম আছে। বছরে যে কোন সময় অন্যান্য দানের মত এ দান করা যায়না। আশ্বিনী পূর্ণিমার পর দিবস প্রতিপদের অরুণোদয় হতে কার্তিকী পূর্ণিমা অবসানে অরুণোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই পূর্ণ এক মাসই হল কঠিন চীবরদানের একমাত্র উপযুক্ত সময়। ত্রিচীবর অথবা ত্রিচীবরের মধ্যে যে কোন একখানি চীবর দ্বারা কঠিন চীবর দান করা যায়।

কঠিন চীবর দানের প্রণালী

প্রথম প্রণালী : যেদিন কঠিন চীবর দান করা হবে সেদিন অরুণোদয় হতে তৎপর দিনের অরুণোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূতাকাটা হতে আরম্ভ করে কাপড় বোনা, রং করা, সেলাই করা প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করে দান করতে হয়।

www.pathagar.com

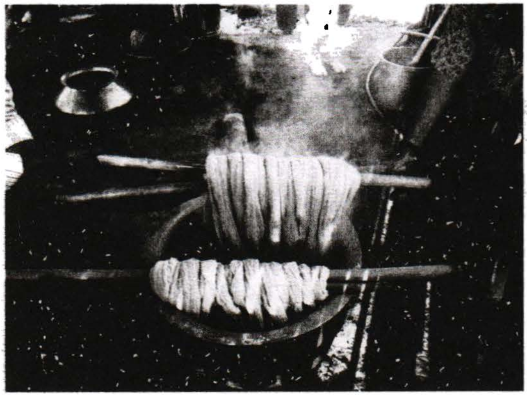

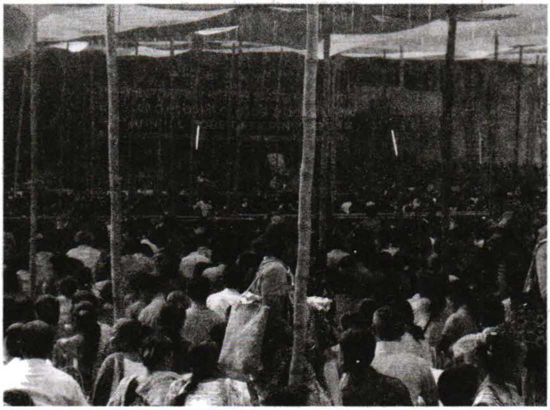

কঠিন চীবর দান

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রণালী : বাজার হতে সাদা কাপড় সংগ্রহ করে রং দেওয়ার পর সেলাই করে চীবর দান দিতে হয়।

তৃতীয় প্রণালী : বাজার হতে পূর্বের সেলাই ও রঙ করা চীবর বাজার থেকে সংগ্রহ করে দান দেওয়া হয়। সময় এবং অর্থ সংগ্রহ বিবেচনা করে বর্তমানে এ প্রণালীতে সর্বাধিক কঠিন চীবর দান করা হয়।

চতুর্থ প্রণালী : সেলাই না করে বাজার থেকে শুধুমাত্র খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করে এ চীবর দান করা হয়।

বাংলাদেশের বৌদ্ধরা প্রতিবছর ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের পর শেষ একমাসব্যাপী মহা সমারোহে কঠিন চীবর দানের আয়োজন করে থাকেন। যে বিহারে এ দানানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সে বিহারে কীর্তন এবং ধর্মীয় নাটক পরিবেশন করা হয়। এ সময় এ দানানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছোটখাট মেলা বসে। এ মেলায় বৌদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায় অংশ গ্রহণ করে এ পূণ্যানুষ্ঠানের আমেজ এবং গুরুত্বকে উপলব্ধি করেন। যে বিহারে এ দানানুষ্ঠান হয় সে বিহারে সারাদিন ধর্মীয় কর্মসূচির মাধ্যমে এ উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়।

কঠিন চীবর দান বৌদ্ধদের সত্যিকার অর্থেই একটি মহান ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব। এ সময় আত্মীয় স্বজনরা একে অপরের সান্নিধ্যে এসে আনন্দ এবং পূণ্যের ভাগী হন।

রাঙ্গামাটির রাজবন বিহারে প্রতি বছর মহাসমারোহে এ দানানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এ সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধরা অংশ গ্রহণ করেন। এ সময় হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে এ বন বিহার প্রাঙ্গণে। এছাড়া রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাসহ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে তথা বাংলাদেশে যেখানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বসবাস আছে সেখানে এই ধর্মীয় উৎসবটি উল্লেখিত সময়ের মধ্যে পালিত হয়ে থাকে।

সংঘ দান : বৌদ্ধ ধর্মে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। একজন বৌদ্ধ হিসাবে নিজের সামর্থ্যানুযায়ী সবাই দান করে থাকে। আর এই দানের মধ্যে সংঘদান অন্যতম। বছরের যে কোন সময় বাড়িতে অথবা বিহারে ভিক্ষু সংঘ আমন্ত্রণ করে সংঘদানের আয়োজন করতে পারেন। দায়ক/ দায়িকা ছাড়াও ভিক্ষু শ্রামণগণ সংঘ আহ্বান করে এ দান দিতে পারেন। ন্যূনতম চারজন ভিক্ষু হতে তদুর্ধ ভিক্ষু আহবান করে এই দান দিতে হয়। ভিক্ষুসংঘ উপস্থিত হলে সংগৃহীত দ্রব্য, বস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য দানীয় বস্তু ভিক্ষুদের সামনে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তাদের সম্মুখে উপবেশ করে শান্ত ও শ্রদ্ধাসংযুক্ত চিত্তে পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। তাদের নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সংঘদান কার্য সম্পন্ন করতে হয়। তারপর জল তর্পনের মাধ্যমে জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত পুণ্য উৎসর্গ করতে করা হয়।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিজের সামর্থ্য অনুসারে এ পবিত্র কার্য সম্পন্ন করে থাকেন। যারা অবস্থাপন্ন তারা নিজেরা একা এ কার্য সম্পাদন করে থাকেন। আর অনেকে অর্থ, দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে এ দানে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। বড় বড় বিহারসমূহে পূজা পার্বণ উপলক্ষে এ সংঘদানের আয়োজন করা

www.pathagar.com

হয়। এ সংঘদান অনুষ্ঠান বর্তমানে একদিকে সামাজিক ও অন্যদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে মিলনের অন্যতম সেতু বলে উল্লেখ করা যায়।

৯. গাড়ি টানা

রাজা বা কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে গাড়ি টানা (রথ টানা) প্রথা পালন করা হয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যুতেও এই গাড়ি টানা প্রথা পালন করা হয়। তবে রাজা, সম্ভ্রান্ত বা অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যুতে এই প্রথা পালন করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই। এই গাড়ি টানা প্রথাটি প্রকৃতপক্ষে মূল শ্রাদ্ধক্রিয়ারই একটি অংশ। সাধারণত শ্রাদ্ধক্রিয়ার আগেই গাড়ি টানার কাজ সমাধা করতে হয়।

এই গাড়ি টানার জন্য ১০/১২টি মোটা গাছের চাকা তৈরি করতে হয়। তারপর গাড়ি, রাধা ঘর, সোমবেং ঘর ও গাড়ি টানার কয়েকটি মোটা রশি তৈরি করা হয়। এসব জিনিস তৈরি করা একটু সময় সাপেক্ষ। গাড়ি টানার এসব জিনিস তৈরি করার উদ্দেশ্যে গাছের পেটি বানিয়ে নানা সুগন্ধি দ্রব্য তেল ইত্যাদি পেটিতে দিয়ে মৃতদেহকে বেশ কয়েকদিনের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। নির্ধারিত দিনে গাড়ি, রাধা ঘর ইত্যাদি নানা রঙে ও কারুকার্য দ্বারা সজ্জিত করে তাতে সুখ পাখী, বনের হাতি ইত্যাদির প্রতিকৃতি বানিয়ে শোভিত করা হয়। মৃতদেহ গাড়িতে তুলে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিবাহিত-অবিবাহিত যুবক কিংবা পাড়া ভিত্তিক দুই দলে ভাগ হয়ে গাড়ি টানার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এ উপলক্ষে বাজি পোড়ানো ও ঢোল বাজানো হয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানে বহু লোকের সমাগম হয়ে থাকে। তাই বড় লোক বা অবস্থাপন্ন লোক ছাড়া এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয় না। গাড়ি টানা অনুষ্ঠান শেষে সেই দিনই নিকটবর্তী কোনো শ্মশানে শব দাহ করা হয়ে থাকে।

গাড়ি টানা

www.pathagar.com

১০. অন্যান্য লোকাচার

ধর্মঘর : চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যা জাতিগোষ্ঠীর প্রতিটি গ্রামের প্রবেশমুখে লোকবসতি শূন্য ছোট খাট একটি ঘর দেখা যায়। এই ঘরটিকে ধর্মঘর বলা হয়। মূলত দূর-দূরান্ত হতে ঐ গ্রামে আগত অথবা ঐ গ্রামের মাঝ দিয়ে অন্য কোন দূরবর্তী স্থানে গমনকারী ক্লান্ত অতিথিদের সাময়িক বিশ্রামের জন্য এই ঘরটি নির্মাণ করা হয়। গ্রামের মেয়েরা খুব ভোরে উঠে ঐ ঘরটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয় এবং শূন্য পানির কলসিগুলো পরিস্কার খাওয়ার পানি দিয়ে নতুন করে পরিপূর্ণ করে দেয়। তৃষ্ণার্ত পথিকেরা ঐ পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয় এবং আপ্যায়নকারীদের আর্শীবাদ প্রদান করে। গ্রাম্য সমাজে এই পুরনো রীতি এখনো বলবৎ আছে।

ধর্মঘর

মা লক্ষ্মী মা পূজা : হিন্দুদের ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী। মূলত চাকমাদের মাঝে মা লক্ষ্মী নামে পরিচিত। লক্ষ্মী হিন্দু দেবী হলেও তাকে পূজার চাকমাদের মাঝে আলাদা। আগেকার দিনে গৃহস্থ পরিবারে নিষ্ঠাবতী চাকমা গৃহিণীরা সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার বাড়িতে পূজা দেওয়া হতো। পূজার উপকরণ বলেত একটি আয় সিদ্ধ ডিম আর পরিবারে রান্না করা তরিতরকারি। বিশেষ করে স্বপ্নে যদি দেখা হয় কোন বুড়োবুড়ি বাড়িতে বেড়াতে এসেছে তাহলে তো কথাই নেই। গৃহস্থের মঙ্গল ভেবে তার পর দিন অবশ্য মা লক্ষ্মীর মার পূজা দেয়া হতো। জুম চাষীরা নতুন ধান ঘরে আনার সময় এ পূজা ছিল আবশ্যকীয়। জুম থেকে এক গোছা পাকা ধানের আটি এনে গৃহের এক কোণে স্থাপন করে ঢালাই সাজিয়ে পূজা দেওয়া হতো। মা লক্ষ্মী মার প্রিয় ভোগ হল ভাবুই পাখি। তানা পেলে শুকর, মোরগ এমন কি কাঁকরা হলেও চলে। সঙ্গে মদ ও দিতে হয়। উল্লেখ্য যে, হিন্দুদের নিরামিষ ভোজী দেবী লক্ষ্মী। চাকমাদের হাতে পদে আমিষ ভোজী হয়েছেন এবং মদ ধরেছেন। বাড়ির গৃহিণী স্নানান্তে শুদ্ধ শুচি হয়ে মাথার খবং জড়িয়ে পূজার যার ধারে কিছু চাল আর জল ছিটিয়ে দেবীকে আহবান করে সকাল বেলা সকলেল আহারের আগে ভোগ নিবেদন করতে হয়। সাধারণ ফুর বারেং এ একটি ডালায় কলাপাতার আগা ডালার উপর স্থাপন করে খাদ্য দ্রব্যাদি সাজিয়ে পূজার

www.pathagar.com

আয়োজন করা হতো। সাধারণ ভাত, তরকারির সাথে সিদ্ধ ডিম এবং মুরগি জবাই হলে তার মাথা, ঘিলা, কলিজা ইত্যাদি দেয়া হতো। পূজা শেষে গৃহিণী আবার আগের প্রক্রিয়ায় চাল আর জল ছিটিয়ে দেবী বন্দনা করে পূজার উপকরণ গুলো তুলে নিয়ে আসে। এগুলো বিশেষ করে বাড়ির আদুরে ছোট ছেলের ভাগেই পড়ে। এ পূজা যদি পশু পাখি বলি দেওয়া হলে তখন অবশ্য অঝার দরকার হয়ে থাকে।

মা লক্ষ্মীর পূজার উদ্দেশ্য : চাকমা লোকসাহিত্যে মা-লক্ষ্মী বা পূজা কি করে চাকমাদের মাঝে স্থান করে নিয়েছে তার সামান্য কাহিনি পাওয়া যায়। চাকমাদের বারমামী গেংখুলী পালার মধ্যে লক্ষ্মী পালা নামে একটা পালা গাপন আছে। প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস মতে চাকমারা আদি সৃষ্টিকর্তাকে গোজেন বলে। সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে গোজেন মানেই (মানুষ) সৃষ্টি করেন। মানুষ সৃষ্টি করলেও গোজেন তখনও তাদের মুখে বোল ফুটেনি। এ অবস্থায় গোজেন তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

“কলহ গোজেন মানেই মাত্, (সাবদ করো)
মানেই মাদিলাক গোজেন্ ভাত।
(গোজেন বললেন, মানুষেরা কথা কও” । মানুষেরা বলল,- হে
গোজেন! আমাদের ভাত দাও, আমরা এখন ক্ষুধার্থ।) কিন্তু পৃথিবীতে
তখনও ভাত সৃষ্টি হয়নি কোথায় মিলবে ভাত? তখন গোজেন বললেন,
ভাদঅ মালিক মা লক্ষ্মী
স্বর্গত অহল তার সবত্তি।

অর্থাৎ ভাতের মালিক হল মা লক্ষ্মী। এখন পৃথিবীর মানেই (মানব) কুলকে বাঁচাতে হলে অবশ্য স্বর্গ হতে লক্ষ্মীকে আনতে হবে। কিন্তু তাকে আনতে কে যাবে? তখন চাকমাদের চুঙুলাং/চুমুলাং পূজার প্রধান দেবতা, পরমেশ্বরী দেবী প্রথম স্বামী কালাইয়া প্রথমে গেল। তখন সে লক্ষ্মীর আবাসে গিয়ে লক্ষ্মীর পরম আতিথেয়তায় পেশী মদ, ভাং পান করে নেশার ঘোরে আবোল তাবোল বকতে শুরু করেছিল–

দিঝা আহরেইয়ে মদ ভাং খেই
খাক্‌কে দাগে মা খাক্‌কে বেই।
রাগে তারে লক্ষ্মী কয়
পাগলঅ সমারে যেদুং নয়।

কালাইয়া নেশা গ্রস্থ হয়ে লক্ষ্মীতে কখনও ডাকে মা আর কখনও ডাকে দিদি। তখন লক্ষ্মী রাগ তম্বরে বললেন–“এ পাগলের সঙ্গে আমি মর্ত্যপুরীতে যাব না। এদিকে কালাইয়ার ফিরতে দেরী দেখে মনুষ্যকুলে হাহাকার পড়ে গেল। স্বর্গপুরে এখন কে যাবে খবর নিতে? তখন মানব কুলের দুর্দশা দেখে গঙা দেবীর স্বামী”–

‘বিয়াত্রা’ তখন বলল
গঙা পুদি আগে ড়ুগ
দিবানি মরেহ মানেই লুক?
যানি তুমি খাম খেলে,
লক্ষ্মী খজা মুই যেম সালে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ হে মানব সকল, তোমরা যদি সত্য কর যে গঙাদেবীর পূজায় আমাকেই আগে ভোগ নিবেদন করবে তাহলে আমি লক্ষ্মী আনতে যাব) তার শর্তে সবাই রাজি হলে বিয়াত্রা তখন স্বর্গে গিয়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে মর্তপুরীতে আসে। পৃথিবীতে লক্ষ্মী এলে মানব কুলের অন্নাভাব ঘুচলো। তবে লক্ষ্মীকে চিরকাল পৃথিবীতে থাকা সম্ভব নয়, তাই কিভাবে তাঁকে পূজা করলে লোকের সুখ-সম্বৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে তাই বলে গেলেন।

এ মা লক্ষ্মীমা পূজা মূলত গৃহস্থদের ধন-সম্পদে অবস্থান করে কোন প্রকার অভাব অভিযোগ যাতে না হয়। তাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। তবে বর্তমানে শিক্ষা-দীক্ষা আধুনিকতার ছোয়া তথা বৌদ্ধ ধর্মের উত্তোলনের ফলে এ মা লক্ষ্মী মা পূজা প্রায় নেই বললেই চলে। তবু গ্রামাঞ্চলে এখনও কিছু কিছু জায়গায় গৃহস্থরা এ পূজা করে থাকে। বর্তমানে এ পূজার পরিবর্তে চাকমারা ঐশ্বর্যের প্রতিক সীবলী পূজা করে থাকেন।

মা লক্ষ্মী পূজা

মা লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠানে সংগ্রাহক আনন্দ মিত্র চাকমা

www.pathagar.com

সিন্দি পূজা : চাকমা ভাষায় সিন্দি আর বাংলায় শিরণী। তখনকার দিনে চাকমাদের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে হিন্দুদের দেখা দেখি সত্য নারায়নের নামে শিরণী পূজা করতে দেখা যায়। গৃহস্থরা পারিবারিক মঙ্গলার্থে বছরে অন্তত একবার বাড়িতে সিন্দি পূজার আয়োজন করতেন।

তবে এখনো অনেক জায়গায় এ পূজা করতে দেখা যায়। সত্য নারায়ন কিংবা সত্যপীর যেই হউন, উভয়ে তখন খুব জাগ্রত দেবতা বলে সবার নিকট বিবেচিত হতেন। এ পূজাকে নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি কথা বলা কিংবা একে নিয়ে কটূক্তি করার কেউ সাহস পেত না। যারা এ পূজাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কিংবা কটূক্তি করতো তারা সাক্ষাত প্রমান পেত। হয় গ্রামে মহামারী দেখা দিত, হয়ত জঙ্গলে বাঘের উপদ্রব দেখা দিত। নিদেন পক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ কিংবা তার পরিবারের কারো না কারো সমূহ বিপদ ঘটে যেত।

সেই সময় চাকমারাও এ লৌকিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। পঞ্চাশের দশকে স্বর্গীয় হরকিশোর চাকমা ভগবান বুদ্ধের দশ পারমীর সত্য পারমীকে ভিত্তি করে "সত্যের পাঁচালী" নামে আরেকটি পুঁথি রচনা করেন। এটাও এখন আর পাওয়া যায় না।

সিন্দি পূজা করার উদ্দেশ্যে : নানা কারণে তৎকালীন লোকেরা সিন্দি/শিরণী মানত করত। গ্রামে মহামারী, বিবিধ রকমের বিপদমুক্তি, জীবনাশংকা, বৈষয়িক সমৃদ্ধি, এমন কি কাজে সফলতা পাওয়া এবং ক্ষেতে পোকা মাকড়ের উপদ্রব থেকে ফসল রক্ষার জন্য লোকে সত্য নারায়ন বা সত্যপীরের নামে শিরণী মানত করত। বাঘের উপদ্রব নিবারণই নাকি এই পূজার বিশেষত্ব।

সিন্দি পূজার উপকরণ

সোয়াসের দুগ্ধ লাগে সোয়াসের আটা,
সুপক্ক বদলী লাগে সোয়াসের মিঠা।

তাছাড়া আঁখ নারিকেল, পান সুপারী এবং বিবিধ প্রকার ফুল ও লাগে। তুলসী এ পূজায় অপরিহার্য। একাধিক পূজা হলে সম-পরিমাণ উপকরণ দিয়ে "আলাদা আলাদাপূজা পাশাপাশি সাজাতে হয়। পূজার সময় প্রত্যেকটা পূজার শিয়রে একটা পিদিম জ্বলে আর লেখাপড়া জানা একজন লোক ব্রাহ্মনের ভূমিকা নিয়ে সুর করে পুঁথি পড়তে থাকে। এ সময় গৃহস্থ এবং উপস্থিত ব্যক্তি বর্গ কিছু না কিছু দক্ষিণা দিয়ে থাকে। পূজায় প্রদত্ত পান সুপারী এবং দক্ষিণের পয়সা পুঁথি পাঠকারী ব্রাহ্মনের প্রাপ্য। পূজা শেষে, দুধ কলা, আটা, গুড়, কলা নারিকেল ইত্যাদি একটা বড়পাত্রে নিয়ে সিন্দি মাখানো হয়। তার পর গৃহস্থের জন্য পরিমাণ মত কিছুটা সিন্দি রেখে দিয়ে বাকীটা পড়শীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়। খাওয়ার আগে সিন্দি প্রথমে মাথায় নিতে হয়। এ সময় পাড়ার ছেলে মেয়েদের মধ্যে সিন্দি খাওয়াকে কেন্দ্র করে কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি লেগে যায়। তাই চাকমাদের মাঝে, সিন্দি খেইয়া গুড়া গুন অর্থাৎ সিন্দি/শিরনী খেকো বাচ্চারা। এই সিন্দি যেখানে সেখানে ফেলা বারণ। উচ্ছিষ্ট সব কিছু নদীতে কিংবা ডোবায় ফেলে দিয়ে আসতে হয়। অন্যান্য সমাজে শিরণী/সিন্দি সিদ্ধ করে খাওয়ার রেওয়াজ থাকলেও চাকমাদের মধ্যে কিন্তু কাঁচা খাওয়াই বিধি। ব্যাপারটা যদিও স্বাস্থ্য

www.pathagar.com

বিধি বর্হিভূত তবু এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে এ কাঁচা সিন্দি খেয়ে কারো কোনদিন সামান্যতম পেটের অসুখ করেছে এমনটি কখনও শোনা যায়নি।

বর্তমানে চাকমাদের মাঝে সিন্দি পূজা পালন অনেকটা কমে গেছে। তার কারণ একদিকে শিক্ষা প্রসার অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব। গ্রামে কিছু কিছু জায়গায় প্রচলিত থাকলেও শহরাঞ্চলে তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে। হয়ত এমন সময় আসবে যে দিন হয়ত শুধুমাত্র কিংবদন্তি হয়েই থাকবে।

সিন্দি পূজা

সিন্দি পূজা অনুষ্ঠানে সংগ্রাহক ঃ অশ্গন চাকমা

www.pathagar.com

লম্রে পূজা : সাধারণত পার্বত্য আদিবাসীদের মধ্যে যারা জুমচাষী বা হাল চাষ করেন তার এই পূজাটি করে থাকেন। জুম বা ক্ষেতের ফসল যাতে ভালো হয়, পোকা-মাকড় বা ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ যাতে ক্ষতি করতে না পারে এবং সর্বোপরি গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য এই পূজার আয়োজন করা হয়।

এই পূজা সম্পাদনের জন্য নারিকেল, কলা, আঁখ, গুড়, দোকান থেকে ক্রয়কৃত নানা ধরনের খাদ্য দ্রব্য, (দোগানজারা– দোকানে পাওয়া যায় এমন খাদ্যবস্তু যেমন- মুড়ি, চানাচুর, বিস্কুট, চকলেট, বাদাম ইত্যাদি) এবং একটি নতুন পাত্রের প্রয়োজন হয়। সেই সাথে প্রয়োজন হয় জুমের বা ক্ষেতের চাল।

এই পূজা সম্পাদনের নিয়মাবলী : সবুজ বৃক্ষের নীচে জায়গা পরিস্কার করে সুন্দরভাবে মাটি লেপে গাছের পাতা বিছিয়ে শ্মশান থেকে আনা চারটি বাঁশের কঞ্চি প্রথমে তিন কোণে তিনটি পুততে হবে। আরো একটি পূজা পর্ব শেষ হলে আসার সময় মাটিতে পুঁথে আসতে হয়। আর সেই পূজার তিনটি মূর্তি বানাতে হয়। এই তিন দেবতার নামে পূজা দেয়া হয়। রান্না করা ভাত ও তরকারী অন্য কেউ স্বাদ নেবার বা খাবার আগেই পূজার মধ্যে দিয়ে অন্যান্য খাদ্যবস্তু যেমন নারিকেল, কলা, গুড়, পিঠা সবকিছু সিন্নি পূজার মত করে মাখতে হয়।

পূজার সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে নতুন পূজার পাত্রটিতে গামছা নতুবা তামাক পাতা পুড়িয়ে ধোঁয়া ছড়াতে হয়।

বাঘে খেলে মাধা-ধনা : কোনো লোককে বাঘে খেলে বা কোনো লোক বাঘের আক্রমণে মারা গেলে তার গোত্রের সবাইকে অঝা ডেকে যার যার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ছড়ার পারে/ঘাটে একটি পূজা মণ্ডপ তৈরি করে সেখানে মোরগ বলি দিয়ে পরিশুদ্ধ হতে হয়। মন্ডপে ফুল দিয়েও পরিশুদ্ধ হওয়া যায়। এই অনুষ্ঠানকে চাকমা ভাষায় মাধা-ধনা (মাথা ধোওয়া)/বুর পারানা বলা হয়। পরিবারের লোকজন নদীর ঘাট থেকে ঘরে ফিরে যাবার পথে পিছনে ফিরে তাকাতে পারে না।

বৈদ্য বা ওঝার মন্ত্রপাঠ শেষ হলে পরিবারের লোকজন ঘরে প্রবেশ কতে পারে। চাকমাদের বিশ্বাস, বাঘের আক্রমণে নিজ গোত্রের কারো মৃত্যুর খবর জানার পর মাধা-ধনা অনুষ্ঠান পালন না করলে সেই পরিবারের যে কোনো সদস্যের বাঘের আক্রমণে মারা যাবার আশংকা থাকে। ৪০/৫০ বছর আগেও গ্রামাঞ্চলে এই নিয়ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এই পুজাকে চাকমা ভাষায় মাধা-ধনা (মাথা ধোওয়া) বলা হয়।

ব্যাখ্যা : জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বন জঙ্গল দ্রুত আবাদ হয়ে যাওয়ায় বাঘসহ অনেক বন্য প্রাণী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। বাঘও লুপ্ত হবার পথে। তাই বাঘের আক্রমণের আশংকাও প্রায় দূর হয়েছে। চাকমা ভাষায় এই পূজাক ‘বুর পারানা’ বলা হয়ে থাকে। তবে বাঘে না খেলেও পরিবারের অমঙ্গল দূর করার জন্য এই পুজা করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

দুধলী তেঙা দেনা : পাত্রী নির্বাচনের পর বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেলে পাত্রীপক্ষের দাবি-দাওয়ার বিষয়টিও পাত্রীপক্ষের সাথে ফয়সালা করে নিতে হয়। পাত্রীপক্ষের (দাবির) যুক্তি হল যে, পিতা অন্ন, বস্ত্র, স্নেহ, মমতা দিয়ে কন্যাকে লালন-পালন করেছেন, তিনি কন্যার ভরন-পোষণ ও লালন-পালনের ব্যয় হিসেবে পাত্রপক্ষের কাছে তার ইচ্ছানুযায়ী নগদ টাকায় একটি অংক অথবা অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী কনেপণ হিসাবে দাবি করতে পারেন।

অন্যদিকে, কনের মাতাও জন্মকাল থেকে দুধ খাইয়ে তার কন্যাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং বড় করেছেন। তিনিও সেজন্য নগদ টাকা দাবি করতে পারেন এবং তা দেয়া হয়ে থাকে। মেয়েকে দুধ খাওয়ানোর জন্য পাত্রীর মাকে যে টাকা দেয়া হয় সেটাকে চাকমা ভাষায় 'দুধলী তেঙা' বলা হয়।

চাকমা ভাষায় টাকাকে 'তেঙা' বলা হয়। বিয়ের দিন কনেকে পিতার বাড়ি থেকে শ্বশুড় বাড়িতে নিয়ে যাবার সময় এই টাকা দেয়া হয়। নববধু 'বিষুদ ভাঙা' উপলক্ষে পিতার বাড়ি গেলে তখনও জামাতা (নতুন জামাই) শ্বাশুড়িকে এই টাকা দিতে পারে। বর্তমানে তাই-ই করা হচ্ছে।

ব্যাখ্যা : যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তার 'তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহ প্রথা ও পদ্ধতি' নিবন্ধে তাদের সমাজে 'দুধলী তেঙা' ৭.০০ টাকা বলে উল্লেখ করেছেন। চাকমাদের মধ্যে এরূপ নির্দিষ্ট কোনো টাকার অংক নির্ধারিত ছিল কিনা জানা যায়নি। বর্তমানে শুধুমাত্র প্রথাকে মেনে চলার স্বার্থে/লক্ষ্যে নামমাত্র টাকা যথা : ৫ বা ১০ টাকা 'দুধলী তেঙা' হিসাবে দেয়া হয়ে থাকে।

প্রসূতিকে পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেয়া 'ভাত মজা দেনা' : সন্তান ধারণ ও সন্তান প্রসবের ফলে একজন প্রসূতির শক্তি ও স্বাস্থ্যের ক্ষয় হয়। তা দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য তার পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। তাই প্রসূতির শক্তি ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করার লক্ষ্যে সন্তান প্রসবের ২/৩ দিনের মাথায় পাড়ায় বসবাসকারী স্বামী ও স্ত্রী উভয়পক্ষের আত্মীয়রা (যদি থাকে) অথবা বন্ধুসুলভ প্রতিবেশীরা, বিশেষত মেয়েরা সামর্থ্য অনুযায়ী পুষ্টিকর ও উন্নতমানের খাবার যথা ভাত ও বিভিন্ন তরকারী আলাদা-আলাদাভাবে কলাপাতার মোচা প্রস্তুত করে প্রসূতির কাছে পৌঁছে দেন। চাকমা ভাষায় এটাকে 'ভাত মজা দেনা' (ভাতের মোচা দেয়া) বলা হয়। সাধারণত মেয়েরা সশরীরে গিয়ে প্রসূতিকে এই খাবার দিয়ে আসে। গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে এই 'ভাত মজা দেনা' প্রথা চাকমাদের মধ্যে অদ্যাবধি চালু আছে।

'ফীবলা' (আপদবালাই) : চাকমা অঝা-বৈদ্যদের মতে, মানুষের জীবনে বার প্রকার 'ফীবলা' (আপদ-বালাই) আছে। বিবাহ বা বিয়ে ফি তন্মধ্যে একটি। বিয়েকেও এক ধরনের ফীবলা হিসাবে গণ্য করা হয়। বিষুদ ভাঙার (নববধুর পিত্রালয় গমন) আগে নুতন বৌ বা জামাই ভিন্ন গোত্রের কারো বাড়িতে বেড়াতে বা অন্য কোনো কাজে গেলে সেই বাড়ির লোকদের ফীবলা লাগে বলে ধারণা করা হয়। তখন অঝা-বৈদ্য ডেকে এনে সামাজিক বিধিমতে তাদের পরিশুদ্ধ বা ফীবলা দূর করতে হয়। এরূপ

www.pathagar.com

গৃহস্থ/পরিবার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করলে সামাজিক বিচারে সেই ব্যক্তি আর্থিক ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ দন্ড দিতে বাধ্য হয়।

শিগোলী (দেনা) : চাকমারা বিশেষত অবস্থাপন্ন লোকেরা তাদের ছেলে/মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছ থেকে দর্শনী (অর্থ) পেতেন, যদিও সেটা একেবারে বাধ্যতামূলক ছিল না। চাকমা ভাষায় এই দর্শনীর (অর্থ) প্রদানকে 'শিগোলী' বলা হয়। এই অর্থের কোনো নির্দিষ্ট অংক নির্ধারণ করা থাকে না। আমন্ত্রিত অতিথিরা যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী এই দর্শনী দিয়ে থাকেন। একটু অবস্থাপন্ন লোকেরা নিজের আর্থিক সামর্থ্য প্রদর্শনের লক্ষ্যে একটু বড় অংকের শিগোলী দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রায় সবাই সমাজে নিজের মানসম্মান রক্ষার্থে সামর্থ্যের মধ্যেই শিগোলী দিয়ে থাকেন।

১৯৫৮-৫৯ সনে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে বাস্তুচ্যুত হয়ে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবনে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় নেমে আসে, এতে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভেঙ্গে যায়। এর পরিণতি স্বরূপ তারা তাদের অধিকাংশ সামাজিক রীতিনীতি হারিয়ে ফেলে। অর্থনৈতিক অবস্থায় কিছুটা স্বচ্ছলতা ফিরে পাবার পরই তারা তাদের সেই পুরোনো সামাজিক রীতিনীতি পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসে। বর্তমানে কিছু কিছু এলাকায় এই শিগোলী প্রথা আবার চালু হয়েছে।

'শিগোলী' প্রথা সম্পর্কে বর্তমান মনোভাব : প্রথা হিসেবে শিগোলী বর্তমান চাকমা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলন না থাকলেও তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। গ্রাম সমাজে নগদ টাকায় যে শিগোলী দেয়া হয়, সেই প্রথা শহরাঞ্চলের শিক্ষিত সমাজেও ভিন্নভাবে চালু আছে বলা চলে। শহরের বিয়ে অনুষ্ঠানে সাধারণত বর ও কনেপক্ষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা যথা : কাকা-কাকিমা, মামা-মামী, বড় ভাই-বোন, সামর্থ্য অনুযায়ী বিশেষতঃ কনেকে সোনার এক প্রস্থ বা একাধিক গয়না অথবা কাপড়-চোপড়, যথা : শাড়ী-চাদর ইত্যাদি উপহার হিসেবে দিয়ে থাকেন। এছাড়া বর-কনের বন্ধু-বান্ধবীরাও ডিনার সেট, টেলিভিশন, নিত্য ব্যবহার্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী, শাড়ী, শার্ট-প্যান্টের কাপড়, রান্নার পাত্র ইত্যাদি উপহার দিয়ে থাকেন। এসব দ্রব্য-সামগ্রীও নগদ টাকার পরিবর্তে একধরণের শিগোলী। তবে নগদ টাকায় শিগোলী যেমন সামাজিক রীতি অনুসারে অনেকটা বাধ্যতামূলক, উপহার সামগ্রী সে রকম বাধ্যতামূলক নয়। নবদম্পতিকে তাদের নুতন সংসার জীবনে অনেকটা উৎসাহ ও প্রেরণা যোগানোর উদ্দেশ্যেই এ ধরনের উপহার সামগ্রী দেয়া হয়ে থাকে বলা যায়।

আতুর ঘরের (সুতিকাগার) বিধি নিষেধ : চাকমা সুদোম/প্রথামতে একজন গর্ভবতী মেয়ে তার নিজের পিতা-মাতা ও স্বামীর বাড়িতে এবং স্বামীর গুত্তির (গোত্র) কোনো লোকের বাড়ি ছাড়া অন্য কারো বাড়িতে সন্তান প্রসব করতে পারে না। পার্বত্যাঞ্চলের চাকমা সমাজে গর্ভবতী মেয়ের পিতা-মাতা ও স্বামীর গোত্রের লোকের বাড়িতে সন্তান প্রসবের এই নিয়ম মেনে চলা হয়। এটি প্রধানত গ্রামাঞ্চলেই বেশী দেখা য়ায়।

ব্যাখ্যা : যে পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবারের জন্য এটা আনন্দের ও খুশির ব্যাপার হিসেবে সমাজে গণ্য করা হয়। আবার সন্তান প্রসবের সময় সন্তানের

www.pathagar.com

সাথে যে গর্ভফুল, রক্ত ও জলীয় পদার্থ প্রসূতির শরীর থেকে বের হয় সেটাকে অপবিত্র মনে করা হয়। তাই স্বামীর বা প্রসূতির নিজের আত্মীয় ব্যতীত অন্য যে কারো বাড়িতে যদি সন্তান প্রসব হয়, তাতে সে গৃহস্থের অমঙ্গল ও ক্ষতি হয় বলে মনে করা হয়। বর্তমানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে ভ্রমণ পথে কোনো অনাত্মীয়ের বাড়িতে প্রসব বেদনা শুরু হবার আশংকা নেই বললেই চলে। তাছাড়া চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সন্তান প্রসবের সরকারী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। শহরাঞ্চলে সন্তান প্রসবের বেলায় এ ধরণের বিধি-নিষেধের আওতায় আসার আশংকা নেই বললেই চলে।

চাকমাদের সৎকার রীতি : চাকমা সমাজে কারো মৃত্যু হলে মবদেহ সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়। এসময় বিশেষ ভাবে ঢোল বাজানো হয় এবং ঘরের সদর দরজায় মাটির পাত্রে তুষের আগুন রাখা হয়। শবদাহের দিনে মৃতদেহকে স্নান করিয়ে দেয়া হয়। এসময় বৌদ্ধ পুরোহিত ডেকে এনে মৃতের আত্মীয়স্বজন মঙ্গল সূত্র শ্রবণ করেন। মৃতের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব পরিচিতজনেরা মৃতের আত্মার সদগতি কামনা করে টাকা-পয়সা দান করে থাকে। শবদেহকে শ্মশানে নেয়ার জন্য বাঁশ দিয়ে 'আলং' (শবাধার) তৈরি করা হয়। মৃতদেহ শ্মশানে নেয়ার পূর্বে শবের মুখে সাতটি অন্ন পিন্ড ছোয়ানো হয়। এরপর মৃতের পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে সাত লহড় বিশিষ্ট সুতার একটি প্রান্ত বেঁধে অপর প্রান্তটি একটি মুরগির বাচ্চার আঙ্গুলে বাধা হয়। মৃতের আত্মীয়স্বজন মুরগির বাচ্চাটি ধরে রাখে। সমাজে বসবাসকারী একজন ওঝা উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করে- 'মরা জেদায় ফারক গরি দিবার হুগুম আগেনি' (মৃত ও জীবিতগণকে পৃথক করে দেবার সম্মতি আছে কি?)। সকলে 'আঘে-আঘে' অর্থাৎ আছে-আছে বলার পর দলুক (কাঁচা বাঁশের ধারালো ফালি) দিয়ে সুতাটি কেটে ছিন্ন করে দেয়া হয়। এর মাধ্যমে মৃতের সাথে জীবিতদের সম্পর্ক ছিন্ন করা বোঝায়। মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য রওনা হলে মৃতের পরিবারের ঘরের যাবতীয় পানি ও চুলার ছাই বাইরে ফেলে দেয়া হয়। এটাও মৃতের সাথে বাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রতীক। শবাধারে মৃতদেহের সাথে একটি পুটলীতে ভাত ও অন্যান্য খাদ্য বেঁধে দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্মশানে নেয়ার সময় মৃতের পা দুইটি বাড়ির দিকে থাকে। এটি বাড়ি থেকে তার শেষ যাত্রার প্রতীক। দাহ করার আগে মৃতের সাথে বেঁধে দেয়া খাদ্য শেষবারের মতো তার মুখে ছোয়ানো হয়।

মৃতদেহ পুরুষের হলে চিতায় পাঁচ স্তর এবং স্ত্রীলোক হলে সাত স্তর করে লাকড়ি সাজানো হয়। এরপর (শবাধার) আলংসহ চিতার চারদিকে পুরুষ হলে পাঁচবার এবং স্ত্রীলোক হলে সাতবার ঘুরানো হয়। প্রতিবারে 'আলং'কে চিতার সাথে সামান্য স্পর্শ করিয়ে শেষের বারে মৃতদেহ চিতায় তুলে দেয়া হয়। মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র বা রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় প্রথমে চিতায় আগুন দেবার পর অন্যরা অগ্নি সংযোগ করে। পরদিন স্বগোত্রীয় একজন আত্মীয় চিতা থেকে হাঁড় ও কিছু ছাই ভস্ম নিয়ে একটি নতুন মাটির হাঁড়িতে রেখে সাদা কাপড় দিয়ে হাড়ির মুখ ঢেকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। সাধারণত কনিষ্ঠ পুত্র ছাইভস্মের হাড়িটি নিয়ে পানিতে নেমে ডুব দিয়ে মাথার উপর থেকে ফেলে দিয়ে জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের দিকে ঠেলে দেয়। এরপর চিতার চারকোণে চারটি বাঁশ পুতে বাঁশের মাথায় সাদা কাপড়ের চন্দ্রাতপ বা 'টাংগোন' উড়িয়ে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

কলেরা, বসন্ত ইত্যকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে কারো মৃত্যু হলে প্রথমে মাটিতে পুঁতে রেখে পরে দাহ করা হয়। ছোট শিশুর মরদেহ মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়। চাকমা সমাজে লক্ষ্মী বার হিসেবে বুধবারে কাউকে দাহ করা হয় না। মৃতের রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়দের নিরামিষ খেতে হয়, পুত্র সন্তানদের মাথার চুল ফেলে ন্যাড়া হয়ে ফি (আপদ-বিপদ) দুর করতে হয়। মৃত্যুর সাত দিন পর 'সাত দিন্যা' শ্রাদ্ধ এবং বছর শেষে 'বজরী' অনুষ্ঠান হয়। পর পর তিন বছর এই অনুষ্ঠান সামাজিকভাবে করতে হয়। এতে বৌদ্ধ পুরোহিত বা ভান্তে এনে মঙ্গল সূত্র শোনা হয় এবং মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য পিন্ডদানসহ নানাবিধ দান দক্ষিণা দিয়ে ধর্মীয় রীতিতে আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

মারমাদের সৎকার রীতি : মারমা সমাজে মৃত্যুর কারণভেদে, লিঙ্গভেদে, বয়সভেদে, সামাজিক অবস্থানভেদে মৃত্যুপরবর্তী আনুষ্ঠানিকতাও ভিন্ন ভিন্নভাবে হয়। অঞ্চলভেদেও আনুষ্ঠানিকতার বৈসাদৃশ্য থাকে। তবে মুল আনুষ্ঠানিকতায় ভিন্নতা থাকে না। মারমা সমাজে মৃত্যুর কারণকে দু'ভাবে বিভক্ত করা হয়। এক- স্বাভাবিক মৃত্যু, দুই- অস্বাভাবিক মৃত্যু, যা মারমা ভাষায় বলা হয় 'আচিইন সিঃ'। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে বয়সগত, সামাজিক অবস্থানগত বা লিঙ্গভেদকে বিবেচনা করা হয় না। সকল ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা প্রায় একই রকম হয়। অবিবাহিত কিন্তু বিবাহযোগ্য কোনো নারী বা পুরুষ মারা গেলে লাশের সঙ্গে কাঠের গুড়ি বা কলা গাছের গুড়ি দিতে হয়। সামাজিক অবস্থানভেদে উচ্চতর ব্যক্তিদের বেলায় অতিরিক্ত কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। যেমন 'রাথা ঙাং পোই', 'সইং আক্কাহ' ইত্যাদি।

মারমা সমাজে মৃতদেহের তাৎক্ষণিক সৎকার হয় না। অম্যাবস্যার দিনে কারো মৃত্যু হলে শুধু তাকেই সেদিন সৎকার করতে হয়। তা না হলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অমঙ্গল হয় বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে। মৃতের আত্মার সদ্‌গতি কামনায় ধর্মীয় পুঁথিপাঠ, ঢোল ও মং এসব বাজানো হয়। পরিবেশকে সরগরম রাখতে ঘরোয়া খেলাধুলার আয়োজন করে পুরুষ ও মহিলা সকলে মিলে মৃতদেহ পাহারা দেয়। হাসপাতালে বা নিজ বাড়ির বাইরে কারো মৃত্যু হলে সেই মৃতদেহকে অমঙ্গলের আশংকায় গ্রামে বা বাড়িতে আনা হয় না। সেই মৃতদেহকে শ্মশানে বা বৌদ্ধ বিহারে নিয়ে যাওয়া হয় (অবশ্য প্রাচীন এ রীতি বর্তমান শিক্ষিত সমাজের কাছে অমানবিক ও অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা থেকে পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে)। মৃতের ব্যবহৃত খাট বৌদ্ধ বিহারে দান করা হয় এবং ব্যবহৃত বিছানা, কাপড় শ্মশানে ফেলে দেয়া বা পুড়ে ফেলা হয়। মৃতদেহকে মাটিতে সমাধি দেয়া বা পোড়ানোর আগে আত্মীয়স্বজনসহ ঘনিষ্টজনদের শেষবারের মতো দেখানো হয়। চিতা থেকে মৃতের অস্থি সংগ্রহ করে সামর্থ্য অনুযায়ী শ্মশানে স্মৃতি চিহ্ন তৈরি করে দেয়া হয়।

স্বাভাবিক মৃত্যুর বেলায় মারমা সমাজে মৃতদেহের সৎকারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম লাশকে সহনীয় গরম পানি দিয়ে স্নান করানো হয়। এরপর নতুন জামা কাপড় পড়ানো হয়। পুরুষ হলে জামার সামনের অংশটি উল্টোভাবে পিঠের দিকে লাগানো হয়। মেয়েদের বেলায় বোতাম বুকের দিকে লাগানো হয়। অতঃপর সুগন্ধি দ্রব্য ছিটিয়ে 'স্খিাইট' বা 'ছংবাইং' (শবাধার)- এর উপর তোলা হয়। মৃত দেহের দু' পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল দু'টিকে একত্র করে সাদা সুতা দিয়ে সাত পাকে বাধা হয়। এরপর গ্রামের

www.pathagar.com

ক্যাং (বিহার) এর ছ্রাদঞ্জ্রী (বিহার অধ্যক্ষ) বা তার নিযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা মৃতের সদ্গতি কামনা ও ধর্মদেশনা হয়। শবাধারকে উত্তর দক্ষিণে লম্বা-লম্বি করে রাখা হয়। মৃতের মাথা থাকে উত্তর দিকে। মৃত ব্যক্তি যদি পরিবারের প্রধান বা বয়োজ্যেষ্ঠ হয়, তাহলে 'ছংবাইং' (শবাধার) ব্যবহার করা হয়। তবে মাতা-পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার মরদেহ মেঝেতে রাখা হয়। মৃত দেহের পাশে বসে 'নিঃবাইং সুক্' (গৌতম বুদ্ধের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন গাঁথা, পুথি) পড়া হয়।

পারলৌকিক বিশ্বাস অনুসারে মৃতের আত্মার প্রয়োজন মেটাতে মরদেহের বুকের উপর ধাতব মুদ্রা, পায়ের দিকে খোমেজা, মাথার দিকে জলভর্তি পাত্র রাখা হয়। মৃত দেহের মাথার পাশে 'ম্রাঙহমুং ঙা লুং' রাখা হয়। এই বিশেষ চোঙাকে ম্রাঙহমুং প্রতীকী হিসেবে ধরা হয়। চাউল তরিতরকারী দিয়ে খোমেজা রান্না করা হয়।

মৃত দেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার পূর্বে কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। ক্যাং-এর ছ্ড়াদঞ্জ্রী (বিহারাধ্যক্ষ) সি-খাইট/ছংবাইং এ পাশে বসে 'স্য-দাং তাং অর্থাৎ মুক্তির দেশনা দেন। ঐ সময় মৃতের কানের পাশে 'নারাং ছাইং হুক্' (ছোট বাঁশের চোঙায় সামান্য চাউল দিয়ে সশব্দে নাড়ানো) করা হয়। একই সময় অন্য আরেকজনকে 'কুঙ খ্যু' (একটি বাঁশের বেতকে এক দমে টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা) করতে হয়। লাশের সাথে কুষ্ঠি লিখে দিতে হয়। মৃত ব্যক্তির জন্ম তারিখ, মৃত্যুর তারিখ, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দানকৃত টাকা-পয়সা, চাউল, তালাহ্, ম্রঙহমুঙ, কুঙ খ্যু এসবের হিসেব লিখে দেয়াকে কুষ্ঠি বলা হয়।

চিতায় লাকড়ির স্তূপে তালাহসহ মৃতদেহ উঠানোর পর ছ্ড়াদঞ্জ্রী (বিহারাধ্যক্ষ) সমবেত লোকজনকে শীল প্রদান করেন। অতঃপর মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতি ও মুক্তি কামনা সম্বলিত ধর্মদেশনা দেয়া হয়। তারপর 'রি জাঃ খ্যা' (উৎসর্গ) অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। মৃত ব্যক্তি যদি বিবাহিত হয় তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি পাতার প্রতীকি সাক্ষী রেখে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। সব রকম আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবার পর পরিবারের সদস্যগণ প্রথমে চিতায় জ্বালানী কাঠের স্তূপে আগুন দেন। এরপর অন্যরা আগুন দিতে পারে।

শ্মশানের সীমানার পাশে থাকে 'কাঙমুইংরি/কাঙবইংরি' (বাঁশের চোঁঙায় কাঁচা হলুদ মিশ্রিত পানি)। শ্মশানে আগত প্রত্যেককে ফিরে যাবার সময় এই 'কাঙমুইংরি/কাঙবইংরি' স্পর্শ করতে হয়।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে সরাসরি ঘরে প্রবেশ করা নিষেধ। স্নান করে নতুবা ক্যাং-এ ধর্মদেশনা শুনে আসতে হয়। প্রত্যেকের ঘরে ফোয়েমুইং জ্বালানো হয় ও কাঙবইংরি রাখা হয়। শ্মশান থেকে ফিরে আসা লোকজনের জন্য ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে 'ম্-স্য-রি' অর্থাৎ শ্মশান জল (ছোট্ট একটি পাত্রে সামান্য চাউল, ঘরের চালের ছন এবং পানি মিশ্রিত পাত্রে জ্বলন্ত কাঠের অঙ্গার চুবিয়ে তৈরি) ঘরের সদর দরজায় এনে রাখা হয়। শ্মশান থেকে ফিরে আসা লোকজন ঘরের ভেতরের দিকে মুখ রেখে বাম হাতে 'ম্-স্য-রি'কে নিজের পেছন দিকে নিয়ে ঘরের বাইরে ফেলে দেয়। ফেলার পর ঘরের বাইরের

www.pathagar.com

দিকে ফিরে তাকাতে পারে না। ঘরের ভেতর থেকে অন্য একজন 'সা-সাইঙ চাং ব্যা' তিনবার উচ্চারণ করার পর শ্মশান থেকে ফিরে আসা লোক ঘরে প্রবেশের অনুমতি পায়।

স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এমন ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন হতে ৭ (সাত) দিনের ভেতর মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ম্-স্া-ছোয়াইং' (পিন্ডদান) দেয়া বাধ্যতামূলক। এই অনুষ্ঠানটি মৃত ব্যক্তির বাড়িতে হয়। তবে কোনো শিশু বা প্রাপ্তবয়স্কের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ অনুষ্ঠানটি বাড়িতে না করে বৌদ্ধ মন্দিরে করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে 'ছোয়াইং জিং' বলা হয়।

মারমা সমাজে মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে দাহ করা তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম। শবদাহ করার জন্য শ্মশানে উত্তর-দক্ষিণমুখী চিতায় লম্বালম্বিভাবে জ্বালানি কাঠের স্তুপ সাজানো হয়। পুরুষের জন্য তিন এবং মহিলার জন্য চার স্তর বিশিষ্ট জ্বালানী কাঠের স্তুপ সাজানো হয়। কাঠের স্তুপের উপর উত্তর দিকে মৃতের মাথা রেখে মরদেহসহ 'ত্লাহ (খাটিয়া)' বসানো হয়। এর আগে চিতার চারদিকে মরদেহসহ 'ত্লাহ (খাটিয়া)'কে তিনবার প্রদক্ষিণ করানো হয়। এভাবে সৎকার শেষে মৃতের আত্মার মুক্তি ও উন্নত জীবন লাভের প্রার্থনায় কিছু আনুষ্ঠানিকতা : যেমন ছোয়াইং (পিন্ডদান), পরিইহ্ খাং, সাং/পাইংজাং খাইন ইত্যাদি সম্পাদন করা হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে পঞ্চভিক্ষুকে পিন্ডদান/অন্নদান করা এ সকল অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

মারমারা মৃত্যু বার্ষিকী পালন করে। মৃত্যুর তারিখে বা দিবসে বা চন্দ্র মাসে এই বার্ষিকী পালিত হয়। এই বার্ষিকী পালন পিন্ড/অন্ন/অষ্ট পরিস্কার দান-এর মাধ্যমে হয়ে থাকে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের সৎকার রীতি : তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে কারো মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির মুখের ভেতর একটি ধাতব মুদ্রা দেয়া হয়। এ ধাতব মুদ্রাকে 'মুঅতাঙা' অর্থাৎ মুখের টাকা বলা হয়। ঐ টাকা দেয়ার উদ্দেশ্য হলো মৃত ব্যক্তির আত্মাকে পরলোকে অর্থাৎ ভবনদীর অপর পারে পাড়ি দেবার খরচ দেয়া। তারপর মৃত ব্যক্তিকে স্নান করিয়ে এবং নতুন সাদা কাপড় পড়িয়ে বাঁশের তৈরি শবাধার (তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় সামাইন ঘর) এর উপর আপাদমস্তক ঢেকে রাখা হয়। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতরা মরদেহের বুকের উপর ইচ্ছানুসারে টাকা-পয়সা রেখে যায়। এসব টাকা-পয়সাকে 'বুগতাঙা' অর্থাৎ বুকের টাকা বলা হয়। মৃতের ঘরের দরজায় একটি মাটির পাত্রে তুষের আগুন জ্বালিয়ে 'আইল্যা বেলা' রাখা হয়। মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনেরা ৭ দিন অর্থাৎ সাপ্তাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোনো আমিষ আহার করেন না। শব দাহ করার পরের দিন মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তানেরা মাথা মুড়িয়ে ফেলে।

বুধবার কিংবা অমাবশ্যার দিনে শবদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে রীতি বিরুদ্ধ। তাই মৃতদেহকে প্রয়োজনে ১/২ রাত পর্যন্ত রাখা যায়। শবদেহকে শ্মশানে নেয়ার আগে ওঝা বা বৈদ্য দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে অন্যান্য জীবিত আত্মীয়স্বজনের সাথে (মরা-জেদা ফারগ গরনী) পৃথক করা হয়। এ প্রথা কারবয়া, মংলা, মুঅ ও ধৈন্যা গছা (গোত্র) সহ সকল তঞ্চঙ্গ্যারা পালন করে। শ্মশানে নিয়ে যাবার দিনে

www.pathagar.com

সকালে বাড়ির উঠানে কাঠের শবাধার বানিয়ে শবদেহ রাখা হয়। মৃতের জন্য ভাত রান্না করে সামান্য কিছু ভাত শবের মুখে গুঁজে দিয়ে অবশিষ্টাংশ কলা পাতায় মুড়ে শবের সঙ্গে দেয়া হয়। এর কারণ হলো : পরিবারের কেউ বহু দুরের পথে কোথাও গেলে যেমন বাড়িতে ভাত খেয়ে আরো কিছু ভাত মোচায় (পুটলি) বেধে সঙ্গে নিয়ে যায়, সে রূপ মৃত ব্যক্তির সাথেও দেয়া হয়। শবদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাবার আগেই শ্মশান যাত্রীরা বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ ও মঙ্গল-সূত্র শ্রবণ করে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি ও মঙ্গল কামনায় সাধ্য মতো টাকা-পয়সা দান বা উৎসর্গ করে। শ্মশানে শুকনা কাঠ দিয়ে চিতা (রূবাকু) তৈরি করে রাখা হয়। রূবাকু তৈরীতে পুরুষের বেলায় ৫ স্তর আর স্ত্রীলোকের বেলায় ৭ স্তর করা হয়। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে দক্ষিণ দিকে পা ও উত্তরমুখী মাথা করে চিতায় তোলা হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি অনুসারে আচার অনুষ্ঠান শেষে প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র কিংবা তার অনুপস্থিতিতে অন্য পুত্রগণ অথবা কোনো নিকটাত্মীয় ৭ বার চিতা প্রদক্ষিণ করে শবদেহের মুখে এবং পরে চিতায় আগুন দেয়। বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি দূরারোগ্য কোনো সংক্রামক রোগের কারণে কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির লাশ দাহ না করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। শবদাহ শেষে শ্মশান হতে ফিরে আসা শ্মশান যাত্রীরা স্নান ঘরের দরজায় রাখা চন্দন মিশ্রিত পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে কিছু পানি মাথায় ছিটিয়ে দেয়। তারপর তেতো পানি মুখে দিয়ে শুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করে।

শবদাহের পরদিন সকালে শ্মশানে গিয়ে পুত্র সন্তান বা স্বগোত্রীয় যে কেউ শবদেহের ছাইভস্ম থেকে বিভিন্ন অস্থির সামান্য অংশ সংগ্রহ করে মাটির একটি নতুন হাঁড়িতে রেখে সাদা নতুন কাপড় দিয়ে হাঁড়ির মুখ বেঁধে রাখে। তারপর পানিতে ডুব দিয়ে মাটির হাঁড়িটি মাথার উপর থেকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। ঐ ডুবে থাকা ব্যক্তি তার ডান হাত পানির উপরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন তার কনিষ্ঠ আঙ্গুলে সুতা বেঁধে টেনে তুলে নেয়। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের লোকবিশ্বাস হলো, এভাবে অস্থি নদীতে ফেলে দিলে অস্থির কোনো একটি অংশ এক সময় ভেসে গিয়ে পবিত্র গঙ্গা নদীতে ও বুদ্ধ গয়ায় পৌঁছাবে এবং তাতে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি হবে।

অস্থি বিসর্জনের আগে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চিতার চারকোণা ঘিরে ৭ নাল (প্রস্থ) সাদা সুতা পেঁচিয়ে উপরে 'চান্দাল-কানি' (চাঁদোয়া) খাটিয়ে দেয়া হয়। ঘেরার মাঝখানে একটি জলপূর্ণ কলসীর মুখ সাদা কাপড় দিয়ে বেধে রেখে দেয়া হয়। তারপর ৪ খন্ড বাঁশের আগায় চারখানা লম্বা সাদা কাপড়ের ফালি বেধে শ্মশানের চারকোণায়

পুঁতে দেয়া হয়। এগুলোকে 'থাঙোইন্' (ধ্বজা) বলে।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে শবদাহের ৬ দিন পর সাপ্তাহিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানকে 'সাতদিন্যা' বলে। এ অনুষ্ঠানে মৃতের আত্মার সদ্‌গতি কামনায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ করে মঙ্গলসূত্র শ্রবণ এবং আত্মীয়স্বজন ও সমাজের লোকজনদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। পরিবারের সাধ্যানুসারে ভোজনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি ও শান্তি কামনা করে টাকা-পয়সা এবং বিবিধ দানীয় সামগ্রী ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে।

www.pathagar.com

ত্রিপুরাদের মৃতের সৎকার রীতি : সনাতন ধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা সমাজে কারো মৃত্যু হলে মৃতের পায়ের কাছে একটি মুরগির বাচ্চা এনে কাটা হয়। তারপর মৃত ব্যক্তিকে সুগন্ধি সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে বাঁশের তৈরি শবাধারে তুলে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত ব্যক্তির বাড়ি থেকে শ্মশান পর্যন্ত সাদা সুতা টেনে আনা হয়। মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র অথবা তার অনুপস্থিতিতে যে কোনো পুত্র কিংবা পুত্রের অবর্তমানে যে কোনো নিকটাত্মীয় মৃতের মুখাগ্নি করে থাকে। মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি আগুনের মশালকে নিজের পেছনদিকে উল্টো করে হাতে ধরে চিতা প্রদক্ষিণ করার পর চিতায় (শবসজ্জায়) আগুন ধরিয়ে দেয়। শবদাহের পরদিন চিতা থেকে ছাই ভস্ম ও হাড়-গোড় পরিষ্কার করে তুলে নিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। শবদাহের তের দিন পর শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার আয়োজন করা হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে দান-দক্ষিণা ও পিন্ড উৎসর্গ করা হয় এবং মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে ভাত, নানা তরকারী, ফলমূলসহ বিবিধ সুস্বাদু খাবার উৎসর্গ করা হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীর জন্য ভোজের আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা সমাজে সম্পদশালী বা অর্থবান ব্যক্তির শবদাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক সময় রথ তৈরি করা হয়। রথে শবদেহ রেখে ঢোলের তালে-তালে দোলানো হয়। এটিকে 'মাংগাইক্‌কগ' বলা হয়। আবার চার চাকাযুক্ত রথে মৃতদেহ রেখেও রথ টানা হয়। এই অনুষ্ঠানকে 'রাথাসগ' বলা হয়। স্বর্গের দল ও নরকের দল হিসেবে বিভক্ত দু'দলের রথ টানাটানিতে স্বর্গের দলকেই সাধারণত জেতানো হয়। ত্রিপুরা সমাজে দাঁত উঠে নাই এমন শিশুর মৃত্যু হলে মাটিতে সমাধি দেয়া হয়। ত্রিপুরা পরিবারে কারো মৃত্যুর পর মৃতদেহের পাশে ধুপ-দীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। একটি মুরগির বাচ্চা কেটে মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে ভাত দেওয়া হয়। মৃতদেহকে সঙ্গে সঙ্গে দাহ করা সম্ভব না হলে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ, কীর্তন করা হয়। মৃতদেহ শ্মশানে নেবার জন্য বাঁশ দিয়ে শবাধার তৈরি করে তা রঙিন কাগজে সাজানো হয়। শবাধারে পুরুষের বেলায় একটি দা এবং মহিলার ক্ষেত্রে একটি ঝুড়ি বা নথাই ও কাপড় বোনার সরঞ্জাম (বিশেষ করে বিয়ং বা রাচামি) দিতে হয়। মৃতের উদ্দেশ্যে শ্মশানে ভাত উৎসর্গ করার জন্য একটি ঝুড়িতে চাউল, তরকারী, শুটকী ও মুরগিসহ একটি কলসী নিতে হয়। এছাড়াও বাঁশের তৈরি একটি ছাতা ও একটি থাবা (শাপলা আকৃতির) শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

চিতা সাজানোর সময় মৃতদেহ পুরুষের হলে পাঁচ স্তরে ও মহিলা হলে সাত স্তরে লাকড়ি বা কাঠ দিতে হয়। উত্তর-দক্ষিণমুখী করে সাজানো চিতায় উত্তর দিকে মৃতের মাথা এবং দক্ষিণে পা রাখা হয়। শবাধারসহ সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ শেষে মৃতের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে চিতায় মৃতদেহ তুলে দেয়া হয়। চিতায় যেদিকে শবের মাথা থাকে সেদিকে থাবা ও বাঁশের ছাতাকে চার হাত দূরত্বে মাটিতে পুঁতে দিয়ে সেখানে পুকুর আকৃতির একটি ছোট গর্ত খুঁড়ে তাতে কলা পাতা বিছিয়ে সামান্য পানি ও কাঁচা হলুদ দেয়া হয়। পরলোকে মৃতের বৈতরণী পার হবার জন্য সেই পুকুরে পয়সা দেয়া হয়। হরিনাম কীর্তন করে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করার পর মৃত ব্যক্তির ছেলে বা নিকটাত্মীয় যে কোনো একজন সূতার তৈরি সলতেকে সরিষা তেলে ভিজিয়ে থাবায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি চিতায় আগুন ধরিয়ে দেবার পর অন্য শ্মশানযাত্রীরা একে একে চিতায় আগুন দেয়। চিতায় মাথার দিকে মাটিতে খোঁড়া

www.pathagar.com

পুকুরের পাশে দাঁড়িয়ে একটি বাঁশের চোঙায় পানি নিয়ে অচাইকে দিয়ে মন্ত্র পড়ে মৃত ব্যক্তির নিকট হতে বিদায় নিতে হয়।

চিতায় আগুন দেবার পর শ্মশানে রান্না করা মুরগি ও অন্যান্য তরকারীসহ ভাত মৃত ব্যক্তির আত্মা এবং লেংটা লেংটি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। বাঁশ দিয়ে একটি নৌকা তৈরি করে তাতে হালিশ লাগিয়ে সেই নৌকার মধ্যে চিতা থেকে সংগ্রহ করা মৃতের মাথার মগজ রেখে তা নদী বা ছড়ায় ভাসিয়ে দিতে হয়। মৃতদেহ সম্পূর্ণ পুড়ে যাবার পর চিতা থেকে তার কপালের হাঁড় নিয়ে এক টুকরো কাপড়ে জড়িয়ে রেখে দেয়া হয়। এই হাঁড় শ্রাদ্ধকালে বা তীর্থ স্থানে গিয়ে বিসর্জন দেবার রীতি আছে। শ্মশানে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে ভাত উৎসর্গ করার সময় তার সন্তানদের মধ্যে যে কোনো একজন বা মুখাগ্নিকারীকে শপথ নিতে হয় যে, সেদিন হতে ১৩ দিন পর মৃতের উদ্দেশ্যে খাবার দেয়া হবে এবং এই তেরদিন পর্যন্ত শপথকারী সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী হয়ে সংযম পালন করবে। মৃতের আত্মা সেদিন যেন আহার গ্রহণ করে শেষ বিদায় নিয়ে যায়। শপথ নেবার পর এক ফালি কাপড় ছিড়ে তাতে লোহার চাবি বা লোহার টুকরো বেঁধে শপথকারী নিজের শরীরে ধারণ করে। শপথকারী তার সংযম পালনের ১৩ দিন পর্যন্ত চুল, দাড়ি, নখ কিছুই কাটতে পারে না। সেলাই করা কোনো বস্ত্র গায়ে দিতে পারে না এবং প্রসাধনী তেল কিংবা সুগন্ধি সাবান ব্যবহার করে না। উঁচু আসনে বসা এবং ভালো বিছানা বা কারো সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমানো তার জন্য নিষেধ। ঘরের বারান্দায় বা কোনো পরিচ্ছন্ন স্থানে আলাদাভাবে রান্না করে তাকে খেতে হয়। খাবার সময় মুখে বালি বা কয়লা পড়লে সে বেলার আহার বন্ধ রাখতে হয়। এভাবে সংযম পালন করে ১৩ দিন পূর্ণ হলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার আগের রাতে ধর্মীয় পুঁথি বা পুস্তক পাঠ, কীর্তন এসবের আয়োজন করা হয় সামর্থ অনুসারে। শ্রাদ্ধের দিনে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে খাবার উৎসর্গ করার জন্য শ্মশানে তার চিতার পাশে একটি ঘর তৈরি করা হয়। ত্রিপুরাদের গোত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন নকশায় তৈরি করা ঘরটিকে রঙিন কাগজে সাজানো হয়। সেখানে মৃতের ব্যবহার্য নানা জিনিসপত্র দেয়া হয়। এই শ্মশান ঘরকে ত্রিপুরা ভাষায় 'সিমাংনগ' বলা হয়। সকাল বেলায় রান্না শেষ করে দুপুরের আগে শ্মশানে গিয়ে প্রথমে শপথকারী একটি কলা পাতায় ভাতসহ তরকারী দেয় এবং পরে অন্যান্য আত্মীয়রা খাবার তুলে দেয়। শ্মশান ঘরের পাশে লম্বা একটি বাঁশের মধ্যে নিশান উড়িয়ে দেয়া হয়। শ্মশান ঘরের পেছনে থাকা বাঁশের ছাতা ও থাবার নিচে গর্ত খোঁড়া পুকুরে পানি ও কাঁচা হলুদ দিয়ে পরলোকে মৃত আত্মার বৈতরণী পার হবার জন্য সেখানে পয়সা দেয়া হয়। আড়াই গিড়া (বাঁশের গাঁট) যুক্ত একটি বাঁশের চোঙায় পানি নিয়ে একজন অচাইকে (ওঝা) দিয়ে মন্ত্র পড়ে আত্মীয়স্বজন সকলে মৃতের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেয়। এরপর আত্মীয়-স্বজনসহ আমন্ত্রিত সকলের ভোজ শেষে একজন গুরুজন বা প্রবীণ ব্যক্তিকে প্রণাম করে শপথকারী তার নিরামিষ খাওয়া শেষে আমিষ খাবার অনুমতি গ্রহণ করে। 'খুমপালা' গাছের (বিউ ফুল গাছ নামেও স্থানীয়ভাবে পরিচিত) একটি কচি ডালকে শপথকারী তার পেছনে নিয়ে ভেঙ্গে দু' টুকরো করে মৃতের সাথে সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এভাবেই ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সামাজিক রীতি অনুসারে মৃতের সৎকার

www.pathagar.com

সম্পন্ন হয়। ইদানিংকালে শহুরে সমাজ ব্যবস্থায় ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর কোনো কোনো পরিবারে মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নেবার পূর্বে মৃতের পায়ের আঙ্গুলের সাথে একটি মুরগির বাচ্চাকে সুতা দিয়ে বেঁধে সেই সুতা কেটে মৃতের সাথে তার পরিবারের সম্পর্ক ছিন্ন করার রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। মূলত এই রীতিটি ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত রীতির অনুকরণ মাত্র, যা ত্রিপুরা সামাজিক রীতিসম্মত নয়। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা খ্রীষ্ট ধর্মীয় রীতিতে মৃতের সৎকার ও আচার অনুষ্ঠান করে থাকে।

খিয়াংদের সৎকার রীতি : খিয়াং সমাজে কারো মৃত্যু হলে বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হিসেব স্ব-স্ব ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী দাহ বা কবর দেয়া হয়। বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারী খিয়াং সমাজে দূরারোগ্য ব্যাধিতে কারো মৃত্যু হলে তাকে দাহ না করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী খিয়াং পরিবারে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে কারো মৃত্যু হলে এক সপ্তাহ/এক মাস/এক বছর পর বৌদ্ধ পুরোহিতের মাধ্যমে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করা হয় এবং গ্রামের লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের বেলায় ধর্মীয় রীতি অনুসারে মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। খিয়াং সমাজে ভূত-প্রেত ও অপদেবতার প্রতি প্রাচীন বিশ্বাস বিদ্যমান। তারা মনে করে যে, সব কাজে এদের প্রভাব থাকে। অপদেবতা বা অপশক্তিগুলো একেকজন একেকটি পাহাড় বা জায়গা দখল করে থাকে বলে তাদের বিশ্বাস। তাই কোনো পাহাড়ে বা নতুন জায়গায় বসতি স্থাপন বা ঘর তৈরি করার পূর্বে তারা পাহাড় দখলকারী অপদেবতাকে খুশি করার জন্য পশুবলি বা ডিম দিয়ে পুজা দেয়। তারা মন্ত্রপূত সাদা সুতা ঘরের চারিদিকে টেনে দেয়, যাতে করে ভুত-প্রেত বা অপদেবতা তাদের ক্ষতি করতে না পারে।

পাংখোয়াদের সৎকার রীতি : পরিবারের কারো মৃত্যু হলে গ্রামবাসী সকলে মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করতে সমবেত হবার নিয়ম পাংখোয়া সমাজে রয়েছে। সৎকারের উদ্দেশ্যে শবদেহ কফিনে রেখে দূরবর্তী জঙ্গলে নিয়ে শুন্যে ঝুলিয়ে রাখার রেওয়াজ ইতিপূর্বে ছিল। কফিনের নীচে পরিবারের আত্মীয়স্বজনকে প্রতিদিন ধোঁয়া দিতে হতো। এক বছর পর্যন্ত এই নিয়মে রাখার পর কফিন হতে শবদেহের প্রতিটি হাঁড় ধুয়ে পরিস্কার করে নিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন কাপড়ে বেঁধে কবর দেয়া হতো। কবরের উপর মৃতের নাম পরিচয় লেখা স্মৃতিস্তম্ভ বা ফলক থাকে। বর্তমানে খ্রিষ্ট ধর্মীয় রীতি অনুসারে আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবর দেয়া হয়। ধর্মীয় পুরোহিত মৃতের আত্মার সদ্‌গতি ও শান্তি কামনা করে প্রার্থনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। প্রার্থনা শেষে কবরে শবদেহ রাখা হয় দক্ষিণমুখী করে। তারপর কবরে মাটি দিয়ে তার উপর স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপন করে চারপাশে ঘেরা দেয়া হয়।

তথ্যসহায়ক

১. বাংলাদেশের আদিবাসী : এথনোগ্রাফিয় গবেষণা, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ৬২ প্রবাল হাউজিং, রিংরোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোন : + ৮৮ ০২৮১২২৮৮১, গবেষণা ও সম্পাদনা : মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খবশী, পল্লক চাকমা, মংসিংঞো মারামা ও হেলেনা বাবলি তালাং

www.pathagar.com

২. রাধামন ধনপুদি, সম্পাদক, চিরজ্যোতি চাকমা, রাঙ্গামাটি ঈস্থেটিকস্ কাউন্সিল (রাক), রাঙ্গামাটি। প্রকাশ কাল-১৯৮১
৩. চান্দবী বারমাস ও চিত্ররেখা বারমাস, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, প্রকাশ কাল- ২০০৩
৪. চাকমা, মার্মা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খিয়াং ব্যক্তিগত ও পারিবারিব আইন, প্রমোশন অব ডেভেলপমেন্ট অব ইন্ডিজিনিয়াস রাইটস্ (পিপিআইআর) প্রবন্ধের গবেষণা গ্রন্থনা, গ্রন্থস্বত্ব : কপো সেবা সংঘ, আদালত সড়ক, বনরূপা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। সহযোগী সংস্থা "*মানুষের জন্য ফাউন্ডেশান*" ঢাকা। গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : এডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা. এডভোকেট প্রতীম রায়, সাংবাদিক শৈলেন দে
৫. লামাহ্ পালাহ্ বারমাস, প্রিয়দর্শী খীসা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, প্রকাশ কাল- ২০১২
৬. সুহৃদ চাকমা স্মারক গ্রন্থ, জুম ঈস্থেটিকস্ কাউন্সিল (জাক), রাঙ্গামাটি। প্রকাশকাল- ২০০৫
৭. জীবন পাংখোয়া, বসন্ত মোন, রাঙ্গামাটি
৮. রমণী মোহন গেংখুলী, চারণ কবি, জুরাছড়ি
৯. অমর শান্তি চাকমা, শিক্ষক, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
১০. ধনসুক তালুকদার, ঘিলাছড়ি, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি
১১. আনন্দ লতা চাকমা, বসন্ত আদাম, রাঙ্গামাটি
১২. শুভ্রজ্যোতি চাকমা, গবেষণা কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি
১৩. সুব্রত চাকমা, সংস্কৃতি কর্মী, রাঙ্গামাটি
১৪. জয় শান্তি চাকমা, করল্যাছড়ি, লংগদু, রাঙ্গামাটি
১৫. বরুণ কান্তি চাকমা, সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাঙ্গামাটি
১৬. অনুপম খিয়াং, উন্নয়ন্ সংস্কৃতি কর্মী, চন্দ্রঘেনা, রাঙ্গামাটি
১৭. লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, শিক্ষক ও সংস্কৃতি কর্মী, রাজস্থলী
১৮. অগ্য জাই মার্মা, কৃষক, কাউখালী, রাঙ্গামাটি

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

১. চাকমাদের লোকখাদ্য

চাকমাদের রন্ধন প্রণালী খুবই বৈচিত্র্যময়। রন্ধন পদ্ধতির মধ্যে উচ্যা, সিক্যা, হলা, গরান, কেবাং, গুদেয়্যা ও কোরবো উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে দেশে বিদেশে এ ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলির কদর বাড়ছে।

উচ্যা : সাধারণত কোন শাক-সবজি সেদ্ধ করে খাওয়াকে উচ্যা বলে।

হলা : মাছ মাংস ডিম লবণ হলুদ পেঁয়াজ কাঁচা মরিচের ফালি অল্প পরিমাণ তেলে রান্না করা হয়। তবে ঝোল কম থাকে।

গরান : সাধারণত মাছ মাংস শুটকি লবণ, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, মসলা ও সামান্য তেল একসাথে মেখে বাঁশের চোঙায় রান্না করাকে গরান বলে।

কেবাং : মাছ মাংস ডিম শুটকি লবন হলুদ মরিচ পেঁয়াজ মসলা (ফুঝি/সাবরাং) অল্প তেলে একসাথে মেখে কলাপাতা মুড়িয়ে কয়লার আগুনে রান্না করা খাবারকে কেবাং বলা হয়।

গুদেয়্যা : বাঁশের চোঙায় বা পাতিলে মরিচ ও শুটকি মিশিয়ে চুর্ণ করে রান্না করা খাবার কে গুদেয়্য বলা হয়। মাছ বা শুটকি দিয়ে মরিচ গুদেয়্য(ভর্তা) আদিবাসীদের খাবারের প্রিয় অনুসঙ্গ।

নাপ্পি বা সিদোল : সামুদ্রিক ছোট মাছ ও চিংড়ি গুড়ো করে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি হয় সিদোল। বিশেষ করে শাক সবজি রান্নায় ও কোরবোয় সিদোলের ব্যবহার বেশি হয়। এ সিদোল চাকমা এবং পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় সব আদিবাসিদের একটি প্রিয় খাবার।

ফুঝি, সাবারাং : ফুজি ও সাবারাং উদ্ভিজ জাতীয় এক প্রকার মসলা। শাক–সবজি ও মাছ মাংস রান্নায় ফুঝি সাবারাং অপরিহার্য। ফুজি সাবারাং পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় সব আদিবাসীদের খুবই প্রিয়।

শাক : নানা রকমের শাক সবার প্রিয়। যেমন– উচ্ছে শাক, লেলাং শাক, ঢেঁকি শাক, উজন' শাক, কচু শাক, বাত্তুয়া শাক, পুই শাক, ইয়ারেং শাক, লাউ শাক, আমিলা পাতা শাক, রেই শাক, শষ্য শাক প্রভৃতি। শাক পাক (সিদ্ধ) করবার সময় শুধুমাত্র কাঁচা লংকা ও লবণ ছাড়া আর কিছুই দেয়া হয় না।

মাশরুম বা উল : মাশরুম বা উল আদিবাসী জনগণের কাছে অতি লোভনীয় একটি খাবার। বিশেষ করে সাম্মো উল যা বর্ষার সময় জঙ্গলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়, আদিবাসীদের কাছে অতি জনপ্রিয়।

www.pathagar.com

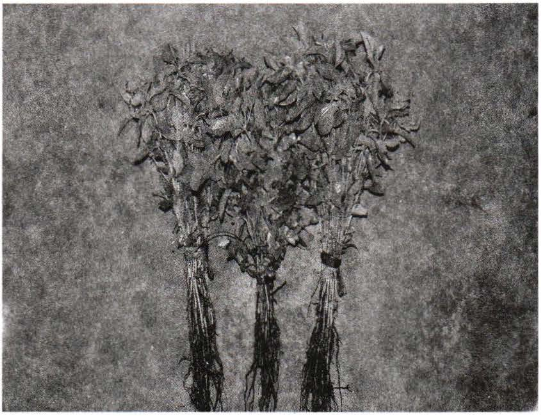

সাবারাং

ফুঝি

রান্না করা শাক

www.pathagar.com

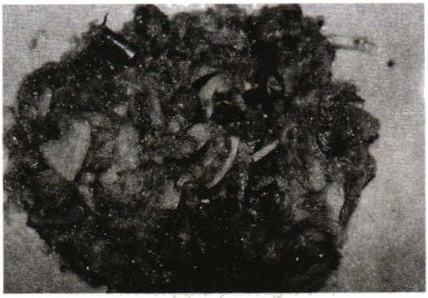

রান্না করা মাশরুম বা উল

রান্না করা বাচ্চুরি বা বাঁশকোরল

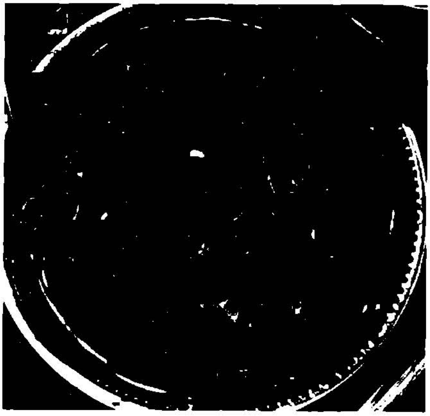

শামুক তরকারী

www.pathagar.com

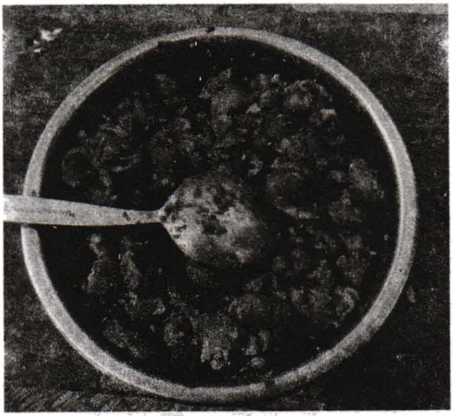

বড়ই কোরবো (বড়ইয়ের ভর্তা)

কোরবো : আগুনে পোড়ানো শুটকি, সিদ্ধ করা মুরগির মাংস ও শাক সবজি বা কাঁচা শাক সবজি ফলমূল সিদোল (এক প্রকার শুটকি) ও মরিচ মিশ্রিত তৈরি খাবারকে কোরবো বলা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে কোরবোতে রসুন আদা বাটা ও মরিচের পরিমাণ বেশি ব্যবহার করা হয়।

সিক্যা : সাধারণত মাছ মাংস ভাল করে ধুয়ে হলুদ লবণ মরিচ মেখে আগুনে সেকা হয়।

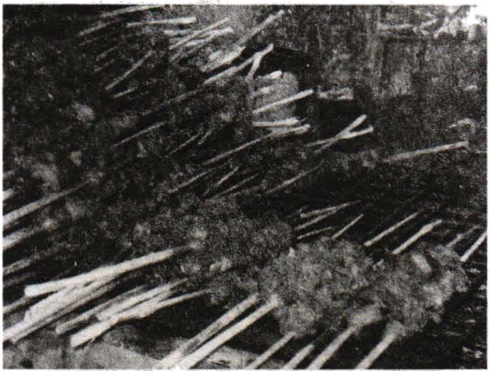

মাংসের সিক্যা বা শিক

সান্যা পিধা : নানা ধরনের পিঠা চাকমাদের খুব প্রিয়, তার মধ্যে সান্যা পিধা একটি। খুব মিহি চাউলের আটার ডেলা করা হয় এরপর চুলার বাস্পে সিদ্ধ করার পর চূর্ণ করে তাতে নারিকেলের কোড়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর কিছু জল মিশিয়ে গোলা করে তারমধ্যে গুড় বা চিনি মিশিয়ে একটি থালায় ঘুরাতে ঘুরাতে গোলাকৃতি করে চুলার বাস্পে সিদ্ধ করে পিঠা খাওয়া হয়।

www.pathagar.com

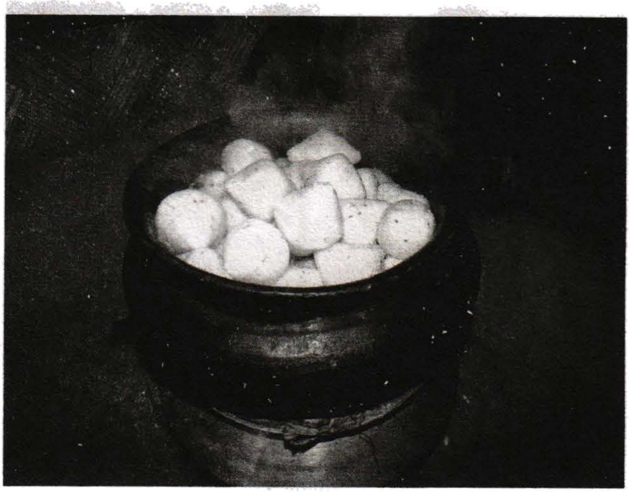

সান্যা পিধা

বিনি হগা পিধা : একটি জলপূর্ণ হাড়ির মুখে অন্য একটি সছিদ্র ছোট হাড়ি ভাল করে এটে লাগানো হয়, পরে সেটি জালের উপর স্থাপন করে উপরের পাত্রে রেখে ঢাকনি দেওয়া হয়। এতে নিচের হাড়ির বাস্পে উপরের 'বিনি হগা পিঠা' যা কিনা জলেসিক্ত বিনি চাউল কলাপাতায় মুড়ে বানানো হয়, তা সিদ্ধ করে খাওয়া হয়।

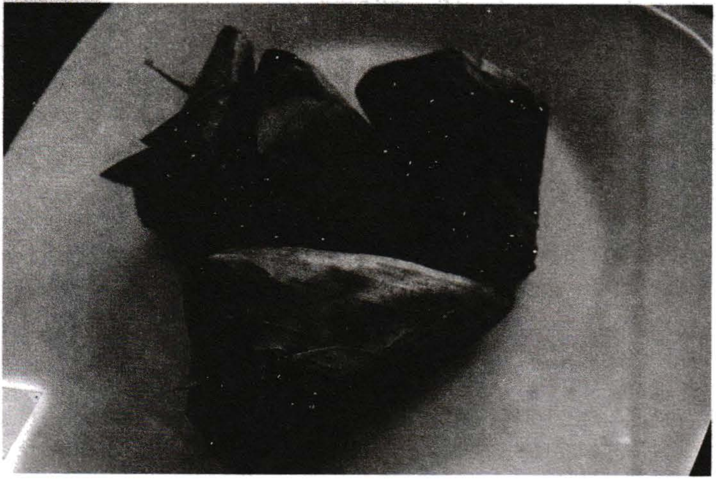

বিনি হগা পিধা

বরা পিধা : বিনি চাউল অথবা সাধারণ চাউলের মিহি আটায় কিছু পরিমাণ জল মিশিয়ে তেলে ভাজা করে বরাপিঠা তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

বড়াপিধা

পাক্কোন পিধা : চাউলের মিহি আটা (তার মধ্যে বিনি চাউলের আটাও সামান্য পরিমাণে মিশিয়ে দিলে ভাল ফুলে) ও গুড়ে কিছু পরিমাণ জল দিয়ে মাখিয়ে তেলে ভাজা হয়।

মদ : মদ্যপান আদিবাসীদের একটি সাধারণ প্রচলিত ব্যাপার। এক সময় গ্রাম গঞ্জের প্রায় প্রতিটি ঘরেই মদ তৈরি করা হতো। খাওয়ার উদ্দেশ্যে ইচ্ছামত মদ তৈরি করা গেলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এটা তখন বিক্রয় করা হতোনা। কারণ আদিবাসী সমাজে যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ এমনকি জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের সময়ও মদের ব্যবহার স্বীকৃত একটি রীতি। বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নে পান-তামাকের সাথে মদ্যপানের প্রচলন এখনো আদিবাসী সমাজে বিদ্যমান। তবে অতিরিক্ত মদ্যপান এবং মদ্যপানের পর মাতলামিকে আদিবাসীরা কখনো উৎসাহিত করেনা। বরং যারা মদ্যপানের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদেরকে সামাজিক বিচারের মাধ্যমে দন্ড প্রদান করা হয়। আনন্দ-ফূর্তির জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য মদ্যপান একটা অপরাধ হিসাবে দেখা না হলেও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য তা প্রকাশ্যে মদ্যপান অনেকটা নিষিদ্ধ।

২. তঞ্চঙ্গ্যাদের লোকখাদ্য

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মত তঞ্চঙ্গ্যাদেরও শুটকি প্রিয় খাদ্য। চিংড়ি শুটকি, ছুরি শুটকি, হাঙ্গর শুটকি নিত্যদিনের অপরিহার্য। সিদ্ধ তরকারি মরিচ বাট্যা (নাপ্পি বা চিদোল প্রয়োগে মরিচ বাটা) তঞ্চঙ্গ্যাদের খাদ্য তালিকায় অপরিহার্য। সিদ্ধ তরকারিকে 'উসুনা চন' বলা হয়। 'উসুনা চন' তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রতিবেলা আহারে যথাসাধ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

৩. পাংখোয়াদের লোকখাদ্য

খাবার নিয়ে পাংখোয়াদের তেমন কোন বাচ-বিচার নেই, সামনে যেটা পায় সেটা পাংখোয়ারা স্বাচছন্দে খেতে পারে। প্রকৃতির প্রেমী জাত তারা প্রাকৃতিক ভাবে সব কিছুতেই স্বাভাবিক ভাবে মেনে চলার স্বভাব তাদের রয়েছে।

খাবার মধ্যেও এর বাইরে নয়। কিন্তু অন্যান্য আদিবাসীদের চেয়ে পাংখোয়াদের খাবার তালিকাটা একটু ভিন্নতা এবং বৈচিত্র্যতা রয়েছে, পাহাড় অঞ্চলে অধিবাসীরা সবাই কম বেশি জঙ্গলে লতা-পাতা, ফলমূল বা শাক-সবজি পছন্দ করে। কিন্তু পাংখোয়াদের বেলায় তা ভিন্ন। তারা শাক-সবজির চাইতে বন্য মাংস পছন্দ ভীষণ রকম। পাংখোয়ারা ছোট প্রাণী ইঁদুর হতে শুরু করে বড় প্রাণী হাতি পর্যন্ত খায়!! শুনতে আশ্চর্য বা অবাক লাগতে পারে এটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় এখনও এই খাবার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী পাংখোয়াদের খাবার মেন্যুতে আইটেম হিসেবে পাওয়া যায়। পাংখোয়ারা যেহেতু শিকারি জাত তাদের এসব পছন্দনীয় খাবার জোগাড় করতে মাত্র সময়ের ব্যাপার, বিভিন্ন কলা কৌশল ফাঁদ বা কল দিয়ে বিভিন্ন পশুপাখি শিকার করতে তারা খুবই পারদর্শী।

পাংখোয়াদের খাদ্যাভাসের কিছু উল্লেখযোগ্য আইটেম

১. লাখ সুক (ভর্তা) : কাচা/শুকনা মরিচ, নাপ্পি ও লবণ বেটে তরকারি মিশিয়ে কুরবা করা হয়। যেমন : চংমা লাক সুখ বা শসা কুরবা, চপেতে লাকসুখ/বাছুর মাংস কুরবা, ভকতে লাকসুখ/শুকর ছানা কুরবা, ঙাউতে লাকসুখ/বানরের বাচ্চা ভর্তা ও মে লাক সুখ- মাংস ভর্তা ইত্যাদি।

২. আন রত (ভর্তা) : কাচা/শুকনা মরিচ, নাপ্পি ও লবণ বেটে তরকারি মিশিয়ে ভর্তা/আনরত করা হয়। যেমন- আনডাকরত-বেগুন ভর্তা ও মারশিয়া রত- মরিচ ভর্তা ইত্যাদি।

৩. আন পম (সিদ্ধ তরকারি) : সিদ্ধ তরকারি বলতে মসলা, মরিচ ও হলুদ ছাড়া বুঝায়, সাধারণত শাক-সবজি, কপি সিদ্ধ বা আলু সিদ্ধ মনে করতে পারেন কিন্তু তা নয় পাংখোয়াদের ঐসব সিদ্ধ তরকারি ছাড়াও তাজা মাছ সিদ্ধ, তাজা মাংস সিদ্ধ করে খায় সিদ্ধ তরকারি তারা খুবই পছন্দ করে।

৪. বুনক (চাল দিয়ে মাংস) : এটিও কিছুটা সিদ্ধ তরকারির মতো তবে "বুনক" হলো তাজা মাংস সাথে রান্না হলে ভাল হয়, যেমন– আরমে বুনক-মুরগির মাংস চাল দিয়ে সিদ্ধ, এ তরকারি পূজা এবং নতুন বাচ্চা ডেলিভারি নারীকে বেশি খাওয়ানো হয়। ভকমে বুনক-শুকরের মাংস সাথে চাল সিদ্ধ ইত্যাদি।

৫. আন মুং (বাঁশের চুঙ্গা দিয়ে রান্না) : এটি একটি প্রাকৃতিক রান্না যেখানে হাড়ি-পাতিল নেয়া সম্ভব নয় সেখানে বাঁশ দিয়ে তরকারি রান্না করাকে "আন মুং" বা বাঁশের চুঙ্গার তরকারি রান্না বলে, এটি ঐতিহ্যবাহী ধারাবাহিকতা ধরে রাখছে ইদানিং ৩ পার্বত্য জেলাতেও এ রান্না খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

www.pathagar.com

৬. বু মুং (বাঁশ দিয়ে ভাত রান্না) : একই ভাবে এটিও একটি প্রাকৃতিক রান্না যেখানে হাড়ি-পাতিল নেয়া সম্ভব নয় সেখানে বাঁশ দিয়ে ভাত রান্না করাকে 'বু মুং' বা বাশের চুঙ্গার ভাত রান্না বলে। বাশের ভিতরে চাল দিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বাঁশের চুঙ্গাটি বেশি আগুন না লাগার জন্য খেয়াল রেখে আগুনের উত্তাপ দিয়ে রান্না করতে হয়।

৭. মে থু (পচা চর্বি) : এটি টেস্টিং সল্টের মতো কাজ করে, বিভিন্ন তাজা মাংসের গন্ধ বা চাপিলা মাছের মতো সিন্দিয় বাচ/গন্ধ গুলো সংবরণ করে আর ঐ ধরনের গন্ধ থাকে না, এই মেথু লুসাইরা আরো বেশি পছন্দ করে তরকারি কিছু না থাকলে মেথু বা পচা চর্বি দিয়ে ভাত খেতে পারে। এই পচা চর্বিটি শুধু শুকরের চর্বি দিয়ে তৈরি রাখার নিয়ম হলো শুকর চর্বিটি পুরাতন একটি হাড়ির ভিতরে রাখা হয়, রাখার পর কলা পাতা দিয়ে সুন্দরভাবে পাতিলের মুখটি বন্ধ এমনভাবে করা হয় যাতে কোন বাতাস না ঢুকতে এবং বের হতে না পারে। তারপরে আগুনের চুলার উপর ৪-৫ মাস রাখার পর খাওয়ার উপযোগী হয়।

৮. বু তুই চম (পানি ভাত) : ঘরে তরিতরকারি কিছু না থাকলে পাংখোয়ারা খালি ভাত, পানি ও হালকা লবণ দিয়ে 'বু তুই চম' বা পানি ভাত খায়। ডেলিভারির বাচ্চার মাকে ডেলিভারি হবার পর পরই এ ভাত খাওয়ায় যেন পেট ঠাণ্ডা হয়।

৯. যে মাংস গুলো খায় না পাংখোয়ারা

যে কোন তরকারি বা তরিতরকারি সুস্বাদু করে রান্নার জন্য অবশ্যই উপকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেমন তেল, মরিচ, মসল্লা, হলুদ, পেয়াজ ও রসুন ইত্যাদি। তবে পাংখোয়ারা এসবের তেমন প্রয়োজন বোধ করে না। কারণ তারা সিদ্ধ বা বয়েল্ড খাবার খেতে অভ্যস্ত। যে কোন তরিতরকারি সেদ্ধ বা হলুদ, তেল, মরিচ, পেয়াজ-রসুন ছাড়াই খেতে পছন্দ করে। এখানে দু'একটি সেদ্ধ রান্না করা মেন্যু উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন : 'আরমে বু নক' বা চাল দিয়ে মুরগির সিদ্ধ - এই মেন্যুটি সম্পূর্ণ ভাবে সিদ্ধ মুরগির মাংস এই মেন্যু রান্না করতে প্রয়োজন শুধু লবণ, হালকা হলুদ, আধা পত চাল ও পানি এখানে তেল বা মসলা জাতীয় কোন কিছুই প্রয়োজন নেই। এই মেন্যুটি শিশুরা এবং বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকার করে। তাছাড়া, ভাত হলো তাদের প্রধান খাদ্য এবং নাপ্পি, শুটকি মাছ, ইছা শুটকি ও শুকনা মাংস ইত্যাদি খায়। তবে কালের বিবর্তনে আধুনিক স্রোতের হাওয়ায় কিছু আধুনিকায়নের ছোঁয়াও লেগেছে এসব খাবার পরিবর্তনের ও অনেকাংশে লক্ষ করা যায়।

৪. খিয়াংদের লোকখাদ্য

খিয়াংরা ভাতের সাথে প্রচুর পরিমাণে সবজি খেতে পছন্দ করে। বেশির ভাগ সবজি সিদ্ধ করে খায়। এছাড়া থুকনো মাছ দিয়ে তৈরি এক প্রকার খাবার ' নাপ্পি' ও তাদের পছন্দের। বন্য প্রাণী শিকার করলে এর কিছু অংশ চুলার উপর বাঁশের তৈরি শিকগুলি শুকিয়ে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। পরবর্তীকালে সুবিধাজনক সময়ে তারা সেগুলো রান্না করে খেয়ে থাকে। এছাড়া তারা নিজেরাই ঘরে মদ তৈরি করে। সাধারণত নিজেদের তৈরি মদ দিয়ে তারা অতিথি আপ্যায়ন করে।

www.pathagar.com

লোকনৃত্য

১. ত্রিপুরাদের বোতল নৃত্য

ত্রিপুরা সমাজের বিবাহ রীতি অনুসারে বরযাত্রীকে প্রথমে কনে বাড়ির উঠানে বসে বিশ্রাম করতে হয়। যদি কনেপক্ষের দাবি অনুসারে ঢোল, বাঁশি ইত্যাদি থাকে তখন বিশ্রামকালে বর-কনে দু'পক্ষের দু'জন নৃত্যশিল্পী মদপূর্ণ দুটি বোতল মাথায় নিয়ে ঢোল ও বাঁশির তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে। নৃত্যকালে বরপক্ষ বা কনেপক্ষের নৃত্যশিল্পী কারো মাথা থেকে বোতল পড়ে গেলে সেই পক্ষ নৃত্যে হেরে গেছে বলে গণ্য করা হয়। তখন হেরে যাওয়া দলকে জয়ী দলের সম্মানী হিসেবে এক বোতল মদ ও নগদ পাঁচ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

ত্রিপুরাদের বোতল নৃত্য

www.pathagar.com

২. তঞ্চঙ্গ্যাদের জাদি নৃত্য

তঞ্চঙ্গ্যাদের জাদি নৃত্য

৩. ত্রিপুরাদের গড়াইয়া নৃত্য

ত্রিপুরাদের গড়াইয়া নৃত্য

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলাদেশের আদিবাসী : এথনোগ্রাফিয় গবেষণা, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ৬২ প্রবাল হাউজিং, রিংরোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, গবেষণা ও সম্পাদনা : মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খবশী, পল্লব চাকমা, মংসিংঞো মারামা ও হেলেনা বাবলি তালাং
২. সুরেশ ত্রিপুরা, সংস্কৃতি কর্মী, রাঙ্গামাটি
৩. শুভ্রজ্যোতি চাকমা, গবেষণা কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি
৪. রন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, সংস্কৃতি কর্মী, ভোয়াল্যা, রাঙ্গামাটি
৫. জীবন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, কৃষক, বিলাইছড়ি

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

১. গুদুহারা

এই গুদুহারা বা গুদু খেলাটি অনেকটা হা-ডু-ডু খেলার মত। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে খেলাটি বিশেষ করে বিঝু উৎসবে ছেলেমেয়েরা খেলে থাকে। অনেকেই আবার অবসর সময়ে বন্ধু বান্ধব মিলে দুষ্টামির ছলে খেলাটি খেলে থাকে। খেলাটি সাধারণত দু'দলে ভাগ হয়ে খেলা হয়। উভয় দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে কোন দল আগে শুরু করবে তা টস করে নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত দলটির একজন খেলোয়াড় বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের কাবু করার জন্য এক ধরনের ছড়া বা ছন্দের মাধ্যমে এগিয়ে যায় এবং যতদূর সম্ভব বিপক্ষ দলের এক বা একাধিক খেলোয়াড়ের গা ছুঁয়ে এসে মধ্য রেখাটি পার হওয়ার চেষ্টা করে। রেখাটি পার হতে বা ছুঁতে পারলে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় বা খেলোয়াড়রা মারা যায় অর্থাৎ সাময়িক ভাবে খেলা থেকে বিরত থাকতে হয়। উক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রাও প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের কাবু করতে পারলে একজনের বিপরীতে নিজ দলের একজন খেলোয়াড় প্রাণ ফিরে পায় বা পুনরায় খেলার সুযোগ পায়। খেলার শেষ পর্যন্ত প্রক্রিয়াতেই চলতে থাকে।

গুদুহারার ছড়া

১. এচ্যে বদা হিল্যে ছ', ছেদাম থেলে ধরি চ' ধরি চ' ধরি চ'
২. আমত তলে তক্তা, ম' শুগোর বো পক্তা পক্তা পক্তা
৩. ভুদর রাজা রঙে ভুদ, ধরি চা বাবর পুত বাবর পুত বাবর পুত
৪. ঘুট্টি মাধাত রাঙি হ' , গুজদি লামগুর ধরি চ' ধরি চ' ধরি চ'
৫. গুদু গুদ বোলেলুঙ, মারেজ কাদা ফুদেলুঙ ফুদেলুঙ ফুদেলুঙ

২. ইজিবিজি হারা

এই খেলায় ছেলে-মেয়েরা গোলাকৃতি হয়ে এক জায়গায় বসে তাদের সবার হাত সামনে প্রসারিত করে রাখে। এসময় দলপতি একজন ছড়া কাটতে থাকে—

"ইজি বিজি কারমা বিজি
মোষ চরে ঘড়া চরে
সাধু বয় কদু রান
বার্গি উত্তন মনোরম
এর্গা দের্গা রাজা বাবু
কয়দে সুদা হাত্তান নেজা।"

www.pathagar.com

বলতে বলতে প্রত্যেক শব্দের সাথে সাথে একেক জনের হাত স্পর্শ করতে থাকে। এই ভাবে চক্রাকারে হাত ঘুরিয়ে বিন্যস্ত হাত সমূহ স্পর্শ করতে করতে যে হাতে শেষোক্ত 'নেজা' শব্দটি উচ্চারিত হয় সেই হাতটি তৎক্ষণাৎ উঠিয়ে নিতে হয়। এরপর পুনরায় একই পদ্ধতিতে আবৃত্তি চলতে থাকে এবং সর্বশেষ যার হাতটি অবশিষ্ট থাকে তাকেই পরাজিত সাব্যস্ত করা হয়।

৩. কভাজাং হারা

এই খেলায় দুই বা ততোধিক শিশু পরস্পরের হাতের পৃষ্ঠদেশ কর্ষণে ধীরে ধীরে আন্দোলন করতে করতে ছড়া কাটতে থাকে—

"কভাজাং কভাজাং
মোন উগুরে বাং বাং
একোয়া বদা হলা গরি হাং"

উক্ত ছড়াটি বলার পর হঠাৎ প্রত্যেকে স্ব স্ব হাত সবলে আকর্ষণ করে করতালুতে নিজ নিজ মুখ নির্গত শব্দে বাধা দিতে দিতে 'আবা' 'জাবা' করতে থাকে। এতে কোন জয় পরাজয়ের ব্যাপার নেই।

৪. পল্লাপল্লি হারা

এই খেলাটি লুকোচুরি খেলারই নামান্তর। ছেলেমেয়েরা সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল কোন নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সুবিধাজনক জায়গায় লুকিয়ে থাকে। অপর পক্ষের দলনেতা বলতে থাকে— তোমরা সকলে পালিয়েছ? আমরা এখন খুজতে পারি? এতে কোন উত্তর পাওয়া না গেলে বুঝতে হবে 'মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ'। তখন তারা হৈ চৈ করে অপর দলকে খুঁজতে আরম্ভ করে। যদি কাউকে খুঁজে পাওয়া না যায় তবে আগে ধৃত সকলে অন্বেষণকারীদেরকে তার সন্ধান বলে দিলে পরাজয় স্বীকার করতে রাজি আছে কিনা জিজ্ঞেস করে। পরাজয় স্বীকার করলে তারা এক 'পির' হেরে গেছে বলে ধরে নিতে হয়।

৫. পুৎপুৎ হারা

এই খেলাটি একটি জলক্রীড়া বিশেষ। বুকসমান জলে সবাই দাঁড়ায়, তাদের মধ্যে একজন সবার সামনে কোন ভাসমান বস্তুখণ্ড পানিতে ডুবিয়ে অকস্মাৎ ছেড়ে দেয়। আর সেই মুহূর্ত হতে সকলে জলে হাত দিয়ে ঘন ঘন আঘাত করতে থাকে।

এর মধ্যে সবার আগে যে ঐ ভাসমান বস্তুটি হস্তগত করে মাথাটি জলে ডুবাতে পারে সেই জয়ী হয়। কিন্তু সে জলে ডুব দেয়ার আগে অন্য কেউ বুঝতে পারে যে লক্ষ্যবস্তুটি তার হস্তগত হয়েছে তবে তারা শারীরিক বলের প্রতিযোগিতা দেখায়। যার সামর্থ বেশি সে বলপূর্বক বস্তুটি হস্তগত করে পানিতে ডুব দিতে পারলেই জয়লাভ করে।

www.pathagar.com

৬. বুদ্ধিমান হারা

এই খেলাটিতে ছেলেমেয়েরা একজনকে রাজা বানিয়ে বাকিরা দুইভাগ হয়ে যায়। রাজা মধ্যস্থলে এবং বাকিরা দূরে দূরে থাকে। পরে একদল হতে একজন এসে রাজার কানে কানে গোপনে অপরদলের কোন একজনের নাম বলে যায়। এতে অপরদলের সকলে বিবেচনা করে তাদের মধ্য হতে একজনকে রাজার কাছে পাঠায় তাতে যদি সেই নামোল্লেখিত জনই রাজার কাছে আসে, তবে রাজা তাকে মৃত ঘোষণা করে নিজের কাছে রেখে দেয়। অন্যথা সে যদি অপরদলের কারো নাম বলে যায়, তখন সেই দল হতে একজন আসে। এভাবে কোন দলের সবাই মারা গেলে 'এক পির' সমাপ্ত হয়।

৭. পত্তি হারা

এই খেলাটিতে বৃহৎ একটি বৃত্তের ভিতরে ও বাইরে ছেলেরা দুই দলে ভাগ হয়ে দাঁড়ায়। পরে হা-ডু-ডু খেলার মত দুই পক্ষ হতে পর্যায়ক্রমে এক একজন উচ্চস্বরে 'পত্তি' বলে নিশ্বাস নিয়ে সীমার বাইরে অপর দলকে আহ্বান করে আসে। যদি বিপক্ষ দলেরা আহ্বানকারীকে পাকড়াও করতে পারে। কিংবা তাঁর নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যাওয়া মাত্র ছুঁয়ে দিতে পারলেই সে মারা যায়। অপর দলের কেউ যখন এভাবে মরে তখন বিপক্ষদলের মৃত ব্যক্তি বেঁচে গিয়ে আবার খেলার অধিকার পায়। এভাবে কোন দলের সকলে মারা গেলে অপর পক্ষ 'এক পির' জয়লাভ করেছে বলে সাব্যস্ত হয়।

৮. ঘর' চাক বাইর চাক হারা

এই খেলাটিতে কোন একটি সমতল জায়গায় বৃহৎ একটি বৃত্ত এঁকে ছেলেরা সমান ভাগে ভাগ হয়ে একদল বৃত্তের মধ্যে অপরদল বাইরে থাকে। অনন্তর 'ঘর চাক না বাইর চাক', 'বাইর চাক না ঘর চাক' বলতে বলতে ঘরের দল বাইরের দলকে এবং বাইরের দল ভিতরের দলকে যথাসাধ্য বলপ্রয়োগের মাধ্যমে টেনে স্ব স্ব দল ভুক্ত করার চেষ্টা করে। এভাবে যদি কোন দলের সকলকে সীমানা অতিক্রম করাতে পারে তবে অপর পক্ষের 'এক পির' জয়লাভ হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়।

৯. পোর হারা

এই খেলাটিতে ছেলেরা দুই দলে সমান ভাগে ভাগ হয়। প্রত্যেকবারে একদল পালাতে থাকে এবং অপর দল বাধা তাতে বাধা প্রদান করে। বাধাদানকারীদের পক্ষে একজনের উপর প্রাধান্য অর্পিত হয়। তার নাম 'মোইল্লা'। তার দলের প্রত্যেকের জন্য মাটিতে সমান্তরাল ভাবে এক একটি রেখা অঙ্কিত থাকে। তারা স্ব স্ব রেখায় দাঁড়িয়ে অপর দলের যাকে পাওয়া যায়, বাধা দিতে প্রস্তুত হলে 'মোইল্লা' বিপক্ষ দলকে আহ্বান করে 'পোর' বা পড়। তাদেরকে পালাতে এই রেখাগুলিতে অবস্থানরত বাধাদানকারী ও 'মোইল্লা'র হাত হতে নিরাপদে অতিক্রম করে যেতে হয়। যদি কেউ পালাবার সময় তার বাধাদানকারী স্পর্শ করতে পারে, অথবা 'মোইল্লা' রেখাগুলির দুই পাশ এবং মধ্য

www.pathagar.com

দিয়ে পরিভ্রমণকালে যদি বিরুদ্ধদলের কাউকেও স্পর্শ করতে পারে তবে পলায়নকারী দল পরাজিত হয়। অন্যথা কোনরূপে এই সমস্ত বাধাবিঘ্নগুলি অতিক্রম করে দলের একজনও যদি এই রেখাগুলি পার হতে পারে এবং পুনঃ প্রত্যাবর্তন করতে পারে, তবে তাদেরই জয়লাভ হয়। পরের বার খেলতে গেলে পরাজিত দলের উপর বাধা প্রদান করার ভার পরে।

১০. ঘিলা হারা

ঘিলা হচ্ছে চাকতির মত এক রকম লতার বীজ। চাকমাদের বিভিন্ন রকম খেলা প্রচলিত আছে। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা সারাদিন এই খেলায় ব্যস্ত থাকে। বয়স্ক পুরুষ নারীদের মধ্যেও খেলার প্রচলনা আছে। গ্রামাঞ্চলে সাধরণত বিঝু বা অন্য কোন বড় ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে এখনো এসবের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এসব ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়াকে টিকিয়ে রাখতে জেলা শহরেও বিঝু উৎসবের সময় এ ধরনের প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য কর্মসূচি পালন করা হয়।

ঘিলা হারা (ঘিলা খেলা)

১১. নাদেঙ হারা

হাতে তৈরি এক ধরনের লাটিম হল 'নাদেঙ'। ছেলেরাই এই খেলা খেলে বেশি। এছাড়াও ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা প্রচলিত আছে, যেমন– দলা হারা, চার ভাঙা হারা, হাত্তোল পাগানা হারা, মালা হারা, বাঘ হারা, পাগলি না ছাগলি হারা, গুগরো ঘু কুগুর' ঘু হারা।

কিশোর-কিশোরীদের রয়েছে– বদাবদি হারা, মুলকুগু হারা, কেইম হারা, পেইক হারা, পাশা হারা, শামুক হারা, ডাং হারা।

www.pathagar.com

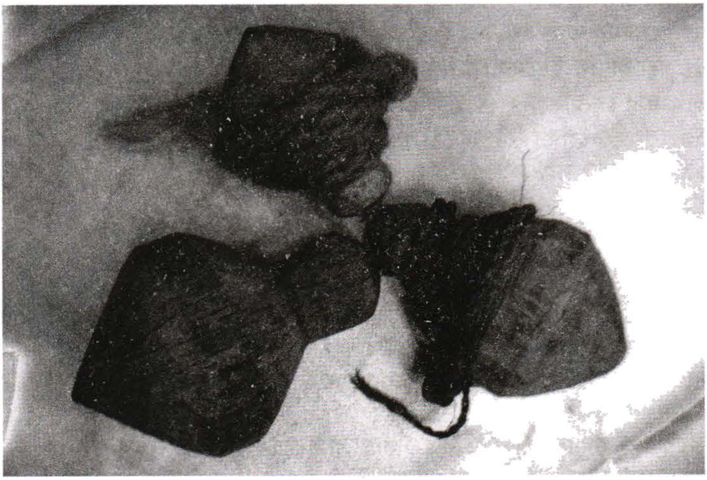

নাদেঙ

বাঁশ খরম বা রণ পা

পাংখোয়াদের লোক ক্রীড়া

পাংখোয়াদের মধ্যে বেশ কটি লোক ক্রীড়া প্রচলিত। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

১. পইকা (ঘিলার খেলা)
২. সাইলেব্ (কাঠি খেলা)
৩. খেবদার (বাশের বন্দুক)
৪. কাদেক (ফটাসি)
৫. লামথির/সির (লাঠিম, ঘিলা দিয়ে তৈরি)
৬. কালচেক (বাঁশ দিয়ে হাটা)

www.pathagar.com

৭. সোয়ান ভাল্ ইন কাই (বেতের রিং খেলা)
৮. বুজোয়াল ইনমের (বাঁশ ঘুরানো)
৯. দার খোয়াং লাক (বড় ঘণ্টা দাঁত দিয়ে তোলা)
১০. সুং ইন পের (হাই জাম্প)
১১. সার তাং সাই লাক (গুই সাপ চাল তোলা)
১২. কর সাই লাক (বাঙালি চাল তোলা/বুকা)

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলাদেশের আদিবাসী : এথনোগ্রাফিয় গবেষণা, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ৬২ প্রবাল হাউজিং, রিংরোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, গবেষণা ও সম্পাদনা : মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খবশী, পল্লক চাকমা, মংসিংঞো মারামা ও হেলেনা বাবলি তালাং
২. বিপ্লব চাকামাম নির্বাহী পরিচালক, টংগ্যা, রাঙ্গামাটি
৩. হৃদয় রঞ্জন চাকমা, বন্দুকভাঙা, রাঙ্গামাটি
৪. পূণ্য ধন চাকমা, কৃষক, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি
৫. চন্দ্র জয় চাকমা, কৃষক ভূষণছড়া, বরকল, রাঙ্গামাটি
৬. তিলক্যা চাকমা, কৃষক জীপতলী, রাঙ্গামাটি

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

১. ছুতার

রাঙ্গামাটি পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসী ছুতারদের (মিস্ত্রি) কাঠের কাজ করার দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে। তারা কাঠের নানা রকম কাজ করে থাকে। নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকে শুরু করে নৌকা, কাঠের বোট ও ঘরবাড়ি ইত্যাদি। অনেক আদিবাসী এখন জীবন জীবিকার তাগিদে এ পেশার সাথে যুক্ত।

২. তাঁতি (বেইন বা কোমর তাঁত)

উপমহাদেশীয় সংস্কৃতিতে বোডো এবং তিব্বতী-বর্মী মানবগোষ্ঠীর বিরাট অবদান এই কোমর তাঁত। গৌরবের বিষয় পার্বত্য এলাকার মেয়েরা সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে পেরেছে। 'আলাম' 'খাদি' ও 'পিনন' বুননে বিচিত্র নক্‌শার সমাহার লক্ষ করা যায়। বয়ন প্রণালী এক হলেও প্রতিটি জাতিসত্তার নক্‌শা ভিন্ন। এ অঞ্চলে অনেকে কোমর তাঁতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তারা তাদের পেশা ধরে রেখেছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

বেইন বা কোমর তাঁত

www.pathagar.com

৩. জেলে

১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে রাঙ্গামাটি পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসীদের একটা বিরাট অংশ উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। জুম ও জমি চাষের সাথে যুক্ত অনেকে নানা পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পেশাগত জীবনে আসে নানা পরিবর্তন। কৃত্রিম কাপ্তাই হ্রদের সাথে মানিয়ে নিতে এখানকার আদিবাসীদের অনেক সময় লেগে যায়। ধীরে ধীরে হ্রদে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীবন জীবিকার তাগিদে অনেকে মাছ ধরার পেশার সাথে জড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে কাপ্তাই হ্রদে রাঙ্গামাটি সদর এর মগবান, জীপতলী, বালুখালি, বন্দুকভাঙা, মরিচ্যাবিল ছাড়াও বরকল, লংগদু, জুরাছড়ি, বিলাইছড়িতে এ ধরনের আদিবাসী জেলে সম্প্রদায়ের দেখা মেলে।

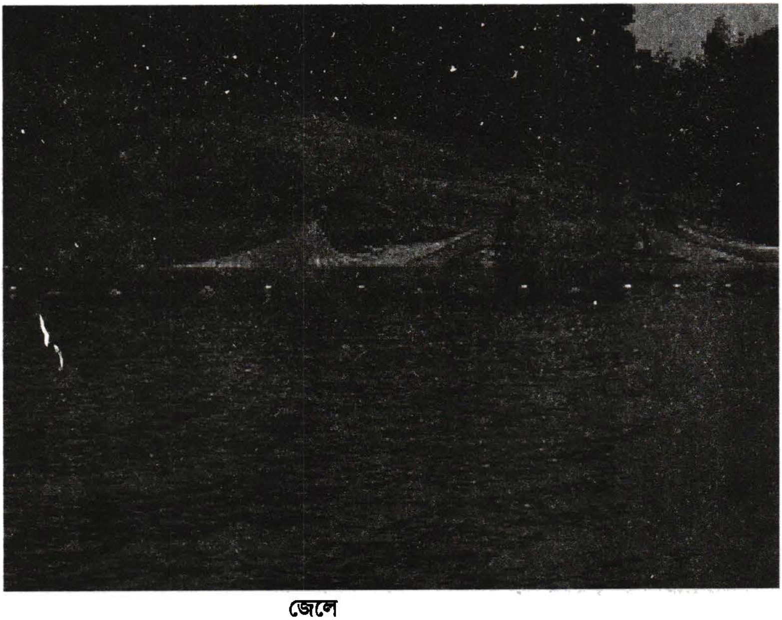

জেলে

তথ্যনির্দেশ

১. সুকোমল চাকমা, কাঠ মিস্ত্রী, খারিক্ষ্যং, রাঙ্গামাটি
২. গোলাক চন্দ্র চাকমা, বন্দুকভাঙা, রাঙ্গামাটি
৩. জন্মজয় চাকমা, জেলে, শুভলং, রাঙ্গামাটি
৪. পূর্ণ শোভা চাকমা, গৃহিণী, মিদিঙ্গছিড়ি, বরকল, রাঙ্গামাটি
৫. ভাগ্য লক্ষ্মী চাকমা, গৃহিণী, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

১. কাটা ঘায়– 'রাঙা মোছা মা' গাছের শিকড় অথবা 'বাঁশ কাপুর' সহযোগে তৈরি পাতা বেটে লাগাতে হয়।
২. পোড়া ঘায় - সাপের তেল দিলে শীঘ্র সারে।
৩. নালী ঘায় - গোরসুনের পাতা পুড়ে ঘায়ের মুখে দিলে নালী ভরে আসে।
৪. দ্রদ্রুতে - 'দন্তলং পাতা', কেরোসিন তেল, লবণ ও ঝুল মিশিয়ে আগুনে সেঁকে মালিশ করলে যায়।
৫. কেশ ফোঁড়া - 'রেইশাক' অথবা 'হরিণ কান শাক' বেটে প্রলেপ দিলে উপশম হয়।
৬. বিষ ফোঁড়ায় - 'হরিণ কান শাক', 'বিছুটি পাতা' এবং 'ডলুপান' বেটে প্রলেপ দিলে উপশম হয়।
৭. পাঁচড়া ফোঁড়া- 'ফুল শোয়ানি' গাছের বাকল, 'নিমের পাতা' এবং 'ভাট পাতা'র সিদ্ধজল দিয়ে ধুয়ে ফেললে শীঘ্র সেরে যায়।
৮. বাত ফোঁড়ায়- 'বিছুটি পাতা' ও 'ডলুপান' অথবা 'রাঙা মুছ্যানি পাতা' এবং 'কাবাক্যা লতা' বেটে লাগালে সেরে যায়।
৯. আঙ্গুল হারায়- 'হরিণ কান শাক' পাতা এবং 'ভেরেণ্ডা পাতা' বেটে প্রলেপ দিলে সেরে যায়।
১০. গতিশীল বা অস্থির বাত - 'মোনচত্তা পাতা', 'বিছুটি পাতা', 'ডানের হাত পা', 'গোমতি পাতা' ইত্যাদি বেঁটে সামান্য উত্তপ্ত করে বাতের ফুলায় লেপে দিলে উপশম হয়।
১১. চোখে রক্ত উঠলে। - 'দের লতার' দুই প্রান্ত উত্তমরূপে কেটে নিয়ে পরে তার একপ্রান্ত রক্তবেষ্টিত চোখের উপর ধরে অপরপ্রান্তে ফু দিলে তার মধ্যের রস চোখের উপর পড়ে এতে চোখ পরিস্কার হয়ে যায়, এছাড়াও একজাতীয় শ্বেত প্রস্তর জলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘষে চোখ ধুয়ে ফেললেও আরোগ্য লাভ হয়।
১২. শির পীড়ায় - পাতি লেবুর শিকড় তার রসে পিসে কপালে প্রলেপ দিলে সেরে যায়।
১৩. মাথা ধরায় - বাটা সরিষা একখণ্ড ন্যাকড়া দিয়ে মাথায় বেঁধে রাখলেই কমে যায়।
১৪. একশিরা- 'হাজগাছ' ও 'কোনই গাছের' শিকড় বেটে প্রলেপ দিলে সেরে যায়।

www.pathagar.com

১৫. কেশ উঠা- 'ধোপচুয়াঁ ফুল' গাছের শিকড় বাটা জল মাখলে নিবারণ হয়।

১৬. সান্নিপাতিকে- 'বারেঙ্গ্যা লতা'র রস স্ফীত স্থানে লাগালে সারে, অথবা 'তেলসর গাছ', 'বাদরঁসার গাছ' ও অশ্বত্থ গাছের বাকল সিদ্ধজলে মুখ ধুলে এবং তৎসমুদয় বেটে বর্হিভাগে প্রলেপ দিলে সান্নিপাতিক দূর হয়।

১৭. হাত পা ভাঙলে- 'হাড়ভাঙ্গা লতা'র পাতা বেটে সামন্য উত্তপ্ত করে আহত স্থানে লাগালে শীঘ্র সারে।

১৮. কান পাকা- 'আদা গুনগুনি' (মন্ডুরী) ও 'জোতানির্ব্বিশ' পাতার রস অথবা পাটি পাতার রস দিলে আরোগ্য হয়।

১৯. পাগলা কুকুরে কামড়ালে- ক্ষত স্থানে 'মদের মুলী' বেটে দিলে ভাল হয়।

২০. কফ বৃদ্ধি রোগ- সমান ওজনের তিত পটলের দানা, আপাং ও সাপের পিত্ত পিসে খাওয়ালে কমে যায়।

২১. কাশ রোগে- 'চেরদিবা' পাতার রস কিঞ্চিত উত্তপ্ত করে খাওয়ালে নিরাময় হয়।

২২. বুক বেদনায়- 'সিগিরাসিক' ও 'তেজবহল' পাতা বা 'ডাট্‌রাঙা' গাছ কেটে প্রলেপ দিলে সারে।

২৩. 'শুকর পীড়া' অর্থাৎ গলা ও গন্ডস্থল ফুলিয়া গেলে- শুকরের দাঁত ঘষে বর্হিভাগে প্রলেপ দিলে সারে।

২৪. পেট ফাপিলে- খুব কড়া মদ পানেই সেরে যায়।

২৫. কোষ্ট কাঠিন্যে- কচি পেয়ারা পাতা খেলেই কোষ্টকাঠিন্য সেরে যায়।

২৬. আমাশয়ে-'দের্ লতার' কচি পাতা লবণ দিয়ে খেয়ে আরোগ্য লাভ হয়।

২৭. প্রদর- শ্বেতবর্ণের হলে 'সাদা ভাইট' রক্ত বর্ণের হলে 'রাঙা ভাইট' ফুল গাছের শিকড় বেটে সর্বাঙ্গে বেটে মালিস এবং তার রস পান করালে আরোগ্য লাভ হয়।

২৮. সাধারণ জ্বরে- 'বুলপত্তি শাক' গরম করে তার রস সামান্য লবণ সহযোগে পান করালে আরোগ্য লাভ হয়।

২৯. 'নোয়াবিছ' বা অবিরাম জ্বর বিশেষে - 'ক্ষংমারেস', 'কাটামারিস' ও 'বর্জিয়াল লতা'র রসে গন্ডারশৃঙ্গ ঘষে তাতে একখণ্ড উত্তপ্ত লোহা ডুবাইয়া তা পান করলে আরোগ্য লাভ হয়।

খ. তন্ত্রমন্ত্র

তন্ত্রশাস্ত্র গভীর গুহ্যবস্তু। ওঝা ও বদ্যিরা চাকমা লিপিতে মন্ত্রগুলো লিখে রাখেন এবং শিষ্যকে ছাড়া কাউকে শিখানো বা হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ।

তন্ত্রশাস্ত্রের গোঁড়াতে আসে দেহতত্ত্বের কথা। দেহে আছে বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি, দেহকে জানতে হলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হয়। শরীরে আছে কিছু বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু। মন্ত্র জপ করে বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে সেই বিন্দুতে মোক্ষম চাপ দিয়ে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। তান্ত্রিক চিকিৎসার মূল কথা এই কেন্দ্রবিন্দু এবং বীজমন্ত্র।

www.pathagar.com

তালপাতায় বা তাবিজের ভিতর মন্ত্র লিখে বা বিশেষ নকশা বা 'আঙ' গলায় বা হাতে মাদুলি ধারণ করলে ইপ্সিত ফল পাওয়া যায়। ভূত-প্রেত ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গা-রক্ষা তাবিজ আছে।

ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের মত– মারণ, মোহন, বশীকরণ, স্তম্ভন ইত্যাদির জন্য বিবিধ মন্ত্র আছে। অবাধ্য স্ত্রীকে বশ করা, ইপ্সিত তরুণীকে আয়ত্তে আনা, শত্রুকে মোহিত করা, বাণ মারা ইত্যাদি তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। পীত্যাফকির একজন প্রসিদ্ধ তন্ত্রসাধক। বশীকরণে সিদ্ধ এই ফকির হ্যামিলনের বাঁশি ওয়ালার মত গ্রামশুদ্ধ লোককে তাঁর পিছু পিছু নিয়ে যেতে পারতেন।

'তুম্বুরু' খেলা হল দুই ধুস্তদের তান্ত্রিক যুদ্ধ। অতীতে অনেক তান্ত্রিক মৃত্যুর পর 'জোম্বি' বা জিন্দালাশ হয়ে পড়েছিলেন। সুর্যাস্তের পর লাশ জ্যান্ত হয়ে উঠত। এটাকে বলা হয় 'ফু-বিদ্যা'; যার সঠিক অর্থ হতে পারে ভাম্পায়ার।

তাল্লিক শাস্ত্র হল চিকিৎসা বিষয়ক বিধান। পশারী ঔষধ ও গাছ-ছাড়ার শিকড়, বাকল ও পাতার রস দিয়ে বিভিন্ন রোগের ব্যবস্থাপত্রের দেওয়া হয়।

তন্ত্র-মন্ত্র-ঝাঁড়-ফুঁক ইত্যাদি একটি আদিম বিশ্বাস। বৈদ্য বা গুণীনরা এই সব প্রয়োগ করে রোগের চিকিৎসা করে থাকেন। এককালে চাকমা সমাজে এই চিকিৎসা প্রণালী বহুল প্রচলিত ছিল। আধুনিক শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে এই বিশ্বাস অনেকটা শিথিল হচ্ছে। লোকে এখন বিজ্ঞান সম্মত এলোপ্যাথিক চিকিৎসার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তবুও পল্লি এলাকায় এখনও এর ব্যাপক প্রচলন আছে। বৈদ্য বা গুণীনরা তন্ত্র চর্চা করেন। চাকমা লিপিতে হাতে লেখা অনেক বই-পত্র তান্ত্রিকেরা সযত্নে গোপনে রক্ষা করেন। এইসব পুস্তকের অনুলিপিও পাওয়া দুস্কর। সাধারণতঃ শিষ্যকে ছাড়া কোন তান্ত্রিক এই বিদ্যা হাত ছাড়া করেন না। কাজেই গবেষকদের জন্য এই বই পাওয়া দুরূহ।

মন্ত্রের ভাষা পড়ে মনে হয়, এই মন্ত্রগুলোর উৎস লোকায়ত সংস্কৃতি। ঐতিহাসিক কালাকালে চাকমারা যেখানে গেছে বা যেখানে অবস্থান করেছে সেই পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকে এই মন্ত্রগুলো আহরিত হয়েছে। তাই মন্ত্রের ভাষা কোথাও দুর্বোধ্য আরাকানি, কোথাও বা তন্ত্র শাস্ত্রের সংস্কৃত ঘেঁষা ওঙকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ। কোথাও জীন-দলন সোলায়মান বাদশা বা আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে মন্ত্রের সমাপ্তি টানা হয়। শ্রীরামচন্দ্র, কালি, চণ্ডী ইত্যাদি নামও মিলে এইসব মন্ত্রে। আবার বিকৃত পালি স্তবকও পাওয়া যায় কোন কোন মন্ত্রে। দু'একটা উদাহরণ দেওয়া যাক–

১. উং মন বানং (বান্ধম্) দিল বানং বায়ু বানং ঠিক। যদি মন লরে (নড়ে), সংসার লরে, ইচ্চর (ঈশ্বর) মহাদেবর (মহাদেব) জদা (জটা) ছিনি (ছিঁড়ে) ভূমিত পড়ে।

২. য়া জিপ জিব্রেল, বারতত মাইল, তং কাবিল। আজ্রেল জা। নিব্রেল জা। জা ফিরি জা, জঙলে জা। জঙল দলি জা, ধরি খা।

৩. উং হুং ওয়েং ওয়েং। ওয়ে না ধাত্তং স্রাং পাং। ওয়েন তালি দেওতা সুহা।

www.pathagar.com

৪. সাত ঠাকুরের মন্ত্র-উং নামসাতু-বিসাসিল-ফালভাই-তু আনক্‌ক -
ব্যানক্‌ক-মানুসানেংহা-তি-স্র-সুগতঃ লগব-তু আনুচতারু পুরিস
তাইমাস্রাতি-সাত-তে-দেবা মানুসানেং-বুত্ত-পাকাওয়াতি- ০০০

আসলে এটা পালি নম তস্‌স বিজ্জা্-চরণ যেন ভগবান মানুস্‌সানং তি সরনং সুগত লোকবিদু অনুত্তর পুরিস ধম্ম সারথি সত্থাদেবা মানুস্‌স্মানাং বুদ্ধ ভগবাতি- ০০০

উপর্যুক্ত মন্ত্র চারটির প্রথমটিতে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। ঈশ্বর মহাদেবের দোহাই দিয়ে মন্ত্রের বাঁধুনি জোরালো করা হয়েছে। দ্বিতীয় মন্ত্রটি স্পষ্টতই মুসলমানী মন্ত্র। জিব্রাইল এর দোহাই আছে এতে। তৃতীয় মন্ত্র নিঃসন্দেহে আরাকানি। চতুর্থ মন্ত্রটিকে বলা হয়– সাত ঠাকুরের নাম। পালিতে রচিত বুদ্ধ বন্দনাকে কাল পরম্পরায় বিকৃত করে মন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে।

হঠযোগ সাধনের বিভিন্ন প্রকরণ ও দর্শন বৌদ্ধতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট হয়। পরে তান্ত্রিক বৌদ্ধবাদের অন্তিম সময়ে, এই সব মন্ত্র চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক সমাজে প্রচলিত হয়। আরো পরে আউল-বাউল ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুসারীরা এই তন্ত্র ও দর্শন চর্চায় মনোযোগী হয়। এদের কাছ থেকে খুব সম্ভব চাকমারা এই মন্ত্র প্রকরণ হস্তগত করে।

ভারতীয় তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত ছয়টি অঙ্গ-মারণ, মোহন, বশীকরণ, উচাটন, স্তম্ভন এবং ভিন্নদেহী রূপধারণ ইত্যাদি প্রকরণ চাকমা তন্ত্রেও আছে।

শত্রুকে নিধন বা হেনস্তা করার জন্য আছে মারণ বা চালান মন্ত্র। এর মধ্যে 'ইমিলিক চালান' সুবিদিত। এই চালান প্রয়োগে শত্রু মরে না, তবে অশেষ ভোগান্তি ডেকে আনে। ঘরের চালে ঢিল পড়া, ভাতের থালায় কেঁচোর মাটি পড়া ইত্যাদি।

'বাঁশ-মরলায়' ব্যবহৃত হয়, দু'হাত প্রসারিত সমান একটি লম্বা বাঁশ। মন্ত্রপূত এই বাঁশ-লম্বা বা ছোট হয় ঈষৎ প্রশ্নোত্তর পর্বের সঙ্গে সঙ্গে। এতে জানা যায় রোগের হেতু এবং তার চিকিৎসা।

'কুলা দাপন' ও একটি চমকপ্রদ ব্যবস্থা। 'দাপন' কথাটি হয়ত 'দর্পন' শব্দের বিকৃত রূপ। গোল কুলায় একটি কাঁচি বা বাঁশের কঞ্চি পরিয়ে দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুলে রেখে ঝুলানো হয় এবং যুগপৎ মন্ত্র পাঠ চলে। কুলাটা একদিকে ঘুরে যায়। ফলে জানা যায় রোগের কারণ ও চিকিৎসা।

অতীতে এটাও বিশ্বাস করা হত, কোন কোন তন্ত্র সিদ্ধ বৈদ্যরা মরেও মরতেন না। 'ফু' নামক এক অতি-লৌকিক বিদ্যার অধিকারী ছিলেন তারা। মৃত্যুর পরেও সন্ধ্যার পর জীবিত হয়ে উঠতেন তারা অনেকটা 'জোম্বি' বা জিন্দালাশের মত। সারারাত দাপিয়ে ঘুরে ফিরে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে ভোর রাতে আবার মৃতবৎ পড়ে থাকত এই জিন্দালাশ। আবার রাত হলে বিপদ। এজন্য এই বৈদ্য মারা গেলে সন্ধ্যার আগেই তাকে দাহ করতে হয়। অথবা তার কোন সাহসী শিষ্য গরম লোহার একটা শিক নিয়ে তৈরি থাকে। সন্ধ্যার পর লাশ জীবিত হওয়ার সময় ব্রহ্মতালু বরাবর এই গনগনে লোহার শিক বিঁধিয়ে দিলে তবে রক্ষা। লাশ আর জীবিত হতে পারবে না। ছায়াছবির সেই ড্রাকুলার কাহিনির মতো।

www.pathagar.com

মনে করা হয়, কোন কোন ব্যাধির উৎস-অপ বা উপদেব-দেবীর অপদৃষ্টি অথবা রোগীর উপর তাদের আছর বা ভর। প্রধান দেব-দেবী হলেন-গঙা বা গঙ্গা, ভূত এবং দেন বা ডাকিনী। আরো আছেন- আহ্ত্যা, বিয়াত্রা, মোত্যা, মগনী বা মোহিনী, কাইনী বা কাকিনী, যোগিনী, বর শিল, বত কঙরি, জুর কঙরি, শিব-কঙরি, বিনি কঙরি, ফুল কঙরি, ভলু কঙরি। থান হচ্ছে গ্রাম রক্ষাকারী দেবতা। পরমেশ্বরী গৃহ-সংসারের উন্নয়ন ও স্থিতি প্রদায়িনী দেবী। সন্ধ্যার সময় শিশুরা যে অবিশ্রাম কাঁদে, ধারণা করা হয় 'সিজি' নামক অপদেবতায় তাদের উপর ভর করে। এছাড়া আছে আরো নারিঙ্যা, মাংসা ইত্যাদি অপদেবতা।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে তীর ধনু অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার হয়। তাই তান্ত্রিক শাস্ত্রে 'বাণ-মারা' কথাটি বহুল প্রচলিত। কিন্তু চাকমারা ধনুকে তীর ব্যবহার করে না। ধনুকে মাটির পাকানো শুকনো 'গুলি' ব্যবহার হয়। তাই অপদেব-দেবীরা এক্ষেত্রে বান মারে না। মারে-গুলি। তালিকে বিবিধ উপ দেব-দেবীর হরেক রকম 'গুলির' বর্ণনা পাওয়া যাবে।

অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার দু'টি উপায়। তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়-মন্ত্রপাঠ, তাবিজ কবচ দিয়ে তাকে ভয় পাইয়ে দিতে হবে। তবে রোগী আছর বা ভর মুক্ত হবে। অথবা, স্তুতি, পূজা-অর্চনা করে তাকে খুশি করতে হবে। এজন্য যার যা প্রাপ্য শূকর, ছাগল, মোরগ, হাঁস বা কবুতর-বলিও উৎসর্গ করলে তবে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

তান্ত্রিক প্রকরণে আরো আছে 'আং'-বিচিত্র সব এক একটা নক্শা যার ছক কাটা ঘরে লেখা থাকে বীজ মন্ত্র। এই নক্শা ও বীজ মন্ত্র কাগজে, তালপাতায়, ভূর্জপত্রে লিখে তাবিজের ভিতর পুরে গায়ে ধারণ করতে হয়- তাবিজ কবচ হিসাবে। কোনটা বা মাটির সরায় অথবা নূতন হাঁড়িতে লিখে অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য মাটিতে পুঁতে দিতে হয়। তন্ত্রোক্ত মারণ-মোহন-বশীকরণ-উচাটন-স্তম্ভন-সর্বক্ষেত্রে এই আং গুলো ব্যবহৃত হয়।

ঝাড়-ফুঁক-টিপ-মালিশ

চাকমা বৈদ্যরা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বিদ্যা বা শরীর বিদ্যার উপর নির্ভরশীল নন। তাদের শারীরিক ও নাড়ির জ্ঞান হল-দেহতত্ত্ব। শরীরটা হল-বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি। তামাম দুনিয়ায় যা আছে-শরীরের ভিতর বসতি করে আছেও তাই। এক কথায় বিশ্বরূপ। এসব তত্ত্ব তারা ভারতীয় যোগশাস্ত্র থেকে বৌদ্ধ তন্ত্রের মাধ্যমে পেয়ে থাকবেন। এসব বিষয়ে কোন সুলিখিত পুস্তক বা সুচিন্তিত কোন ধারণা নেই। গুরুর কাছ থেকে শিষ্য পরম্পরা এইসব ধারণার প্রচলন রয়েছে সুদীর্ঘকাল।

চাকমা লিপিতে লিখিত একটা বই পাওয়া যায়-অস্থিমালি নিদান। অস্থিমালি হলে-হিন্দুদের পুরাণোক্ত দেবতা শিব। পৃথিবীর যাবতীয় গুহ্য তত্ত্ব শিবের মুখ থেকে নিসৃত। রোগ ও দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা শিব গোপনে তার সহধর্মিনী গৌরীকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, সেই বয়ান বর্ণিত হয়েছে এই পুঁথি অস্থিমালি নিদানে। পয়ার, ত্রিপদি ও লাচারি ছন্দে বইটি বিরচিত। বইটি কোন বাঙালি ভিষক রচনা করেছিলেন না কোন চাকমা বৈদ্য কর্তৃক বিরচিত তা জানা যায় না। বইটির কিছু অংশ বর্ণনা করা গেল।

www.pathagar.com

পুঁথি ভাষা কিঞ্চিৎ মাজা ঘষা করে বাংলা ভাষী পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

একদিন ইন্দ্রপুরে হর-গৌরী বসি,
কহেন শাস্ত্রের কথা জোর হস্তে বসি।
গৌরী পুন জিজ্ঞাসিল শিবের চরণ,
ব্যাধি হতে মরে লোক কিসের কারণ।
ইহার ঔষধ তুমি করহ প্রকাশ,
ব্যাধি হতে বহু লোক হইল বিনাশ।

এই গুহ্যতত্ত্ব যেহেতু সর্ব সমক্ষে বলা যাবে না, তাই রাতা নামক রাজ্যে গিয়ে এক টংগির উপর বসে নির্জনে শিব গৌরীকে গোপন শাস্ত্রের কথা বলতে লাগলেন।

এদিকে দুরঘনাথ কৈলাসে সমস্ত অবগত হলেন এবং
তথা হইতে দুরঘনাথ আসন তুলিল।
টংগির উপরে দুরঘ উপনীত হইল।
আপন ঝোলার মধ্যে তালপত্র ছিল
মুখের অমৃত দিয়া লিখিতে লাগিল।

দুরঘনাথ কে ছিলেন, কোন পুরানাদি শাস্ত্রে তার উল্লেখ নাই। সম্ভবত গোরখনাথ, মীননাথ জাতীয় কোন সিদ্ধাচার্য হবেন।

ভাঙের নেশায় বিভোর শিব ব্যাধিসহ উৎপত্তি ও প্রতিকার এবং দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে গৌরীকে আদ্যপান্ত ব্যক্ত করলেন।. দুরঘনাথ সমুদয় বক্তব্য তালপত্রে লিপিবদ্ধ করলেন।

পরে শিব যখন জানতে পারলেন-দুরঘনাথ সব জেনে গেছেন, তখন স্বয়ং কৈলাসে গিয়ে দুরঘনাথকে চেপে ধরলেন। দুরঘনাথ উপায় না দেখে শিবের পা জড়িয়ে ক্ষমা চাইলেন। কথা দিলেন সমুদয় গুপ্ত রহস্য তিনি কোথাও প্রকাশ করবেন না।

একদিন দুরঘনাথ ঝোলাটা তীরে রেখে নদীতে নামলেন। সেই পথে আসছিলেন ধন্বন্তরী। দেখেন এক ঝোলা পড়ে আছে। তার ভিতর পাওয়া গেল তালপত্রের লিখন যাবতীয় গুহ্যতত্ত্ব। আশেপাশের কেউ নেই। তিনি সেটা নিয়ে গেলেন। ধন্বন্তরী হলেন-দেবতাদের চিকিৎসক। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরানে আছে-সমুদ্র মন্থনের সময় তিনি উঠে আসেন। শংকর বা শিব ও গরুড়ের নিকট তিনি শিক্ষা পান। ভাস্করের নিকট তিনি শিখেন আয়ুর্বেদ।

এবার ধন্বন্তরী শিবের কাছে স্তুতি করে বললেন–
কহ বাবু পৃথিবীতে কোথা রোগ আর।
সেই সব কও কথা গোচরে আমার।
শিব বললেন–
তিন রোগ, তিন সুহৃদ আর তিন নাড়ি।
এই সকল তিনে প্রভু সংযোগ যে করি।
তিন রোগ হল-'সান্নিক', 'তাকগৈ' এবং জ্বর।

www.pathagar.com

তিন সুহৃদ হল-বাত, বায়ূ, পিত্ত।
তিন নাড়ি হল-ইংগিলা, পিংগলা, সুযুন্মা।

সান্নিক রোগে জ্বর হয়। আর হয় শিরঃপীড়া। বাত আর কফের অন্ত থাকে না। শরীরে আলস্য আসে, গায়ে বল থাকে না, নাড়ি দ্রুত হয়। জলের আকারে ঘন ঘন প্রস্রাব হয়।

'তাকগৈ'- শারীরিক বৈকল্যের প্রধান কারণ, এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা পুঁথিতে নেই।

জ্বর সম্বন্ধে এই নিদানে লিখেছেন–
জ্বরের সমান রোগ নাই জগত পর।
জ্বরের তাপেতে জান দেখে যম ঘর।
কাঠের উপরে জান অগ্নি বলবান।
তথাপি না হয় জান জ্বরের সমান।

জ্বর সম্বন্ধে আরো আছে-প্রত্যুষে জ্বর হলে, সেটা সান্নিক জ্বর। এক প্রহরে জ্বর হলে সেটা স্যনপ্ধ্য জ্বর। তিন প্রহরে জ্বর হলে- পচা জ্বর। সন্ধ্যাকালে জ্বর আসে, সারারাত থাকে, গা জ্বলে, রোগী গায়ে কাপড় রাখে না। নিশিতে যদি পুনরায় জ্বর বাড়ে তবে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। রোগী যদি বেঁচে যায় এবং সকালেও জ্বর থাকে ও দিনে এক প্রহরে জ্বর আবার বাড়ে তবে রোগীর আর উদ্ধার নাই।

'অথ জ্বর উৎপন্ন' ভাগে শিব আরো বললেন–
আশ্বিন-কার্তিক জান আর যে অঘ্রান।
এই তিন মাসে ব্যাধি হয় যে উৎপন ॥
পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন-এই তিন মাস।
এই তিন মাসে ব্যাধি বায়ূতে প্রকাশ ॥
চৈত্র, বৈশাখ জান জ্যোষ্ঠে পুরণ।
এই তিন মাসে ব্যাধি 'হাতাসে' সৃজন ॥
আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র এই তিন রিত্।
জলেতে সঞ্চারে ব্যাধি কইলাম কিঞ্চিত ॥

বাত-বায়ূ-পিত্ত সম্বন্ধে নিদানের ভাষ্য-বাত হল বাঘের মতন, পিত্ত পিশাচ আর বায়ু বায়ান্ন কোটি। বাত স্থানে স্থানে ও শরীরের ধারে ধারে থাকে। বায়ু চলে রক্তের সঙ্গে আর পিত্ত চলে নাড়ির ভিতর দিয়ে। সান্নিকের সঙ্গে বাতের, বায়ুর সঙ্গে জ্বরের, এবং 'তাকগৈ' এর সঙ্গে পিত্ত গভীর সম্বন্ধযুক্ত। একে অপরের বন্ধু-সাহায্যকারী।

নাড়ি প্রকরণে শিব প্রকাশ করছেন–
বাহাত্তর হাজার নাড়ি শরীরের পর।
লহরে আছয়ে জান ঐ সপ্ত সায়র।
এই নাড়ি মধ্যে জান দশ নাড়ি সার,
বৈদ্যগনে ভিন্ন করি তিন নাড়ি করিল প্রচার।
ইংগিলা পিংগিলা নাড়ি সুযুম্মা যে হয়।
বুকে পিঠে তিন রগে খিঁচিয়ে আছয়।

www.pathagar.com

রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপত্র নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে হলে নাড়ি ভেদ অত্যাবশ্যক। নাড়ি ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান সমতুল্য। এরপর সদাশয় শিব-ধাতু কৃচ্ছতা রোগ, বাল্যধাতু বয়ান, সূতিকা ব্যাধির উৎপত্তি ইত্যদি বিষয়ে ধন্বন্তরীকে উপদেশ দিলেন। সর্বশেষে বার্ধক্য প্রসঙ্গে বললেন—

বৃদ্ধ রোগ যদি পায় যাইবারে নাহি চায়,
দেহেতে বসতি শনি।
ভাংগা ঘর পুরান ছানি ঘুনে খাইল যে থনি,
বৃদ্ধ রোগ জানিও তেমনি।
বৃদ্ধকালে রক্ত পানি রোগে করে পেরেশানি,
না থাকে গায়েতে বল,
তার অঙ্গে দিলে দারু (ঔষধ) নাই তার গুনামেরু
ঔষধের না হইব ফল।
অনতাই পনতাই নাড়ি থাকে যে ধাই ধাই করি,
চলে যেতে চায় বার বার।
তাহার কাছে যে যায়, তাহারে নিরক্ষিয়া চায়,
বাত বায়ূ পিত্ত সাননিক আর।
নানান ব্যাধি বৃদ্ধের কাছে যেমন রাহু চন্দ্র গ্রাসে,
বৃদ্ধ রোগ নাই কোন উপায়,
ভাংগা ঘর যেবা তুনে, অতি দুঃখ লাগে মনে,
বৃদ্ধ নায়ে অগ্নি জ্বলে হয়।

পুঁথির আকারে চাকমা লিপিতে লেখা এই বইখানি বৈদ্যদের কাছে খুব সমাদৃত। মাধব কর সংস্কৃত ভাষায় নিদান নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অস্থিমালা নিদান সেই গ্রন্থ অনুসারে বাংলায় রচিত কিনা জানা যায় না।

যোগশাস্ত্রের মত চাকমা বৈদ্যরাও বিশ্বাস করেন মানবদেহে শক্তির আধার ছয়টি চক্র আছে। সবার নিচে গৃহ্যদেশে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছে ঘুমিয়ে। তান্ত্রিক সাধনার মাধ্যমে তাকে সঞ্জীবিত করতে পারলে যোগবল করায়ত্ত হয়।

শরীরে আরো আছে বায়াত্তর হাজার নাড়ি। তন্মধ্যে ইংগিলা, পিংগিলা ও সুষুম্মা প্রধান। নাড়িগুলোকে চিনতে হবে। বুঝতে হবে কখন কোন নাড়ি কি অবস্থায় আছে। কোন বৈকল্য হলে টিপ-মালিশ-ঝাড়-ফুঁক দিয়ে স্বাভাবিক করা যায়।

শরীরে আছে বিভিন্ন সংবেদনশীল কেন্দ্র। ললাটে, চিবুকে, কণ্ঠদেশে, বুকের নরম অস্থির সন্ধিস্থলে, নাভিতে ও উর্ধপিঠে আছে গুপ্ত দরজা। বিশেষ বিশেষ ব্যাধিতে তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই সব স্থানে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে টিপ দিতে হয়। মালিশ করতে হয় বিশেষ প্রক্রিয়ায়। তবে দেহ-বৈকল্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

www.pathagar.com

তালিক

তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ-কবচ, ঝাড়-ফুঁক, টিপ-মালিশ এবং অপ-উপদেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা ও বলি-এসব কিছুকে যদি অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়ে বাতিল করা যায়, তবুও তালিক বা চাকমা ফার্মাকোপিয়াকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তালিক কথাটি উচ্চারণগত শুদ্ধভাবে লিখতে গেলে হওয়া উচিত তাহ্লিক বা তাহ্লিক। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরূপণ করা দুষ্কর। হয়ত আরাকানী কোন অপভ্রংশ হয়ে থাকবে।

তালিক হচ্ছে রোগের বিবরণ ও লক্ষণ সম্বলিত এক বা একাধিক রোগের জন্য নির্দিষ্ট ঔষধের তালিকা, ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী এবং সেবন বিধি। মূল যৌগিক ঔষধের সঙ্গে রোগের লক্ষণ জটিলতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অনুপান সহযোগে ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়।

আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেমন ফার্মাকোপিয়া বা ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীতে বিভিন্ন ঔষধের সংযোগাদি করা হয়-তালিক সম্মত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীও তাই। আয়ুর্বেদে যেমন অনুপানাদি প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে লক্ষণ ও রোগ ভেদে-তালিক প্রকরণেও তাই।

আসলে তালিক আয়ুর্বেদের এক রূপান্তরিত রূপ-কাল প্রবাহে যার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে লোকায়তিক ও টোটকা চিকিৎসার বিভিন্ন অনুষঙ্গ। ফলে বহু সংখ্যক তালিক সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রয়োগের মাত্রাও বেড়ে গেছে বিভিন্ন বৈদ্যের হাতে। বলাবাহুল্য এই তালিক চাকমা লিপিতে হাতে লেখা এবং বৈদ্যগণ এগুলো গুরু-শিষ্য বংশপরম্পরা সংরক্ষণ করে থাকেন। সুযোগ হলে এই সঙ্গে অন্য বৈদ্যের আরো তালিক নিজস্ব সংগ্রহে যুক্ত করেন। এই তালিক নিয়ে চাকমা উপজাতীয় সমাজে চিকিৎসা ব্যবস্থা চলে আসছে। তালিকে ব্যবহৃত ঔষধ হলো :

১. পাসারি ঔষধ : এলাচি, দারুচিনি, জায়ফল, লবঙ্গ, রসমানিক্য, রসসিন্দুর, সৈন্ধব লবণ ইত্যাদি প্রচুর ব্যবহার বিধি আছে। পাসারি ঔষধের দোকানে এসব ঔষধ পাওয়া যায়।

২. প্রাণিজ উপাদান : গন্ডারের সিং, নখ, রক্ত, অজগর সাপ, কচ্ছপ ইত্যাদির পিত্ত। বৈদ্যরা নিজেরা সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করেন।

৩. দৈব ও তান্ত্রিক উপাদান : তিন শিকারের গুলি, শশ্মানের খুঁটির কয়লা এই জাতীয় উপাদান।

৪. বনৌষধি : বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা, ফুল, ফল, কাণ্ড, ছাল, শিকর কন্দ ইত্যাদি প্রচুর ব্যবহার হয়। প্রাকৃতিতে যেসব উদ্ভিদ আছে, বলতে গেলে কোনটাই ফেলনা নয়। এই সব ভেষজের উপাদান অনুপান হিসাবেও বহুল ব্যবহার করা হয়।

বিজ্ঞান সম্মত বিচারে এই চিকিৎসা বিধান কতটুকু কার্যকর সেটা বিবেচনা যোগ্য। তবে পল্লী এলাকায় এই চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও সক্রিয় রয়েছে। এতে উপজাতীয় জনগণের পরিপূর্ণ আস্থা এককালে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

তালিকের মতে অনেক সময় গঙা, ভূত, ডাকিনী ইত্যাদি উপ-দেব-দেবীর অপক্রিয়ার ব্যাধির উৎপত্তি মনে করা হয়। তালিকটিকে সেই শিরোনামে আখ্যাও দেওয়া হয়। তার লক্ষণ ও চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে অতঃপর। বৈজ্ঞানিক বিচারে দেব-দেবীর অপক্রিয়া বাহুল্য মনে হতে পারে। সেইক্ষেত্রে তালিকের নামটুকু বাদ দিয়ে লক্ষণ ও চিকিৎসার অংশটুকু গ্রহণ করলে তালিকটির ঔজ্জ্বল্য কিছুতেই ম্লান হবে না।

বিভিন্ন ব্যাধি ও লাক্ষণিক চিকিৎসা তালিকায় যে বিপুল সংখ্যক বনৌষধির প্রয়োগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার মূল্য বিচারে গবেষণায় আগ্রহী হলে ঔষধ বিজ্ঞানে নুতন কিছু সংযোজিত হবে এই বিশ্বাস রাখা যায়। এখানে নমুনা হিসাবে কিছু সংখ্যক তালিকা উল্লেখ করা হল মাত্র। বস্তুতপক্ষে এই সংখ্যা বিপুল। অদূর ভবিষ্যতে এগুলো লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। কারণ এখন চিকিৎসার জন্য সবাই যায় ডাক্তারের কাছে। তাই উদ্যোগী হয়ে এইসব বইপত্র সংরক্ষণ করার সময় এখনই। বিলম্বে হারিয়ে যাবে।

তথ্যনির্দেশ

১. চাকমা তালিক চিকিৎসা, লেখক : ডা. ভগদত্ত খীসা, প্রকাশক- মনি স্বপন দেওয়ান, প্রকাশ কাল- ১৯৯৬
২. সূর্যসেন চাকমা, বৈদ্য, ত্রিপুরাছড়া, রাঙ্গামাটি
৩. লেট্টাং চাকমা, বৈদ্য, বন্দুকভাঙা, রাঙ্গামাটি
৪. রমণী মোহন চাকমা, বৈদ্য, রাঙ্গামাটি
৫. প্রতীয়মান চাকমা, বৈদ্য, বন্দুকভাঙা, রাঙ্গামাটি

www.pathagar.com

ধাঁধা/বানাহ্

১. উয়রে মালা তলে মালা, থগদি থগদি হাঁদে ভালা– কচ্ছপ
উপরে মালা (নারিকেলের) নিচেও মালা, হামাগুরি দিয়ে হাঁটে ভাল– কচ্ছপ

২. ফেল্যুং কাল্যা জীরা, উদিল ছদরক পা, ফুদিল মালতি ফুল, ধর্ল্য কড়ঙা– তিল
কৃষ্ণজীরা ফেলিলাম, গাঁদা ফুলের গাছ উঠল, মালতিফুল ফুঠলো কামরাঙা ধরলো– তিল।

৩. গাঙ কুলে কুলে বড়ই গাঝ, লড়ে চড়ে ন পড়ে– চক্ষুলোম
নদীর তীরে তীরে বড়ই গাছ, নড়ে চড়ে পড়ে না– চক্ষুলোম

৪. জ ভেইয়ে লাড়েই ধরে, দি ভেইয়ে মারে– উকুন অন্বেষণ ও মারা।
দশ ভাইয়ে দৌড়াইয়া ধরে, দুই ভাইয়ে মিলিয়া মারে– উকুন অন্বেষণ ও মারা ।

৫. পাঁচ ভেইয়ে তুলে, বত্রিশ ভেইয়ে ভিরে, এক ভেইয়ে থেলা মাল্যে, দর্য্যমুরত পড়ে– ভাত খাওয়া
পাঁচ ভাই তুলে ধরে, বত্রিশ ভাই মিলে কষে, এক ভাই ঠেলা মারিলে সমুদ্র গর্ভে পড়ে– ভাত খাওয়া

৬. বাবু সান্যে বঝে, চলাহ্ সান্যে ভাজে, বাঘ' সান্যে ফাল মারে, পাথর' সান্যে ডুবে– ব্যাঙ
বাবুর মত বসে খড়খড়ির মত ভাসে, বাঘের মত লাফ দেয় পাথরের মত ডুবে– ব্যাঙ

৭. ইজর' মাধাত খের' কুর, মেলি চেলে চাম্পাফুল– কাঁঠাল
ইঁজরের মাথায় খড়ের গাদা, খুলে দেখলে চাঁপাফুল– কাঁঠাল

৮. আগাজে ঝিলিমিলি, পাতালে লেজ, কন্ খোদায় বানেই দিয়ে কালাকলজ্যায় কেঝ– আম
আকাশে ঝিলমিল, পাতালে লেজ, কোন খোদায় বানিয়ে দিয়েছে হৃৎপিণ্ডে কেশ–আম

৯. কাজালক্ষে ভেকভেক্যা, পাগিলে সিন্দুর, যে ভাঙি ন' পারে তে গুত্তিসুদ্দো উন্দুর– মাটির পাতিল
কাচা সময়ে নরম, পাকলে সিন্দুর, যে বলতে না পারে তার গুষ্ঠিসুদ্ধ ইঁদুর- মাটির পাতিল

১০. মাধাত খড়গ টিগিনিৎ চুল, দশ থেং আঘে তিন লেঙুর– চিংড়ি মাছ
মাথায় খড়গ, টিকিতে চুল, দশ পা আছে তিন লেজ– চিংড়ি মাছ

১১. একুলে ধুমধাম, ওকুলে বিয়া, ভাঙা নারিকুল জোড়া দিয়া– বন্দুক

www.pathagar.com

এই কুলে ধুমধাম ওই কুলে বিয়ে, ভাঙ্গা নারিকেল জোড়া দেয়া– বন্দুক

১২. আষ্ট আহ্‌ত ষোল আদু, মাছমারা যিয়্যে সাধু, শুগনো খালৎ ফেল্যুং জাল, মাছ মাত্যে পরান যার– মাকড়সা
আট হাত ষোল হাটু, মাছ মারতে গেছে সাধু, শুকনো খালে ফেললাম জাল, মাছ মারতে প্রাণ যায়– মাকড়সা

১৩. এ্যাহ্‌ত নয় ঘোড়াও নয়, ফিরে পাগে পাগে,সুন্দর পুরুষ নয় থাগে ত্রি লগে– চরকা
হাতিও নয় ঘোড়াও নয়, ফিরে ঘুরে ঘুরে, সুন্দর পুরুষও নয় থাকে স্ত্রীর সাথে– চরকা

১৪. লুহ্‌রে লুহ্'অ , লুহরে ধল্য ঘুণে, স্বর্গপুরত আগুন বাচ্যে মারি দিব কনে?– রোদ্র
লোহারে লোহা, লোহাকে ধরলো ঘুণে, স্বর্গপুরিতে আগুন লেগেছে নিভাবে কে?– রোদ্র

১৫. হলদ্যা ফুল চন্দন' মালা, ধরি ন পারে বেতাগী কাঁদা– মৌচাক
হলদে ফুল চন্দনের মালা, ধরতে পারা যায় না বেত কাঁটাযুক্ত– মৌচাক

১৬. হিলৎ বিলৎ পানি নেই গাঝ আগাত কুয়ো– নারিকেল
পাহাড়ে বিলে কোথাও পানি নেই গাছের আগায় কুয়া– নারিকেল

১৭. এক আহ্‌ত গাচ্চ্যো, ফুল ফুদে পাঁচ্চ্যো– হাত
এক হাত গাছটি, ফুল ফোঁটে পাঁচটি– হাত

১৮. এক পাদাত বুড়ো অয়– ওল
এক পাতাতেই বুড়ো হয়– ওল

১৯. বড় কলগৎ সুদো ফুদে– তারা
বড় পাহাড়ের গায়ে সূতা ফোঁটে– তারা

২০. খায়দে গুলার বদু নেই– ডিম
খাওয়া যায় এমন গুলার বোঁটা নাই– ডিম

২১. দ্বি ভেইয়ে লড়ালড়ি– মানুষের হাঁটা
দুই ভাইয়ে দৌড়াদৌড়ি– মানুষের হাঁটা

২২. আগা কাবিলে গোরা মরে– খাল
আগা কাটলে গোড়া মরে– খাল

২৩. তগায়, পেলে ন' আনে– পথ
তালাশ করে পাইলে আনে না– পথ

২৪. পরাণ নেই মানুজ গিলে– জামা
প্রাণ নাই কিন্তু মানুষ গিলে– জামা

২৫. চাল আঘে তলা নেই, পঝা থবার জায়গা নেই– ছাতি
চাল আছে তলা নাই, বোঝা রাখার জায়গা নাই– ছাতি

২৭. চাল' উয়রে শিয়াল' ছ, কিজাক কিজাক করে রা– মেঘের গর্জন
চালের উপর শিয়ালের বাচ্চা, বিকট বিকট শব্দ করে– মেঘের গর্জন

২৮. রক্ত হায় সাচ্ছান ফেলেই দে– হুচ্চেল
রক্ত খায় মাংসটা ফেলে দেয়– আখ

www.pathagar.com

২৯. সাচ্ছান ফেলেই বাগলান হায়– তেত্তোলগুলো
মাংসটা ফেলে খোসাটি খায়– তেত্তোলগুলো (এক ধরনের বুনো ফল)
৩০. হামা মাধাত ঘুদলা– চুলসুদো
পাহাড়ের ঢালুতে মলের দলা– চুলের ঝুঁটি
৩১. নিয়েইবো চিবিলে চোক্ষুন জ্বলজ্বলায়– বাত্তি
নাভিটা টিপলে চোখগুলো জ্বলে– বাত্তি
৩২. গোড়া কাবিলে পিড়া পেই, আগা কাবিলে পিড়া নেই– নখ
গোড়া কাটলে ব্যাথা পাই, আগা কাটলে ব্যাথা নাই– নখ
৩৩. কাজা লক্কে কবা, পাগিলে বগা– চুল
কাঁচা থাকতে কাক, পাকলে বক–চুল
৩৪. চামড়া বন্দুক বয়েরর গুলি, হোজোরে এই নাগত বাজে– পাদবাজ
চামড়ার বন্দুক বাতাসের গুলি একেবারে নাকে এসে লাগে- পাদের গন্ধ
৩৫. মজরি ভিদিরে পুঅ দাঙর অয়– পুত্তিংগুলো
মশারির মধ্যে বাচ্চা বড় হয়– পুত্তিংগুলো (এক ধরনের বুনোফল)
৩৬. ভিদিরে সাচ বারে আহ্‌ড়– শামুক
ভিতরে মাংস বাইরে হাড়– শামুক
৩৭. এ এহুলে এক থেং ওহুলে এক থেং– রেগা
এই কুলে এক পা, ওই কুলে এক পা– সাঁকো
৩৮. জেদা থাক্কে এক, ম'লে দুই– সিলোন
জ্যান্ত থাকতে এক, মরলে দুই– ঝিনুক
৩৯. গাজ' উগুরে সিবিদি তবা– বগা
গাছের উপরে চুনের কৌটা– বক
৪০. টিগিনিত ধরি কাবং যারে, বারিজে হাল্যা ঝারে ঝারে– বাচ্ছুরি
টিকি ধরে কাটি যাকে, বর্ষার মওসুমে জঙ্গলে জঙ্গলে– বাঁশকোরল
৪১. বারে আড়হোরা ভিদিরে চাম, কন হদায় বানেল এই অমহদ হাম– জুমোর
বাইরে হাড়গোড় ভিতরে চামড়া, কোন খোদায় বানিয়েছে এই সুন্দর কাজ– জুমোর
৪২. দি হিত্যে ধরনি মধ্যে সুরুঙ, তে বাজে গুরুং গুরুং– ঘন্দি
দুই দিকে ধরনি মাঝখানে সুরঙ্গ, বাজে গুরুং গুরুং– ঘণ্টা
৪৩. এ হুয়ো পানি ও হুয়োত যায়, মধ্য হুয়োবো শুগেই যায়– মদ সুয়ানা
এই কুয়ার পানি ওই কুয়োয় যায়, মধ্যের কুয়োটি শুকিয়ে যায়– মদ বানানো
৪৪. মুঅদি হায় পুনোদি ঢুল বাজায়– শুগোর
মুখে খায় পাছায় ঢোল বাজায়– শুকর
৪৫. এক পাদায় বুড়ো অয়– শন
এক পাতাতেই বুড়ো হয়– শন
৪৬. মরা উগুরে হাক্কে সেজেরায়– হুনি
মরার উপরে ক্ষণে ক্ষণে বারি পড়ে– ছেনি

www.pathagar.com

৪৭. লুদি বান্যে ধুব ছাগল– হুমুরো
লতায় বাঁধা সাদা ছাগল– কুমড়া
৪৮. হুক্কুরুক হাক্কারাক গাঝ' ঘুত্যে, হয়দিন থেবে পানিত দুপ্যে– হাঙারা
৪৯. দুঅ আঘে উড়ি ন' যায়, ঠুথ আঘে ফুদি ন' হায়– কলাথুর
পাখা আছে উড়ে যায় না, ঠোঁট আছে ঠুকড়িয়ে খায় না– কলার থোড়
৫০. ভুই ধুপ বিজি হালা, যে বুঝে তেয়্যু ভালা– লেগা
জমি সাদা বিচি কালো, যে বুঝে সেও ভাল– লেখা
৫১. যার জনম সাগরত, ঘরে ঘরে যায়, এক্কা গরি পানি দিলে কুদু পোল্লেই যায়– নুন
যার জন্ম সাগরে, ঘরে ঘরে যায়, একটু করে পানি দিলে কোথায় হারিয়ে যায়– লবন
৫২. কন মিলেত্তুন দাড়ি উধে– পাদি ছাগল
কোন মেয়েলোকের দাঁড়ি উঠে– পাঠি ছাগল
৫৩. দাঁত নেই কান নেই মাদিত তলে থায়, চগলা আঘে মাছও নয় পুক জুক ধরি হায়– মাহ্লমুরো
দাত নাই কান নাই মাটির নীচে থাকে, আঁশ আছে মাছও নয় পোকামাকড় ধরে খায়– বনরুই
৫৪. চের থেং আঘে লেজুর নেই– ব্যাঙ
চার পা আছে লেজ নাই– ব্যাঙ
৫৫. বানা পুনে মুঅয় টানা– ঘর
শুধু পাছায় মুখে টানা– ঘর
৫৬. এক পিড়েত পাঁচ ভেই– পাদলা
৫৭. ধুব ছিলুম পুনত দাড়ি– রোন
সাদা জামা পাছায় দাড়ি– রসুন
৫৮. ঘরঅ উগুরে ঘর, ঘুম এলে পড়– মজরি
ঘরের উপরে ঘর, ঘুম আসলে শুয়ে পড়– মশারি
৫৯. পরান নেই পেদির এক বুক ছ'– ঘর
প্রাণ নাই পেটের এক বুক বাচ্চা– ঘর
৬০. বড়্ গাঙ সাজুরি বাঘ্যা এজের আ'গরি– লঞ্চ
বড়গাঙ সাঁতরিয়ে বাঘ আসছে হা করে– লঞ্চ

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন/দাঘ' কধা

১. সময়ত লুঙিলোই, অসময়ত জাগিলোই।
ব্যাখ্যা : সময়ে পৌঁছে যাই, অসময়ে জেগে যাই।

২. ছিনে সুদোর মু নেই।
ব্যাখ্যা : ছেড়া সূতার মুখ থাকেনা।

৩. ভাদিয়ে কয়দ্যা আশি জারোলে কয়দ্যা শত্
কুম্মোইয়ে কয়দ্যা কেল্যা বেন্যা কধা কিয়া কচ্
ব্যাখ্যা : ভাদি গাছে বলে আশি, জারুল গাছে বলে শত, কুম্বোই গাছে বলে কাল সকালের কথা বলিস কেন। অর্থাৎ বয়স নিয়ে বড়াই করার কিছু নেই। মানুষের বাহ্যিক চেহারা দেখে সব সময় বয়স আঁচা করা যায়না।

৪. হাছ্যা পাদা গম অহ্লে দাদিয়ো গম, মিলা গম অহ্লে রানিও গম।
ব্যাখা : তামাক পাতা ভাল হলে গাছের ডালও ভাল, নারী যদি জাতের হয় তাহলে বিধবাও ভাল।

৫. লাদা ওক পাদা ওক ভাত পারা ন অয়, পরেইয়ে মারে মা ডাগিলেয়ো নিজো মা ব' ধক্যা ন অয়।
ব্যাখা : লতা, শাক সব্জি যাই হোক ভাতের মত হয় না, অন্যজনের মাকে মা ডাকলেও নিজের মায়ের মত হয় না।

৬. হেরত বাজি এ্যাহ্ধ এযে।
ব্যাখা : পরিকল্পনা যুৎসই হলে ইপ্সিত ফল লাভ সম্ভব।

৭. গাঙ ইজে মাছ দেলে খেই ন'পায়।
ব্যাখা : নদীর চিংড়ি বা মাছ দেখা গেলেও ধরা এত সহজ নয়।

৮. সুয়দর ফদা অ সুয়োদর গদা।
ব্যাখা : সুস্বাদু খাবার অল্প খেলে স্বাদ মুখে লেগে থাকে। কিন্তু খাবার ভালো না হলে পেট ভরে খেলেও তৃপ্তি হয়না।

৯. আহ্র, হরা দানা, মরা ফেদেরা খানা।
ব্যাখা : সবার শেষে খেতে বসলে সব সময় উচ্ছিষ্ট খাবারই খেতে হয়।

১০. সোলুগ' ন' মুরোন্দি আহ্ধে।
ব্যাখা : পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকলে যে কোন কাজ যৌথভাবে করা যায়।

১১. কিয়োরে বুগো সাচ্ কিয়োরে পিধো সাচ।

www.pathagar.com

ব্যাখা : ভালোবাসার বা স্নেহের মানুষকে সব সময় ভালো কিছুই পরিবেশন করা হয়।

১২. যিয়েত শুনে সিয়েত ফেলেই এযানা।

ব্যাখা : যেখানে যে কথা শুনা হয় সেখানেই তা ফেলে আসা ভাল।

১৩. বাঝিলে আঝিলে ন' যায়।

ব্যাখা : আপদ সহজে ছাড়ে না।

১৪. ঝুব' ছেরে পোরোল বুর'।

ব্যাখা : মেঘে মেঘে বেলা বয়ে যাওয়া।

১৫. সাত যুগর পেজা।

ব্যাখা : প্রবীণ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি (সাত যুগের প্যাঁচা)।

১৬. নিঘিল্যা এ্যাহ্ধ দাত ন' সমায়।

ব্যাখা : হাতির দাঁত একবার উঠতে শুরু হলে তা ক্রমশ পরিপক্ক হতে থাকে।

১৭. আহ্ গল্যে তাগারা দেগে।

ব্যাখা : অভিজ্ঞ লোকেরা অন্য জনের কথা শুরুর ধরন দেখেই পুরো কথাটি আগে ভাগে বুঝে নিতে পারে।

১৮. গাজত্তুন অহ্লা পয্যে পারা।

ব্যাখা : গাছের উপর থেকে হঠাৎ হুলোবিড়াল ঝুলে পড়ার মত (কিংকর্তব্যবিমূঢ়)।

১৯. যা ফালত তে পারে।

ব্যাখা : যার ফাঁদে সে পড়ে।

২০. নেই মোগত্তুন কানা মোগ ভালা, সবায় ন' পাত্তে রাজা ঝি ভালা।

ব্যাখা : স্ত্রী না থাকার চেয়ে অন্ধ স্ত্রী ভাল, অনন্যোপায় হলে রাজকন্যাকে প্রস্তাব দেয়ার বিষয়টি ভাবা যায়।

২১. নিজ আন্দাজ পাগলেও বুঝে।

ব্যাখা : নিজের ভাল পাগলও বুঝতে পারে।

২২. উগুরে উগুরে বয়ার যায়, কলগ' মানজ্যে থান ন' পায়।

ব্যাখা : ঝড়ো বাতাস উপর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, পাহাড়ের নিচে বসবাসকারীরা তা অনুভব করতে পারে না।

২৩. এগা বুদ্ধি যার, গুনৎ ধরি তার, ছেত্তেরা বুদ্ধি যার পুনৎ ধরি তার।

ব্যাখা : নিজের বুদ্ধি- বিবেচনাতেই কাজে হাত দেয়া ভালো। সবার পরামর্শ নিয়ে কাজে হাত দিলে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে।

২৪. কেন্যায় দুজ গরে মাল্যায় কাবা খায়।

ব্যাখা : দোষ করে একজন, কিন্তু নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পায়।

২৫. খেই ন' জান্যেই মরি পায়, বই ন' জান্যেই লরি পায়।

www.pathagar.com

ব্যাখা : আগেভাগে ভালোমন্দ সবদিক বিবেচনা করে কাজে হাত দিলে মাঝপথে থেমে যেতে হয়না।

২৬. গাজ' আগাত গুই, খুরো ভাত খে যা তুই।

ব্যাখা : গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল

২৭. গিরিগুণে গুগর ফাত্তোয়া অয়।

ব্যাখা : গৃহস্থের প্রকৃতি অনুসারে গৃহপালিত জন্তু সে ধরনের স্বভাব পায়।

২৮. চিল'র দরে কি কুরো ন' পালেব।

ব্যাখা : বিপদের ভয়ে ঘরে বসে থাকা কোন সমাধান নয়।

২৯. ছাগল দিলে দরি ন' দিলে।

ব্যাখা : কাউকে কোন কিছু দিলে তা মন খুলে দেওয়াই উত্তম।

৩০. নানু ন' চিনি সালাম গরানা।

ব্যাখা : পূজনীয় বা যোগ্য ব্যক্তিকে ঠিকভাবে না চিনতে না পারা।

৩১. পেক্কোয়ও পরিবার গং, ঢেলাবোও ভাঙিবার গং।

ব্যাখা : কোন কিছু শুভ উদ্যোগ/ পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত সময়।

৩২. ফগির লগে কালা বাঙাল, হরিঙ লগে চঙরা পাগল, খঞ্জন সমারে চেগা পাগল।

ব্যাখা :গুজবে কান দেয়ার অভ্যাস জীব ও প্রাণী কূলের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

৩৩. ফুল বারি গায় ন' সয়, চাবুগ' বারি পরানে মাগের।

ব্যাখা : নিজের সক্ষমতা না বুঝে কঠিন কোন কাজে হাত দেয়া।

৩৪. বগা ছেরে কবা।

ব্যাখা : সুধী সমাবেশে অপ্রত্যাশিত/ অপাংক্তেয় ব্যক্তির আগমন।

৩৫. বরগাঙ'ও চায় পারা রাঙা খাদিও ধয় পারা।

ব্যাখা : বড় নদীও দর্শন হবে আর পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করা যাবে (রথও দেখা কলাও বেচা)।

৩৬. বিলেই লই কুগুর।

ব্যাখা : বিড়ালের সঙ্গে কুকুরের সর্বদা ঝগড়া বাঁধে (দা কুমড়া সম্পর্ক)।

৩৭. বুড়া বান্দরে গাঝত উধে।

ব্যাখা : বানরের স্বভাবই হচ্ছে গাছে ওঠা (মানুষ অভ্যাসের দাস)।

৩৮. ভাত নেই গর্ পিধা, উলু পারা চুল ঝুধা।

ব্যাখা : আয় বুঝে ব্যয় না করা।

৩৯. মইল্ল্যায় গাঝ কাবদে, ভাগিনা নরম পায়।

ব্যাখা : মামা যখন গাছ কাটে, তা ভাগ্নের সহজ লাগে।

৪০. মানিক্যা বাবর ছিন্নি খানা।

ব্যাখা : অকুস্থলে দেরিতে হাজির হলে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

৪১. মানুজ বুঝি কুগিয়ে কামারায়।

www.pathagar.com

ব্যাখা : মানুষ সাধারণত অন্যের দুর্বলতাকে বিবেচনায় নিয়ে ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করে।

৪২. যা নাঙে নেই , মেজবান্যা ঘরত গেলেও নেই।
ব্যাখ্যা : অভাগা যেদিকে যায় সেদিকে সাগরও শুকিয়ে যায়।

৪৩. যে ফুল নিন্দে সে ফুল পিন্দে।
ব্যাখ্যা : অন্যকে সব সময় হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলে নিজেরও অপমানিত হতে হয়।

৪৪. যে কুগুর লেজ বেঙা, চুমৎ ভরেলেও উজু ন' অয়।
ব্যাখ্যা : কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।

৪৫. লূর শুগর চালত উধিলে, ঘুগঘুগি ডাঙর অয়।
ব্যাখ্যা : হঠাৎ করে প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হলে তার আচরণেই তা প্রকাশ পায়।

৪৬. ধায়দে মাচ্ছোও দাঙর, মরেদে পুয়াবোও দোল।
ব্যাখ্যা : মানুষ মাত্রই অতীতচারী। আর অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করেই মানুষ হা-হুতাশ করে।

৪৭. সময় থাগদে বান্, দিন থাগদে হ্াদ।।
ব্যাখ্যা : সময় মত সব কাজ সম্পন্ন করলে মানুষকে অযথা বিপদে পড়তে হয়না।

৪৮. ছেদাম নেই ভেদাম মোন উগুরে তিন আদাম।
ব্যাখ্যা : দুর্বল ব্যক্তি/ অসফল ব্যক্তি সব সময় অন্যকে নিজের সাফল্যের/ বীরত্বের গল্প শোনাতে পছন্দ করে।

৪৯. ছেদাম নেই যার তিন মোগ তার।
ব্যাখ্যা : সাধ্য/ সামর্থ্য নাই যার, তিন স্ত্রী তার (নিষ্কর্মা লোক সব সময় বাচাল হয়)।

৫০. এ্যাহ্ত এলে তে গাঝ তোগাতুগি।
ব্যাখ্যা : বিপদ মোকাবেলার জন্য সম্ভব সব রকম আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।
ব্যাখ্যা : হাতির পিছনে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে (দুর্বলের স্বভাব হচ্ছে সব সময় আড়ালে আবডালে সবল ব্যক্তির বদনাম করা)

৫১. এ্যাহরা হেইয়া বাঘ'র দরে চিৎ হেইয়া বাঘ লাঘৎ পানা।
ব্যাখ্যা : এক বিপদ কাটাতে গিয়ে আরো বড় ধরনের বিপদের মুখে পড়া।

৫২. চিগোন মরিজ' ঝাল বেচ্।
ব্যাখ্যা : খাটো ব্যক্তিকে সব সময় হেয় চোখে দেখা উচিত নয়।

৫৩. হের' তলেও সোনা থায়।
ব্যাখ্যা : অস্থানেও অমূল্য বস্তুর দেখা মেলে।

www.pathagar.com

৫৪. রাদা নেই দেজত কুড়ির দবদবা।
ব্যাখ্যা : যে দেশে গুণী ব্যক্তির অভাব সেখানে অপেক্ষাকৃত কম গুণীরা সমাদৃত হন (বৃক্ষ নাই দেশে এরেন্ডা প্রধান)।

৫৫. একেত' নাজন্যা বুড়ি, তা উগুরে ঢুলর বারি।
ব্যাখ্যা : একেতো নাচুনী বুড়ি তার উপর ঢোলের বারি।

৫৬. গাঝ চিনে বাগলে, মানুচ চিলে আক্কলে।
ব্যাখ্যা : মানুষের চরিত্র তার আচরণেই প্রতিফলিত হয়।

৫৭. গরম ভাদে বিলেই বেজার।
ব্যাখ্যা : গরম ভাতে বিড়াল অসন্তুষ্ট (অপছন্দের কাজ করতে বললে সবাই বিরক্ত হন)।

৫৮. মুই নয় খুরো।
ব্যাখ্যা : সব কিছু জানা থাকার পরও না জানার ভাণ করা।

৫৯. আদ্ধানত্তুন বেগুন' চেত।
ব্যাখ্যা : কাজে যোগদান না করেও ফল লাভের সময় নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা।

৬০. পুনৎ ঘু বাচ্যে পারা।
ব্যাখ্যা : আপদ পিছু না ছাড়া।

৬১. হাত্তে হাত্তে নলা, গাদে গাদে গলা।
ব্যাখ্যা : পরিশ্রম করলে নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়।

৬২. জাদে জাদ তোগায়, হাঙারায় গাত তোগায়।
ব্যাখ্যা : স্বজনের দেখা পাবার জন্য মানুষ সব সময় ব্যাকুল থাকে।

৬৩. হোয় জানিলে হদা, হোয় জানিলে আদাহ্।
ব্যাখ্যা : কথা ঠিকভাবে উপস্থাপন করতে জানলে মানুষকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।

৬৪. চোগ কান ওক, দেজ কান ন'ওক।
ব্যাখ্যা : সর্বদা সামগ্রিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

৬৫. পানিত বু'র মারি আঘানা।
ব্যাখ্যা : সবার অগোচরে কোন ফন্দি আঁটলেও তা এক সময় প্রকাশ পাবে।

৬৬. যেন রাধা সেন কানু।
ব্যাখ্যা : একই স্বভাবের দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ যোগাযোগ।

৬৭. উনো ভাদে দুনো বল।
ব্যাখ্যা : উনো ভাতে দুনো বল।

৬৮. পাত্তে পাত্তে পারং, অধক ছিনি পড়ং।
ব্যাখ্যা : সুযোগের অপব্যবহার করা।

www.pathagar.com

৬৯. জাচ্যে ভাদ ন'হেলে সাতদিন সং উভোজ থে পায়।
ব্যাখ্যা : উত্তম প্রস্তাব/ ভালো পরামর্শ গ্রহণ না করলে পরে পস্তাতে হয়।

৭০. বান্দর' নাগত যুগ সম্যে পারা।
ব্যাখ্যা : অস্থির স্বভাবের ব্যক্তি।

৭১. যার যিদ্দুর ফাল, তার সিদ্দুর ছাল।
ব্যাখ্যা : নিজের ওজন বুঝে কাজ করা উচিত।

৭২. ফাদা বাজত বিজে বাজানা।
ব্যাখ্যা : উভয় সংকটে পড়া।

৭৩. সোনা থেলে মনা কি রাহ্ত।
ব্যাখ্যা : টাকা থাকলে বাঘের দুধও মেলে।

৭৪. পাগোলী পুওবোও ওল- মোল।
ব্যাখ্যা : পূর্ণ উদ্যোমে কাজ শুরুর পরই আবার কাজ বন্ধ করে রাখা।

৭৫. পঝা কালোঙ হুলি দেগানা।
ব্যাখ্যা : কোন কিছু গোপন রাখতে না পারা।

৭৬. বাপ চাহ পুত চা।
ব্যাখ্যা : বাপকা বেটা।

৭৭. আমন'অ বুদ্ধিয়ে তর, পর বুদ্ধিয়ে মর।
ব্যাখ্যা : নিজের বুদ্ধিতে এগিয়ে গেলে বিপদে পড়লেও রক্ষা পাবার সম্ভাবনা থাকে।

৭৮. ন' পাদে এ্যাহত ও মানে, ঘোরাও মানে।
ব্যাখ্যা : মানুষ অসহায় অবস্থায় থাকলে সব শর্তই মেনে নেয়।

৭৯. রেদ' মায় এ্যাহদ হাম।
ব্যাখ্যা : অসময়ে কাজে হাত দেয়া।

৮০. হাম নেই গত্তুং, বল নেই সাত্তুং।
ব্যাখ্যা : কাজ নেই করার, বল নেই সারবার। (বেশী আশায় গুড়েবালি)

৮১. এক মোক্কি ঝাদি ভাত, দ্বি মোক্কি লাদি ভাত, তিন মোক্কি কবালত আহ্ত।
ব্যাখ্যা : এক বউয়ে জলদি ভাত, দুই বউয়ে লাথি ভাত, তিন বউয়ে কপালে হাত।

৮২. ঝাক্কো অঝা'য় ব্যেনী মরে।
ব্যাখ্যা : অতি সন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট।

৮৩. গাঝত তুলি দিয়্যা থানদে, পাড়িয়্যা ন' থান।
ব্যাখ্যা : গাছে তুলে দেওয়ার থাকে, নামানোর কেউ থাকে না।

৮৪. এ্যাহদ' হেইয়াত কুগুর ভুগানা।
ব্যাখ্যা : হাতির গায়ে কুকুরের ঘেউ ঘেউ করা।

www.pathagar.com

৮৫. দিন দিবুচ্যে চেরাগ জালানা।
ব্যাখ্যা : যেজন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি আশু গৃহে তার রহিবে আর নিশিথে প্রদীপ বাতি।

৮৬. তিন শিরে যাত্তুন্, বুদ্ধি লইয়' তাত্তুন।
ব্যাখ্যা : অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে বুদ্ধি নেওয়া উত্তম।

৮৭. দ্বি কাক্যে সেরেদি পানিত পরানা।
ব্যাখ্যা : দুই ভেলার মাঝেখানে পানিতে পড়া। (উভয় সংকটে পড়া)

৮৮. যমবোই হারা হনা।
ব্যাখ্যা : যমের সাথে খেলা করা।

৮৯. মিলে'র পাড়া নেই, মদ্দ'র চবা নেই।
ব্যাখ্যা : মেয়েলোকের স্থায়ী নিবাসের ঠিক নেই, পুরুষলোকের কবরস্থানের ঠিক নেই।

৯০. যার মরন যিয়ত ন' পানে যায় সিয়ত।
ব্যাখ্যা : যার মৃত্যু যেখানে নৌকা ভাড়া করে সেখানে যেতে হয়।

৯১. ঝিরে মারি বো' রে শিগানা।
ব্যাখ্যা : ঝিকে মেরে বউকে শেখানো।

৯২. ঝাড় মুগুরে বাঘ ধাবানা।
ব্যাখ্যা : ঝাড় পিটিয়ে বাঘ দৌড়ানো।

৯৩. শিয়াল্যা হেদ' অ চায়, ধেদ'অ চায়।
ব্যাখ্যা : শিয়াল খেতেও চায়, আবার পালাতেও চায়।

৯৪. বাঘ্যেত্তুন শিয়াল্যা তিন দিনর জেত।
ব্যাখ্যা : বাঘের থেকে শিয়াল তিন দিনের জ্যৈষ্ঠ।

৯৫. বড় বড় বান্দরর, বড় বড় পেত, লঙ্কাত যেবার মাধা হেত।
ব্যাখ্যা : বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লংকায় যাবার মাথা হেট।

৯৬. বাঘ' মাধাত উগুন তোগানা।
ব্যাখ্যা : বাঘের মাথায় উকুন খোঁজা।

৯৭. বুঝিয়েরে বুঝোদে মনত সুগ, অবুঝিয়েরে বুঝোদে মনত দুগ'।
ব্যাখ্যা : সমঝদার ব্যক্তিকে বোঝাতে সুখ অ-সমঝদার ব্যক্তিকে বোঝাতে মনে দুখ।

৯৮. সাধুর হিযেব বার বার, চুরর হিযেব একবার।
ব্যাখ্যা : সাধুর হিসাব বার বার চোরের হিসাব একবার।

৯৯. বোয়ের ন'বেলে গাঝ' পাদাও ন'লড়ে।
ব্যাখ্যা : বাতাস না বইলে গাছের পাতাও নড়ে না।

১০০. যদি থায় লাঙর মন, গাঙ সাজুত্তে কদক্ষণ।
ব্যাখ্যা : যদি থাকে প্রেম করার মন, গাঙ সাতরাতে কতক্ষণ।

www.pathagar.com

১০১. গম মানজ্য লগে বেড়েলে পাদি ইক্কুয়া পায়, অ-মানজ্য লগে বেড়েলে লাদি ইক্কুয়া হেই পায়।
ব্যাখ্যা : ভালো মানুষের সাথে বেড়ালে পাটি একটি পায়, অ-মানুষের সাথে বেড়ালে লাথি একটি খেতে হয়।

১০২. যে দিনত যে হাল, অরিঙে চিনে বাঘ' গাল।
ব্যাখ্যা : যে দিনে যে হাল, হরিঙে চিনে বাঘের গাল।

১০৩. এক শিয়েল' বিজা তন্তনেলে দজ শিয়েল' বিজা তন্তনায়।
ব্যাখ্যা : এক শিয়াল হাঁকলে অন্য শিয়ালরাও হাঁকে।

১০৪. নাক চিবিলে দূত্ পড়ে।
ব্যাখ্যা : নাক টিপলে দুধ পড়ে।

১০৫. আধিক চালাগে পদহ্ পাজারত আঘানা।
ব্যাখ্যা : অতি চালাকে পথের ধারে পায়খানা করা।

১০৬. নজিন্যে কুগুরর ঘেঙ ঘেঙানি বেচ্।
ব্যাখ্যা : সাধ্য নাই কুকুরের ঘেউ ঘেউ বেশি।

১০৭. ছেদাম নেই এক্কানা মিধে গুলি ভাদ হানা।
ব্যাখ্যা : সাধ্য নাই কানাকড়ি মিঠা দিয়ে ভাত খাওয়ার ইচ্ছা।

১০৮. যা কধা শুনে তা কধা সুয়ত।
ব্যাখ্যা : যার কথা শোনা হয় তার কথা মিষ্টি।

১০৯. ঝুপ বুঝি হুপ মারানা।
ব্যাখ্যা : ঝোপ বুঝে কোপ মারা।

১১০. যা মনত কালি তা মনত শালি।
ব্যাখ্যা : যার মনে কালি তার মনে শালি।

১১১. চাদরে বেঙে ঘিনেয়, বেঙরে চাদে ঘিনেয়।
ব্যাখ্যা : ব্যাঙ ও শামুক একে অপরকে ঘৃণা করে।

১১২. অরিঙো লগে চঙরা পাগল।
ব্যাখ্যা : হরিণের সাথে সাম্ভার পাগল।

১১৩. ঘর'অ উন্দুরে বেড় হামরানা।
ব্যাখ্যা : ঘরের ইন্দুরে বেড়া কামরায়।

১১৪. গানজা কানি ঝাগারানা।
ব্যাখ্যা : ডাট দেখানো।

১১৫. বড়্ মুড়োত সাজুরানা।
ব্যাখ্যা : গভীর জলের মাছ।

১১৬. হুলুক পানিত মু ধনা।
ব্যাখ্যা : ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা।

www.pathagar.com

১১৭. অভাগ্‌ত্যা যিন্দি যায় মরা শামুক্যও উধি যায়।
ব্যাখ্যা : অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়।

১১৮. বাবনে ভদভদায় ছাগলে আহ্‌জে।
ব্যাখ্যা : ব্রাহ্মণে বক বক করে ছাগলে হাসে।

১১৯. বাঘ্যা মনত যিয়ান নেই শিয়ল্যা মনত সিয়ান।
ব্যাখ্যা : বাঘের মনে যা নেই শিয়ালের মনে তাই।

১২০. ইক্কো ফিরিঙ ভাগ গরি হানা।
ব্যাখ্যা : একটি ফড়িঙ সবাই ভাগ করে খাওয়া।

১২১. দুঅ ছিনি পরানা।
ব্যাখ্যা : পাখা ছিড়ে পড়া।

১২২. এক মুরত্তুন এক মুরো অজল লাগানা।
ব্যাখ্যা : এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড় উঁচু মনে হওয়া।

১২৩. মিধে আরি সুগ পানা।
ব্যাখ্যা : মিষ্টি হাড়ির খোঁজ পাওয়া।

১২৪. বারিঝে কুদুগুলো ধগ।
ব্যাখ্যা : বর্ষার লাউয়ের মত।

১২৫. বো বাইনি শেযে, পুও বাইনি দেজে।
ব্যাখ্যা : বউয়ের প্রশংসা শেষে, ছেলের প্রশংসা দেশে দেশে।

১২৬. বুড়ো নেই ঘরত ধৈর্য নেই, গুরো নেই ঘরত হাস্যা নেই।
ব্যাখ্যা : বুড়ো নেই ঘরে ধৈর্য নেই, বাচ্চা নেই ঘরে হাসির লোক নেই।

১২৭. বাঘে কি কোনদিন এ্যাহরা ইরোন?
ব্যাখ্যা : বাঘে কি কোনদিন মাংস ছাড়ে?

১২৮. উক্য অহ্‌লে কারাকারি, দ্বিবে অহ্‌লে ভাগাভাগি, তিন্যা অহ্‌লে আঘাআঘি।
ব্যাখ্যা : একটি হলে কাড়াকাড়ি, দুইটি হলে ভাগাভাগি, তিনটি হলে বাড়াবাড়ি।

১২৯. ভুলোর মোক সগলর ভোঝ।
ব্যাখ্যা : বোকার বউ সকলের ভাবি।

১৩০. বাব' তাগল পুওয় ধরানা।
ব্যাখ্যা : বাবার পেশায় ছেলের যুক্ত হওয়া।

১৩১. বেগেনায় এ্যাহ্‌ধো দাত খায় পারা।
ব্যাখ্যা : ব্যাঙের বাচ্চা হাতির দাত খায় এমন।

১৩২. পুজুন' মনায় চোগ্‌ ফুদি দ্যন।
ব্যাখ্যা : পোষা ময়নায় চোখ অন্ধ করে দেয়। (দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা)

১৩৩. বুদ্ধিয়ে আহ্‌জার কবালে কবাল।
ব্যাখ্যা : বুদ্ধি থাকলে উপায় হয়।

www.pathagar.com

১৩৪. চোগ থেই কানা, মোক্ থেই রানা।
ব্যাখ্যা : চোখ থাকতে অন্ধ, বউ থাকতেও বিপত্নীক।

১৩৫. কেইয়ে গান ডুবোক্ সিংগো ন ডুবোক্।
ব্যাখ্যা : শরীরটা ডুবে যাক তবু শিংটা না ডুবোক। (সাপও মরুক লাঠিও না ভাঙ্গুক)

১৩৬. কামর গুনে ভাত কাবর, মুওর গুনে বুগ চাবর।
ব্যাখ্যা : কাজের গুণে ভাত কাপড়, মুখের গুণে বুকে চাপড়।

১৩৭. ন বানন খুদ' চেই বৌ দ্যন জামেই চেই।
ব্যাখ্যা : নৌকা বানাতে হয় খুঁটি দেখে, বউ দিতে হয় জামাই দেখে।

১৩৮. এ্যাহ্ধ মলে মোচ্য পারা থায়।
ব্যাখ্যা : হাতি মরলেও মহিষের সমান থাকে।

১৩৯. আন্ধারত ধান কুজ'না।
ব্যাখ্যা :অন্ধকারে ধান খোঁজা।

১৪০. আয় বান্দরী যা বান্দরী।
ব্যাখ্যা : যাকে যেখানে সেখানে কাজে লাগানো যায়।

১৪১. যদি এজে যম খুর' সক্কে ন' চেব বুর' গুর'।
ব্যাখ্যা :যদি আসে যম চাচা তখন দেখবে না বুড়ো-শিশু। (বিপদ জেনে শুনে আসে না)

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

চাকমাদের লোকবিশ্বাস

১. রাতের বেলায় কাক বা ঘুঘু এবং সন্ধ্যা বেলায় মোরগের ডাক অশুভ।

২. কুকুর কিংবা বিড়ালের উচ্চ স্বরে কান্নার শব্দ অমঙ্গলজ্ঞাপক।

৩. শুকনা গাছে খঞ্জন পাখির ডাক অশুভ।

৪. রাতের বেলায় টিয়াপাখি উড়লে দেশ ছারখার হয়।

৫. মুরগি নরম ডিম পাড়লে গৃহস্থের জন্য অশুভ।

৬. গায়ের কাপড় বা গামছা পানিতে ভেসে যাওয়া অমঙ্গল।

৭. গ্রামে বানর ঢুকলে বা ঘরে ঢুকে বাঘের ভাতের মোচা খাওয়া ভাল নয়।

৮. ঘরের মধ্যে মৌমাছি ঢুকলে সবংশে বিনাশ নিশ্চিত।

৯. ঘরের মধ্যে অন্য কারও ছাগল উঠলে কোন অতিথির আগমন বার্তা বহন করে।

১০. যদি মোনঘরে গিয়ে বাঘ ওঠে তাহলে পরিবারের সকলকে মাথা ধোয়ার নিয়ম পালন করতে হয়।

১১. ঘরের চালে চিল, পেঁচা, শকুন বসলে অশুভ জ্ঞাপক, তার জন্য অতিসত্ত্বর পূজার আয়োজন করতে হয়, এছাড়া ঘরের চালে কুকুর উঠলে ঐ কুকুরের কান কেটে দেওয়া হয় এবং পরিবারের সকলের মাথা ধুতে হয়।

১২. কোথাও যাত্রাকালে খালি কলসি চোখে পড়লে তা অমঙ্গল, তবে ভরা কলসি দেখলে কার্যসিদ্ধি নিশ্চিত।

১৩. কোথাও যাত্রাকালে হাঁচি পড়া ভাল নয়, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যাত্রা করতে হয়।

১৪. কোথাও যাত্রাকালে মাথায় আঘাত পেলে তা অশুভ, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যাত্রা করতে হয়।

১৫. যাত্রাকালে কোন সাপ বা শিয়াল দক্ষিণ দিক হইতে বামে গেলে তা অযাত্রা, তবে বাম দিক হতে দক্ষিণে গেলে শুভ কিছু ঘটার সম্ভাবনা।

১৬. যদি কোন বন্য কুকুর ডাকতে ডাকতে কারও সামনে এসে পড়ে তাও অশুভ।

১৭. বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে যদি কোন প্রাণীর শবদেহ চোখে পড়ে তাহলে সে বিবাহ প্রস্তাব পরিত্যাজ্য।

১৮. বুধবারে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা মানা, এমনকি মরদেহ দাহ করাও নিষেধ।

১৯. কত্তি'র জলে পা ধোওয়া নিষেধ।

www.pathagar.com

২০. যে কুয়ার জলে লোকজন স্নান করে, তার জল পান করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ।

২১. কাঁকড়া নিয়ে খেলা করা নিষেধ। কোন কীট নিয়ে খেলা করলে বজ্রপাত ঘটে।

২২. চলবার সময় সন্তানের গায়ে বিশেষ করে মাথায় পিনন লাগিলে সন্তানের অমঙ্গল হয়।

২৩. সোনা, রূপা, চাল বা প্রধান প্রধান ধন সামগ্রীতে কোনভাবে পায়ের স্পর্শ ঘটলে তৎক্ষণাৎ তা মাথায় স্পর্শ করিয়ে সালাম করতে হয়।

২৪. জলে প্রস্রাব করা নিষেধ।

২৫. তামাক সেবনের পর মুখ ধোয়া নিষেধ।

২৬. পাকা বেগুনের ঘ্রাণ নিলে নাক পঁচে যায়।

২৭. পুরুষ উলঙ্গ হয়ে স্নান করলে বাঘের মুখে প্রাণ হারাতে হয়।

২৮. ভোরে রোদ্র উঠবার পূর্বেই চুলার ছাই ফেলে না দিলে পরে সেই ছাই আর মাটিতে ফেলা যায় না। তা অপর কোন পাত্রে উঠিয়ে রাখতে হয়।

২৯. দ্বিপ্রহরের পর মঞ্চ কিংবা চুলা লেপার কাজ করতে নাই।

৩০. খালে নিয়ে মাটির হাড়ি, ঘর লেপবার 'নাতা' ধোয়া ভাল নয়।

৩১. জ্ঞাতির কেউ যদি নতুন কোন নিয়ম বা কাজ আরম্ভ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই জ্ঞাতির অন্য কারও তৎসদৃশ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য নয়।

৩২. কোন জায়গায় বসবার পূর্বে কিছুটা থুথু প্রক্ষেপ না করলে মার্গদেশ ভারী হয়ে 'পুনখোড়া' রোগে কষ্ট পেতে হয়।

৩৩. প্রথম সন্তানের জন্য দোলনা প্রস্তুত করতে পারা যায়, কিন্তু অনুজাত আর সমুদয় পুত্র কন্যাকে তাতেই দোলাতে হয়। নতুবা নতুন কারও জন্য দোলনা প্রস্তুত করলে, সেই সন্তানের মৃত্যু হয়।

৩৪. খাওয়ার সময় শিশু সন্তানের যদি শ্বাসরোধ ঘটে, তাহলে মা'কে তার সন্তানের মাথায় মৃদু করাঘাত করতে হয়।

৩৫. গ্রামে শুকর জবাই করলে বালক বালিকাদের নাকে, বগলে, কনুই ও জানুতে কাঁচা হলুদ বেটে দেওয়া হয়, নতুবা তারা অপদেবতা হতে ভয় পেতে পারে।

৩৬. সাপ মারলে মাথা ও লেজ মাটিতে পুততে হয় নতুবা ঐ সাপের পুনঃজীবিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

৩৭. যারা বাঘের 'ফুঁ' মন্ত্র জানে বা 'ফুঁ বিদ্যা' জানে তাদের মৃত্যুর পর শবদেহের তালু ও উদরে লোহার পেরেক গেথে দিয়ে অতি দ্রুত শবদেহ দাহ করে ফেলতে হয় নতুবা তারা পুনঃজীবিত হয়ে মানুষ ধরে খায়।

৩৮. স্বপ্নে কোন শিকার করা প্রাণী ভক্ষণ করতে দেখলে অচিরেই মৃত্যু ঘটে।

৩৯. স্বপ্নে বাঘ কর্তৃক আক্রান্ত হচ্ছে এমন কোন দৃশ্য দেখলে অপমানিত হতে হয়।

৪০. স্বপ্নে মাছ পাইতে দেখলে অর্থ প্রাপ্তি ঘটে।

www.pathagar.com

৪১. মৃত লোককে দেখলে পরদিন মাংস খেতে নেই নতুবা অনিষ্ট হয়।

৪২. স্বপ্নে চামনী বা প্রবজ্যা গ্রহণ করতে দেখা ভাল নয়, এমনকি চুল ছাটতে দেখাও অমঙ্গলজনক।

৪৩. স্বপ্নে স্রোতের অনুকূলে নৌকা যেতে দেখা অমঙ্গলজনক, কিন্তু প্রতিকূলে যেতে দেখা মঙ্গলজনক।

৪৪. 'পিড়াভাঙ্গা গোষ্ঠী'র লোকজনেরা মিষ্টি কুমড়ার বীজ বপন করতে পারে না, তার অন্যথা করলে তাদের ক্ষেতে বাঘ আসে এবং উপদ্রব করে।

৪৫. 'কোমরেং' ও 'কাল গোষ্ঠী'র লোকজনের লাউ কুমড়া লাগানোর নিমিত্তে মা-চা দেওয়া নিষেধ।

৪৬. 'নানুকতুয়া গোষ্ঠী'র লোকজনের সেরি, আরি প্রভৃতি তৈরি করা নিষিদ্ধ, এছাড়াও কচু রোপণেও নিষেধাজ্ঞা আছে।

জুম চাষে কিছু ঐতিহ্যগত বাঁধা-নিষেধ

চাকমা ও অন্যান্য আদিবাসীদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন জুম চাষ। সাধারণত মাঝারি উচ্চতার পাহাড়ের ঢালেই জুম চাষ করা হয়। খুব খাড়া বা উঁচু পাহাড়ে জুম চাষ করা হতো না। জুম চাষের মৌসুমে পুরো একটি পরিবার বা পরিবারের একটি অংশকে জুম এলাকায় জুম ঘরের ধান ও অন্যান্য ফসলের বীজ বপন করার সময় থেকে ফসল তোলার সময় পর্যন্ত জুমে থাকতে হয়। সাধারণত গ্রাম থেকে বেশ দূরে জুম চাষ করতে হয় বলে প্রতিদিন পাড়া থেকে গিয়ে জুমে কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই প্রায় ক্ষেত্রে পুরো পাড়াটি সাময়িকভাবে জুম এলাকায় স্থানান্তর হতো। স্নান করা, থালা-বাসন ধোয়া-মোছা ও পানীয় জলের জন্য জুমের কাছাকাছি কয়েকটি, কমপক্ষে একটি ছড়া বা পাহাড়ি ঝর্না থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু খুব উঁচু পাহাড়ে পানির ব্যবহারের এই সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই মাঝারি উচ্চতার ঢালে জুম চাষের এই রীতি প্রচলিত আছে।

জুম চাষে চাকমা সমাজ কিছু বাঁধা-নিষেধ মেনে চলে। অর্থাৎ পাহাড় বা পাহাড়ি জমি মাত্রই জুম চাষের উপযোগী নয়। জুম চাষে চাকমারা যেসব বাঁধা-নিষেধ মেনে চলে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **আআজা :** আআজা (এক 'আ' দিয়ে শব্দের উচ্চারণ সঠিকভাবে করা যায় না বলে আআ) হলো দুই পাহাড়ের মধ্যে (পাহাড় বিভক্তকারী) অথবা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত নিচু, সমতল ও সংকীর্ণ স্যাঁতস্যাঁতে ভূমি। ছড়া বা কোনো স্রোতের পারেও এ ধরনের আআজার সৃষ্টি হতে পারে। এই আআজার কিছু পানি নিয়মিত মাটির সাথে জমাটবদ্ধ হয়ে লাল রং ধারণ করে। স্বাদে এই পানি লোনা। চাকমাদের আরও বিশ্বাস, অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমার সময় ঘিয়ের মতো ঘন এই লাল রঙের পানি বের হয়। হরিণ এবং অন্যান্য বন্য প্রাণীরা দল বেঁধে এই আআজার পানি খেতে আসে। চাকমাদের লোকবিশ্বাস, আআজার পানি খেতে আসা এই বন্যপ্রাণী শিকার করলে শিকারীর অমঙ্গল হয়। এই লোকবিশ্বাসের কল্যাণে বন্যপ্রাণীগুলো শিকারীর হাত থেকে রক্ষা

www.pathagar.com

পেতো। আবার এও অনেকে বিশ্বাস করে যে, কোনো শিকারীর পক্ষেই এই আআজার পানি খেতে আসা বন্যপ্রাণী শিকার করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ বন্দুকের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় অথবা আগ্নেয়াস্ত্রের কোনো গুলি প্রাণীর দেহ ভেদ করতে পারে না।

আআজাতে শিকার করা শুধু শিকারীর জন্যই বারণ নয়। চাকমারা আআজায় বা আআজার সাথে লাগোয়া কোনো পাহাড়েও জুম চাষ করে না। এমনকি এরূপ জমিতে কোনো বসতিও স্থাপন করে না। জুম চাষ কিংবা বাসস্থানের জন্য এরূপ আআজার জমি যে ব্যক্তি ব্যবহার করে সেই ব্যক্তির পরিবারের যে কোনো ব্যক্তি মারা যায় বলে চাকমাদের লোকবিশ্বাস। এমনকি আআজাতে পায়খানা-প্রস্রাব করলে বা থু-থু ফেললে সেই ব্যক্তির কুষ্ঠ রোগ, দাউদ, শ্বেতী ও অন্যান্য মারাত্মক চর্ম রোগ হয় বলে চাকমা সমাজের বিশ্বাস।

২. **দিওধুলোন :** চাকমা ভাষায় 'দিও' অর্থ দেবতা বা ভূত প্রেত জাতীয় অপদেবতা আর 'ধুলোন' অর্থ দোলনা। তাই চাকমা ভাষার 'দিওধুলোন' বলতে ভূতের দোলনা বুঝায়। সমান্তরাল লাইনে দাঁড়ানো দু'টো গাছের ডাল যদি হেলে পড়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে সাধারণত সেখানে লতাগুল্ম জন্মায়। এতে লতাগুল্মের ভারে ডাল দু'টো হেলে পড়ে। তখন সেটা বেঁকে গিয়ে ধনুকের আকার ধারণ করে। এরূপ ধুনক আকারের ঝোঁপ বা ডালপালাকে চাকমা ভাষায় দোলনা বলা হয়। সাধারণত একটি ঝিড়ির (গিরিখাত) দু'পাশে দাঁড়ানো গাছ থেকে ডালপালা হেলে গিয়ে সেখানে দোলনার আকারের যে ঝোঁপ সৃষ্টি হয়, সেটাই প্রকৃত 'দিওধুলোন'। তাই এরূপ পাহাড়ে জুম চাষ নিষিদ্ধ।

৩. **নেলচুমা গাত বা গর্ত :** নেলচুমাগাত হলো পাহাড়ে অথবা সমতল ভূমিতে সৃষ্ট ভূতলগামী গভীর গর্ত। চাকমা ভাষায় নেলচুমা অর্থ হলো মদ চোলাই করার জন্য ব্যবহৃত ভাদি (কেরোসিন/খাবার তেলের খালি টিন যাতে মুলিমাখা ভাত রাখা হয়) এবং কলসি বা পাতিলের মধ্যে সংযোগকারী সোজা বাঁশের চোঙা। চাকমা ভাষায় গাত অর্থ গর্ত এবং চুমা অর্থ বাঁশের চোঙা। গর্তটি সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সোজা নিচে পাহাড় বা ভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। একে মদ চোলাই-এর বাঁশের চোঙার সাথে তুলনা করে 'নেলচুমাগাত' বলা হয়। এসব গর্তের মুখ দিয়ে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে বেশ দূরে গর্তের অপর মুখ দিয়ে বের হয়ে নদী বা পাহাড়ি স্রোতে মিশে যায়। গর্তগুলো সাধারণত ৩০ ফুট থেকে ৭০/৮০ ফুট গভীর হয়ে থাকে। যে পাহাড়ে বা জমিতে এ ধরনের গর্ত থাকে, সেসব পাহাড় বা জমিতে চাকমারা চাষাবাদ বা বসতি পত্তন করে না। তাদের বিশ্বাস 'নেলচুমাগাত' বিশিষ্ট পাহাড় বা জমিতে চাষাবাদ কিংবা বসতি স্থাপন করলে মহামারী আকারে রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব বা ভূমিকম্পের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়ে ব্যাপক আকারে প্রাণহানি ঘটতে পারে।

৪. **মনিচ্ছর আরুক :** মানুষের ছবি বা আকার-আকৃতিকে চাকমা ভাষায় 'মনিচ্ছর আরুক' বলা হয়। কিছু কিছু সোজা পাহাড় দেখা যায়, যেগুলোকে শুয়ে থাকা মানুষের আকৃতির মতো দেখায়। সেসব পাহাড়ে এমন সব অংশ থাকে যেগুলোকে মানুষের এক একটি অঙ্গ যথা : হাত, পা, বুক, মাথা ইত্যাদির মতো দেখায়। পাহাড়ের সব অংশ

www.pathagar.com

মিলে পুরোপুরি শুয়ে থাকা একটি মানুষের আকার/আকৃতি ধারণ করে। চাকমাদের লোকবিশ্বাস এরূপ 'মনিচছর আরুক' পাহাড় বা জায়গায় জুম চাষ করলে জুম চাষী পরিবারের কোনো না কোনো সদস্যের মৃত্যু হতে পারে। তাই এতে জুম চাষ নিষিদ্ধ।

৫. **শুকর দিয়া ভিদা বা ভিটা :** পাহাড়ি অঞ্চলে কিছু সংখ্যক ভিটা বা নিচু পাহাড় আছে যেগুলোতে জুম চাষ করলে ব্যাভিচারের দোষে জুম চাষীকে শুকর (জরিমানা) দিতে হয় বলে চাকমাদের লোকবিশ্বাস। চাকমা ভাষায় 'শুকর দিয়া ভিদা' অর্থ হলো শুকর জরিমানা দিতে হয় এরূপ ভিটা/পাহাড়। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের বাইরে একজন পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যৌন মিলনের ঘটনা প্রমাণিত হলে অথবা অনুরূপ দৈহিক মিলনের ফলে একজন মহিলা গর্ভবতী হলে, চাকমা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী এদের উভয়কে শুকর জরিমানা দিতে হয়। 'শুকর দিয়া ভিদায়' জুম চাষ করলে ব্যাভিচারের অপরাধে শুকর জরিমানা দিতে হয় বলে এতে জুম চাষ নিষিদ্ধ।

৬. **এক মচ্যা ভিদা বা ভিটা :** পাহাড়ি ঝর্না বা পাহাড়ের সংকীর্ণ খাত দ্বারা তিন বা চারদিক বেষ্টিত ভিটা টিলাকে চাকমা ভাষায় 'এক মচ্যা ভিদা' বলা হয়। এরূপ টিলায় জুম চাষ করলে গৃহকর্তা মারা যায় বলে চাকমা সমাজের বিশ্বাস। তাই এ ধরনের টিলায় কেউ জুম চাষ বা অন্য কোনো ফসল চাষ করে না। তবে বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করা যায়। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার অন্তর্গত বন্দুকভাঙ্গা মৌজার লক্ষ্মীছড়ায় এ ধরণের একটি ভিটা/টিলা আছে বলে জানা গেছে।

৭. **বান্দরমারা ও গুইমারা জাগা বা জায়গা :** চাকমা ভাষায় বানরকে বান্দর এবং গুইসাপকে গুই বলা হয়। কোনো পাহাড়কে জুম চাষের জন্য নির্বাচিত করার পর যদি (পাহাড়ের) জঙ্গল কাটার সময় সেখানে মৃত বানর বা মৃত গুইসাপ দেখা যায়, তাহলে সাথে সাথেই জঙ্গল কাটা বন্ধ করে জুম চাষের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। এমনকি পাহাড়ের জঙ্গল কাটার শেষ পর্যায়ে গিয়েও যদি বানর কিংবা গুইসাপের মৃত দেহ পাওয়া যায়, তাহলেও সেখানে আর জুম চাষ করা হয় না। চাকমারা বানর এবং গুইসাপের মৃত দেহকে বড় ধরনের 'ফী' বা বিপদের সংকেত বলে মনে করে থাকে।

৮. **লেজা শামুগর লেজধোক্যা বাঁশ :** যদি কোনো জায়গায় লম্বাকৃতি শামুকের শরীরের পেঁচানো চিহ্ন সদৃশ দাগ বিশিষ্ট (বাঁশের গোড়ায়) বাঁশ পাওয়া যায়, চাকমারা সেই জায়গায় জুম চাষ করে না। বাঁশের গোড়ায় শামুকের শরীরের মতো পেঁচানো চিহ্ন চাকমাদের লোকবিশ্বাসমতে অশনি সংকেত। লম্বা সরু লেজ বিশিষ্ট শামুককে চাকমা ভাষায় 'লেজা শামুগ' বলা হয়।

৯. **পা-আ (ফাঁ) :** চাকমা ভাষায় চুলাকে 'পা-আ' বলা হয়। আবার কেউ কেউ 'পা-আ'কে 'ফাঁ'ও উচ্চারণ করে। একই সমতলে অবস্থিত জায়গায় কাছাকাছি দূরত্বের তিন পাশে তিনটি ভিটা টিলা উপরে উঠে গিয়ে যদি পরস্পর থেকে বেশ দূরে সরে যায়, তাহলে এ তিনটি টিলার মাঝখানে উৎপত্তি স্থলের জায়গা থেকে অনেক বড় একটি ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়। চাকমারা তিনটা ভিটার মাঝখানে সৃষ্ট সেই প্রশস্থ ফাঁকা জায়গাটিকে (space) 'পা-আ' বা চুলা বলে। চাকমাদের লোকবিশ্বাস মতে, এরূপ পা-আ জায়গায় জুম চাষ করা হলে সেই জুমিয়া পরিবারের সদস্যরা মারা যায়। তাই সেখানে জুম চাষ করা হয় না।

www.pathagar.com

১০. হারছাগনী : অতীতে যখন চাকমাদের মধ্যে সাবানের ব্যবহার ছিল না। তখন চাকমা মেয়েরা বাঁশের ছাল দিয়ে বোনা ত্রিকোণাকার একটা ঝুড়িতে ছাই রেখে তার উপর পানি ঢালতো। ঠাসবুনন সেই ঝুড়ির সূঁচালো তলা চুইয়ে পানিটি ঝুড়ির নিচে রাখা একটি পাত্রে জমা হয়। চাকমারা ছাই ধোয়া সেই পানিটিকে 'হার' বলে। প্রকৃত অর্থে সেই পানিটি হলো 'ক্ষার'। চাকমারা ক্ষার কথাটিকে বিকৃত করে 'হার' উচ্চারণ করে। চাকমা মেয়েরা অতীতে এই হার বা ক্ষার দিয়ে চুল ও মাথা পরিস্কার করতো। যে ত্রিকোণাকার ঝুড়ি থেকে চুইয়ে 'হার' বা ক্ষার তৈরি হয় সেই ঝুড়িটিকে চাকমা ভাষায় 'পাক্কোন' বলা হয়। এই পাক্কোনের তলাটি একদম সুঁচালো অথচ এর তিন পাশ একদম খোলামেলা।

চাকমাদের লোকবিশ্বাস মতে, বাঁশের পাতলা ছাল দিয়ে তৈরি পাক্কোন বা হার ছাগনী (ছাক্‌নি) আকৃতির পাহাড়ে কোন একটি দোষ থাকে। তাই এরূপ পাহাড়ে জুম চাষ করা হয় না। এখানে 'দোষ' বলতে কোনো অশুভ শক্তি বা অপদেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়ে থাকে, যে শক্তি বা অপদেবতা জুমিয়ার ক্ষতিসাধন করতে পারে।

১১. কামাত দোগান : চাকমা ভাষায় কামা'র দোকানকে 'কামাত দোগান' উচ্চারণ করা হয়। দু'টো উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত ঢালু বা সমতল জায়গাকে চাকমা ভাষায় 'কামাত দোগান' (কামা'র দোকান) বলা হয়। কথিত আছে যে, অমাবশ্যা বা পুর্ণিমার রাতে এরূপ জায়গায় কামারের দোকানের মতো দা, কোদাল, কুড়াল পেটানোর টিং-টাং, ঢিং-ঢাং শব্দের মতো শব্দ শোনা গেলে এসব কামাত দোগানে জুমচাষ করলেও জুমচাষীর অমঙ্গল হয় বলে চাকমাদের বিশ্বাস।

১২. পাগল ও ফারাঙীবলা গ্যরেয়া জাগা বা জায়গা : যেখানে পাগলের মৃত দেহ ও কুষ্ঠরোগীকে কবর দেয়া হয়, সেখানে জুম চাষ বা বসতি স্থাপন করা অমঙ্গলজনক। চাকমারা মৃত দেহ দাহ করলেও পাগল বা কুষ্ঠরোগীর মৃত দেহকে কবর দেয়। কারণ তাদের বিশ্বাস পাগল বা কুষ্ঠরোগীর মৃত দেহ দাহ করলে রোগীর রোগ জীবাণু বাতাসের দ্বারা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে রোগ বিস্তার ঘটায়। রোগ বিস্তার বা সংক্রমণের আশঙ্কা থাকায় পাগল ও কুষ্ঠরোগীর কবর স্থানে চাকমারা জুম চাষ করে না চাকমা ভাষায় কুষ্ঠরোগকে 'ফারাঙী' এবং কবরস্থানকে 'গ্যরেয়া জাগা' বলা হয়।

১৩. পুরীখোলা : চাকমা ভাষায় পরিকে পুরী এবং পরি থাকার জায়গা বা বাসস্থানকে 'খোলা' বলা হয়। চাকমাদের লোকবিশ্বাস, পরিরাও মানুষের মতো পাড়া বা গ্রাম বেঁধে একত্রে বসবাস করে। তাই পরিদের এসব বাসস্থানে বা গ্রামে জুম চাষ কিংবা জনবসতি গড়ে তোলা যায় না। তাদের বাসস্থানে জুম চাষ কিংবা জনবসতি গড়ে তুললে পরিরা অসন্তুষ্ট হয় এবং তারা মানুষকে নানাভাবে রাত্রি বেলায় উপদ্রব ও ক্ষতি করবে বলে সতর্ক করে দেয়। এমনকি ঘুমের সময় মানুষকে দুঃস্বপ্নও দেখায়। এ ধরনের সতর্কতা জারি করা সত্বেও তাদের গ্রাম বা পাড়া থেকে সরে না গেলে পাড়ার লোকেরা নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। আবার কোথাও কোথাও পাড়ায় মহামারী আকারে রোগ দেখা দিতে পারে।

www.pathagar.com

১৪. **গাত বা গর্ত :** চাকমা ভাষায় গুহাকে 'গাত' বা 'গর্ত' বলা হয়। সাধারণত গিরিখাত বা ঝিড়ির দু' পাশের পাহাড়ে এরূপ গুহা দেখা যায়। চাকমাদের মতে, গাত বা গুহা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন : চুমোচুমী গাত, নাগফলা গাত, তারা পজ্যা গাত, ভেইবোন (ভাইবোন) গাত বা জোড়া গাত ইত্যাদি। যে গুহায় লাল বাদুর থাকে সেই গুহায় দেবতা থাকে বলে চাকমারা বিশ্বাস করে। সাধারণত যে গর্ত পাহাড় থেকে সোজা নিচের দিকে চলে গেছে এই পাহাড়ে জুম চাষ করা নিষিদ্ধ। তবে বৈদ্যগণ দেবতার উদ্দেশ্যে মোরগ, ছাগল ইত্যাদি বলি দিয়ে কোনো কোনো গাতের দোষ তাড়ানো যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। এভাবে দোষ তাড়ানোকে চাকমা ভাষায় 'দারুকুবা' বলা হয়। বৈদ্যের দ্বারা এভাবে 'দারুকুবা' গর্তযুক্ত পাহাড়ে জুম করারও নিয়ম আছে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের লোকসংস্কার

১. ঘরের উঠানে, ঘরের চালের সাথে সংযুক্ত বা যাতায়াতের পথে কাপড় শুকানোর বাঁশ কিংবা দড়ি টাঙানো থাকলে তার নিচ দিয়ে যাতায়াত করা অশুভ।

২. ঘরের ভিতরে পাদুকা অর্থাৎ জুতা সেন্ডেল পায়ে দিয়ে প্রবেশ করা গৃহস্থের অমঙ্গল বলে কথিত রয়েছে।

৩. ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় পা আছড়ানো বা পা ঝাড়া দেয়া গিরস্থের অমঙ্গল বলে কথিত রয়েছে।

৪. ঘর ঝাড়ু দেয়ার পর দরজায় ঝাড়ু আছড়ানো উচিত নয়। এরকম করলে সে ঘরে অলক্ষ্মী বাস করে।

৫. যে নারী ঘরের দরজায় চুল আচড়াতে থাকে বা রূপচর্চা করে শাস্ত্রমতে সে নারী অপয়া।

৬. চালের শন, বেড়ার তর্জা খুলে যে রমণী চুলার আগুন জ্বালে সে রমণী চির দুঃখিনী হয়।

৭. পা হেঁচড়াইয়া হাঁটা কুলক্ষণ ও শনির দৃষ্টি পড়ে।

৮. ঘুম থেকে উঠার পর যে রমণী হাত মুখ না ধুয়ে খাদ্য দ্রব্যের উপর হাত দেয় শাস্ত্রমতে সে রমণী কুলক্ষণা ও অলক্ষ্মী হিসেবে গণ্য।

৯. পিড়ায় বসে ভাতের থাল নিচে রেখে বা পায়ের উপর ভাতের থাল রেখে ভাত খেলে সে ঘরে লক্ষ্মী থাকে না।

১০. ভাত খাওয়ার সময় তর্জনী আঙ্গুল উঁচু করে মুখে ভাত দেয়া, জিহ্বা বের করে খাওয়া, চট্‌চট্‌ শব্দ করে খাওয়া এবং পা সামনে টেনে খাওয়া কুচরিত্র স্বভাব বটে তার দুঃখ চিরকাল।

১১. ঘরের চুলার আগুন অন্য জনকে একাধিকবার দেয়া অবিধেয়।

১২. রান্নার পর চুলার ছাই মগা সাসন্যা অর্থাৎ সন্ধ্যায় যে নারী ফেলে দেয় সে নারী কুলক্ষণা।

www.pathagar.com

১৩. ঘরের খাম বা বেড়ার উপরে দা দিয়ে দাগ কাটলে গৃহকর্তা ঋণগ্রস্থ হয়।

১৪. পুড়ে যাওয়া ঘরের খাম (ঠুনি) পুনরায় নতুন ঘরের খাম হিসেবে ব্যবহার করা অকল্যাণ কর।

১৫. দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী (কিচিং অর্থাৎ গিরিপথ) স্থানে, ছড়া বা ঝিড়ির শেষ প্রান্তে, পরিত্যক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর, শ্মশানের উপর, মৃত পাগল কুকুর পুঁতে রাখা স্থানে, পুঁতে রাখা বা পূর্বে পশু মরা স্থানে, পানি চলাচল করে এমন সুড়ঙ্গে উপর, নাগাঘিলু অর্থাৎ যেখান থেকে লাল রঙের ফেনা বা সারাক্ষণ গলিত পানি নির্গত হয় ওসব স্থানে ঘর নির্মাণ করলে রোগ শোক অপমৃত্যু হয় বলে কথিত রয়েছে।

১৬. গুরু স্থানীয় এমন স্ববংশের বয়োজ্যেষ্ঠ জনের ঘরের সম্মুখে কনিষ্ঠ জনের ঘর নির্মাণ করে অবস্থান করা কোন প্রকারেই উচিৎ নয়। এতে রোগ শোক এবং অপমৃত্যু অনিবার্য।

১৭. ঘরের চালের উপর মোরগ উড়ে গিয়ে ডাক দিলে শুভ হয়। আবার কাহারও অশুভ হয়।

১৮. ঘরের মুরগি নরম ডিম পাড়লে অমঙ্গলের পূর্বাভাস। এক্ষেত্রে সবার অজ্ঞাতে মুরগি জবাই করে খেতে হবে। কলাগাছের পেট ফেটে থোড় বের হলে গিরস্থের অমঙ্গল বলে কথিত রয়েছে।

১৯. ঘরের চালের উপর চিল পেঁচা বসলে অমঙ্গল ঘটে। তবে গৃহকর্তা নিজে না দেখে অন্য কেউ জানিয়ে দিলে অমঙ্গল হয় না।

২০. পানি ভর্তি কলসি কোলে তোলার সময় অথবা কোল থেকে হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়া অমঙ্গলের হেতু। এক্ষেত্রে সে রমণীকে আপাদমস্তক পানিতে ডুব দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলে দশা মুক্ত হয়।

২১. স্নান করার পর সে ভিজা কাপড়ের পানি দিয়ে পা ধুয়ে ফেলা অমঙ্গল।

২২. নদীতে, ছড়ায়, গর্তে পায়খানা প্রস্রাব করা খুবই অনুচিত।

২৩. পরের ঘরের চালের পানি নিজের ঘরের চালে পরা অমঙ্গল।

২৪. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারো যদি ঘরের বাহিরে মৃত্যু হয় তা হলে সে মৃত ব্যক্তিকে ঘরের ভিতর ঢুকানো উচিৎ নয়, তাকে উঠানে রাখতে হয়।

২৫. যদি একজন কথা বলার সময় অন্য জন কথা কেড়ে নিয়ে কথা বলে তাহলে জেনে রাখা ভাল যে সে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং তাদের বংশ বিশ্বাসঘাতক।

২৬. যে সন্তান বৃদ্ধ পিতাকে বাবা বলে ডাকে না বুজ্যা (বুড়া) ডাকে, বৃদ্ধা মাকে মা ডাকে না বুড়ি ডাকে সে সন্তানের জীবন খুবই কলংকময় হয় এবং সেও তার সন্তানের কাছে অবিশ্বাসী হয়।

২৭. ভাত খাওয়ার সময় পরের মন্দ সমালোচনা করলে নিজের অন্তরে পাপ জমা করা হয়।

www.pathagar.com

২৷ . পুরুষ ব্যক্তি জীবনে একবার শ্রমণ হবার নিয়ম আছে। শ্রমণ না হলে তার মৃতদেহ আগুনে পোড়ার নিয়ম নেই।

২ . বৃদ্ধ পিতা মাতাকে শ্রদ্ধার সাথে যে সন্তান সেবা যত্ন করে সে চারি প্রকার অপায় থেকে মুক্ত হয়।

৩ . কাক চিলের পায়খানার মল গায়ে পড়লে সরাসরি ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়। ঘরের বাইরে কাপড় চোপড়সহ স্নান করে তবে গৃহে প্রবেশ করা উচিৎ।

·।ংখোয়াদের লোকসংস্কার

১. লাউ,শসা, মিষ্টি কুমড়া ও চাল কুমড়া বা লতা জাতীয় ফল মা গর্ভবতী কালীন অবস্থায় খাওয়ানো যাবে না, কারণ বাচ্চা যদি পুত্র সন্তান হয় বড় হয়ে শিকার করার সময় তার পায়ে লতা পেচাবে এই ভয়ে পাংখোয়া গর্ভবতী মায়েরা কোন লতা জাতীয় ফল খায় না।

মা গর্ভবতী থাকাকালীন অবস্থায় বেগুন তরকারি খেতে মানা করা হয় কারণ যদি বেগুন খায় তাহলে বাচ্চাটির মুখে দাগ হয়। আনারস ও খেতে দেয়া হয় না আনারসের মতো চুল কোকড়ানো হবে বলে। কলার থোর গর্ভবতী মাকে কলার থোর খাওয়ালে বাচ্চাটির মাথা লম্বা হয়। ডিমও খেতে দেয়া হয় না কারণ বাচ্চার মাথা গোল হয় বলে তাদের বিশ্বাস।

তথ্যনির্দেশ

১. খিয়াং, চাকমা. বম. পাংখো, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন, প্রমোশন অব ডেভেলপমেন্ট অব ইন্ডিজিনিয়াস রাইটস্ (পিপিআইআর) প্রকল্পের গবেষণা গ্রন্থনা, গ্রন্থস্বত্ব : কপো সেবা সংঘ, আদালত সড়ক, বনরূপা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। সহযোগী সংস্থা *'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশান'* ঢাকা। গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : অ্যাডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা. অ্যাডভোকেট প্রতীম রায়, সাংবাদিক শৈলেন দে

২. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, প্রকাশক- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, প্রকাশ কাল- ২০০০

৩. সংক্ষিপ্ত আত্ম জীবনী ও চাকমা সমাজ ব্যবস্থা, ডা : প্রমোদ বিকাশ তালুকদার, প্রকাশ কাল- ১৯৯৯

৪. চাকমা জাতির সমাজ ব্যবস্থা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা হেডম্যান সমিতি,

৫. বাংলাদেশের ত্রিপুরা জাতি, বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ, প্রকাশ কাল- ২০০১

৬. মি্ কুলিন মিত্র চাকমা, হেডম্যান, ৩নং লংগদু, লংগদু, রাঙ্গামাটি

৭. মি. দীপেন দেওয়ান (টিটু), হেডম্যান, ১৫৮নং মাউদুং মৌজা, বরকল, রাঙ্গামাটি

৮. মি রূপায়ন চাকমা, উন্নয়ন কর্মী, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি

৯. মি. চুইমিং থাঙ্গা পাংখোয়া, হেডম্যান, ১৬৮নং কংলাক মৌজা, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি

www.pathagar.com

১০. মি. রণেন্দুবিকাশ চাকমা, প্রধান শিক্ষক, শিলছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জুরাছড়ি
১১. মি. দিল বাহাদূর রায়, সংস্কৃতি কর্মী ও ঠিকাদার, রাঙ্গামাটি
১২. অ্যাড. সুস্মিতা চাকমা, সহ সভাপতি, সচেতন নাগরিক কমিটি, টিআবি, রাঙ্গামাটি
১৩. মি. ইন্দ্রনাথ চাকমা, প্রশাসনকি কর্মকর্তা, আশ্রয় অঙ্গন, রাঙ্গামাটি
১৪. মি. অর্ণব চাকমা, ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিডি প্রকল্প, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
১৫. মি. পলাশ খীসা, মনিটরিং অফিসার, শিক্ষা প্রকল্প, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
১৬. মি.নির্মলেন্দু ত্রিপুরা, প্রাক্তন উপ আঞ্চলিক পরিচালক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
১৭. তরুণ খিয়াং, উন্নয়ন কর্মী, রাজস্থলী
১৮. মিজ. নুকু চাকমা, প্রোগ্রাম অফিসার, এআরএ ডি প্রজেক্ট, সিআইপিডি, রাঙ্গামাটি

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

১. বেইন বা কোমর তাঁত : উপমহাদেশীয় সংস্কৃতিতে বোড়ো এবং তিব্বতী-বর্মী মানবগোষ্ঠির বিরাট অবদান এই কোমর তাঁত। গৌরবের বিষয় পার্বত্য এলাকার মেয়েরা সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে পেরেছে। 'আলাম' 'খাদি' ও 'পিনন' বুননে বিচিত্র নক্শার সমাহার লক্ষ করা যায়। বয়ন প্রণালী এক হলেও প্রতিটি জাতিসত্তার নক্শা ভিন্ন।

২. দাবা : দাবা বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। বাড়িতে কোন প্রবীণ অতিথি এলে প্রথমে দাবা ও পানি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। দাবাতে পরিমাণমত পানি দিয়ে ধূমপান করা হয়। এই পানি কয়েকদিন পর পর ফেলে দিয়ে নতুন পরিষ্কার পানি দেওয়া হয়। অনেকেই বলে ধূমপান ক্ষতিকর হলেও দাবা দিয়ে ধূমপান করলে নিকোটিনের বিষ অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়। দাবা দিয়ে ধূমপান করতে হলে তিনটি জিনিস প্রয়োজন : ধুন্দ, হলগি ও দাবা।

বেইন বা কোমর তাঁত

www.pathagar.com

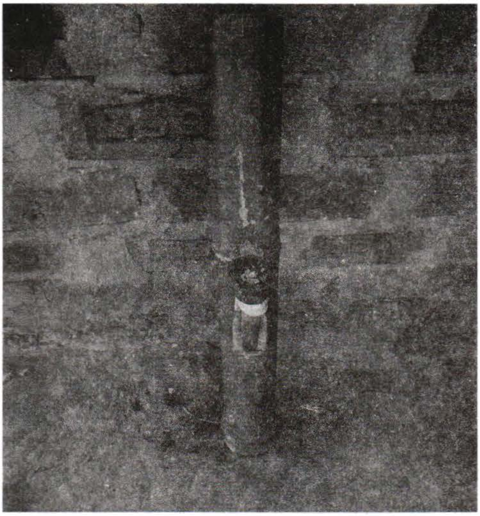

দাবা বা হুক্কা

২. শিকারের লোকপ্রযুক্তি

ক. **কাবুক :** 'কাবুক' তৈরি হয় সুঁচালো বাঁশ দিয়ে। দড়ি ও কঞ্চি দিয়ে শিকারের যাতায়াত পথে এমনভাবে বসানো হয়, দড়িতে টান পড়লে বাঁশের অগ্রভাগ শিকারের বুকে বিঁধে যায়।

খ. **ইদি :** 'ইদি'তে ব্যবহার হয় দড়ির ফাঁস।

গ. **বাদোল :** ধনুকাকৃতি 'বাদোল' প্রত্যেকের হাতে থাকে। তীরের বদলে এতে মাটির তৈরি গুলতি ব্যবহার করা হয়।

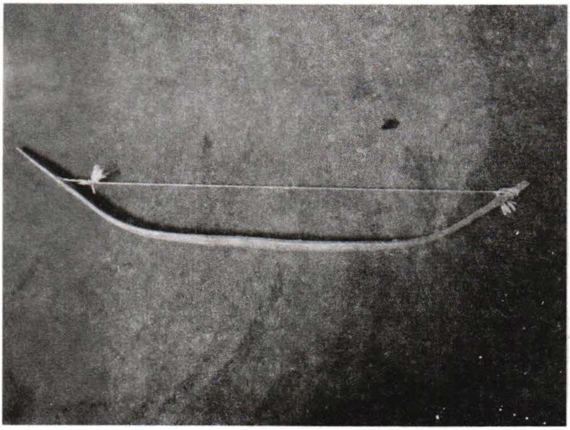

বাদোল বা ধনুক

www.pathagar.com

ঘ. ফুঁ বাঁশ : আর এক হাতিয়ার আছে ফুঁ বাঁশ। পালক লাগনো তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা ফাঁপা বাঁশে ভরে ফুঁ দিয়ে শিকারের উপর নিক্ষেপ করা হয়।

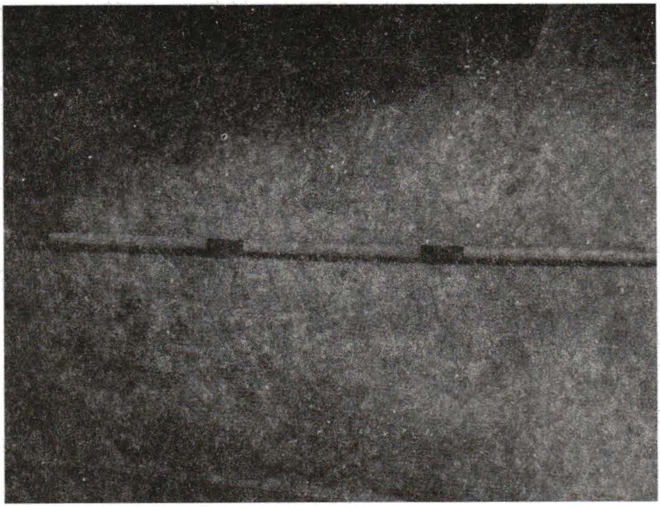

৩. মাছ ধরার লোকপ্রযুক্তি

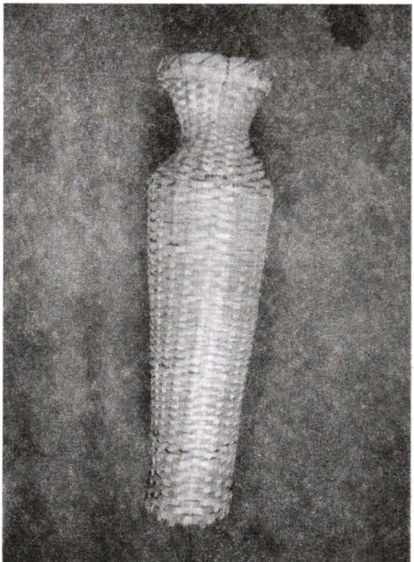

দুব (মাছ ধরার)

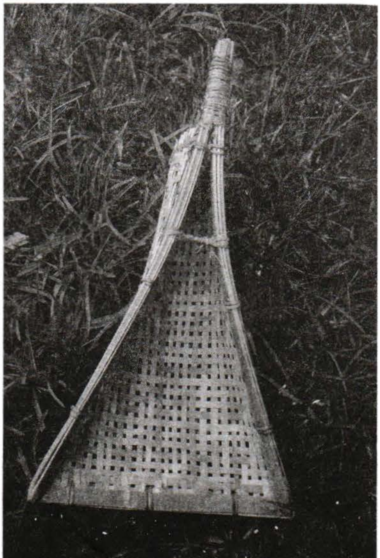

লুই (মাছ ধরার ফাঁদ)

www.pathagar.com

৪. অন্যান্য লোকপ্রযুক্তি

ঢেঁঙি বা ঢেঁকি

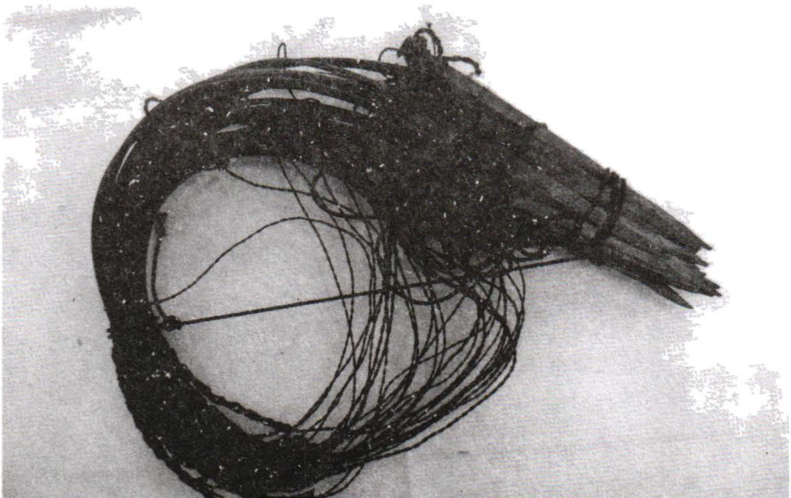

জামিছরা (মোরগ ধরার ফাঁদ)

www.pathagar.com

জুম চাষ

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সাথে জুম চাষ ঐতিহাসিকভাবে জড়িত। জুম শব্দটি বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বোঝানোর জন্য এক প্রতীক শব্দে পরিণত হয়েছে। জুম শব্দটি এ এলাকার গান, কবিতা ও নাটকে প্রতিফলিত। জুম চাষ কী সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা দরকার। জুম চাষ হচ্ছে এক ধরনের কৃষি পদ্ধতি যা পাহাড়ের ধাপে ধাপে করা হয়। এই পদ্ধতিতে ধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন শস্যজাত দ্রব্য চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার হয় না। এ চাষ পদ্ধতির মধ্যেই স্বয়ংক্রিয় জৈব সার উৎপাদন প্রক্রিয়া নিহিত আছে। এ চাষ পদ্ধতি এশিয়ার কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার, ফিলিপিন, চীন, থাইল্যান্ড, ভারতের নর্থইস্ট এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে। এ পদ্ধতি প্রায় কয়েকশ বছরের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। জুম নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। কারো কারো মতে এটি সম্পূর্ণ এক অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কারো কারো কাছে এটি পরিবেশের ক্ষতিকারক।

যারা জুম চাষ করেন তাদের অভিমত হচ্ছে সঠিক তথ্যের অভাবে এটি পরিবেশের ক্ষতিকারক হিসেবে প্রচার পেয়েছে। সম্প্রতি জুম নিয়ে নেপালভিত্তিক সংগঠন, 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভলপমেন্টে'র এক গবেষকের ধারণা যে জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে না বরং দেখা গেছে এ চাষাবাদ পদ্ধতির খারাপ দিকের চাইতে ভালো দিকই বেশি। বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল এটিকে পরিবেশ বিধ্বংসী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিভিন্ন গবেষণার তথ্য উপাত্ত থেকে এটুকু বোঝা যায়, শীতের পর প্রথম বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে (মার্চ মাসে) জুমের আগাছা পরিষ্কার করা হয় ও আগুন দেওয়া হয়। অনেকে কিন্তু মনে করে এটি বন বিধ্বংসী ও মাটির উর্ব্বরতা নষ্টকারী। আসল ব্যাপার হলো প্রাকৃতিক উপায়ে জমির উর্ব্বরতা বাড়ানোর জন্য জুমের ফসল কাটার পর ঐ জমি পাঁচ থেকে সাত বছর ফেলে রাখতে হয়। এই জুম ভূমিকে চাকমা ভাষায় 'রাণ্যা' বলে। এই রাণ্যাতে কিন্তু কিছু ফসল ও সব্জি থাকে। যা মাটির নাইট্রোজেন চক্র ও ব্যাকটেরিয়া বাড়াতে সাহায্য করে। আর জুম যেহেতু পাহাড়ের ধাপে ধাপে করা হয় মাটির উর্ব্বরতা বুঝে সেহেতু জুমের মাটির গুণাগুণও ভালো থাকে। পাহাড়ের ধাপের বিভিন্ন ঢালে বিভিন্নভাবে সূর্যের আলো পড়ে যা সমতল থেকে ভিন্ন। সমতল ভূমিতে সূর্যের আলো সব জায়গাতে প্রায় সমানভাবে পড়ে। কিন্তু পাহাড়ি জমিতে বিভিন্নধাপে সূর্যরশ্মি পড়ার কারণে মাটিতে ব্যাকটেরিয়া উৎপাদন বা বায়োমাস প্রক্রিয়া বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন রকম। পার্বত্য এলাকার জুমচাষীরা স্মরণাতীত কাল থেকে এ জ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে তারা বোঝেন কোথায় কোন সব্জি ভালো ফলে। অপেক্ষাকৃত কম সূর্যের আলো যেখানে পড়ে সেখানে কী লাগাতে হবে আর সূর্যের আলো যেখানে তীব্রভাবে পরে সেখানে কী ফলবে

www.pathagar.com

এ বিষয়টা কৃষিবিজ্ঞানী ও জুম চাষ সম্পর্কে যারা ধারণা রাখেন তাদের গবেষণার বিষয়। জুমের আরো একটা ভালো বিষয় হচ্ছে বৃষ্টিপাতের ধরনের উপর নির্ভর করে ফসল রোপণ। সেজন্য অনেক কম জায়গাতেও বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন সময়ে উৎপাদন হয়। বৃষ্টির মওসুম শেষের দিকে (অক্টোবর) স্বল্পমেয়াদী ফসলের চাষ হয়। সচরাচর জুমে তিনধাপে ফসল হয়, যেমন–স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী। স্বল্পমেয়াদী ফসলের মধ্যে, ভূট্টা, যব, তিল, মারফা ইত্যাদি। মধ্যমেয়াদী ফসলের মধ্যে কলা, আদা, হলুদ ইত্যাদি। দীর্ঘমেয়াদী ফসলের মধ্যে গামার, তুলা, কড়ই ইত্যাদি। জুমে যাতে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে না হয় সেজন্য জুমচাষীরা জুমের ফসলের ফাকে ফাকে এক ধরনের রার গাদা ও মোরগঝুটি লাগিয়ে থাকেন। এই ফুল কীট বিতাড়ক ও মাটির নাইট্রোজেন উৎপাদক। জুম চাষ কেবল বৈচিত্র্যময় ফসলেরই জন্মদাতা না, এ পদ্ধতি পরিবেশবান্ধবও। Water Aid এক গবেষণায় দেখা গেছে জুম চাষ কমে যাওয়ার কারণে বর্তমানে পাহাড়ি ঝর্না ও নদীর উৎস শুকিয়ে যাচ্ছে যা পরিবেশের ক্ষতিকারক। জুম যেমন একদিকে মাটির ক্ষয়রোধ করে, তেমনি পাহাড়ি ছড়া ও পানির উৎসও ধরে রাখে। আগে জুমের দীর্ঘমেয়াদী ফসলের মধ্যে ফলজ ও তুলাজাতীয় বৃক্ষরোপণ হতো। এ ধরনের বৃক্ষ মাটিতে পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে। বান্দরবানের থানছি এলাকার গহনি অরণ্যে এখনও কিছু কিছু বৃক্ষ পাওয়া যায় যারা পানি ধরে রাখে। এ গাছের লাল লাল পাকা ফলও খুব সুস্বাদু। আগে জুমিয়ারা পাহাড়ে পানির উৎস খুঁজে পেত এ গাছ দেখে। বর্তমানে জুমচাষ যেহেতু ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এ ধরনের বৃক্ষের অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন। সেইসাথে পাহাড়ি নদী ও ঝর্নার অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন এবং পানি ও জুমের উপর নির্ভরশীল জীববৈচিত্র্যও হুমকির সম্মুখীন। জুমের আরও একটা ভালো দিক হচ্ছে মৌজা প্রধানের অধীনে গ্রামের জুমিয়াদের নিত্য ব্যবহারের ভিলেজ কমন ফরেষ্ট ছিল। সে কারণে পরিত্যক্ত জুমে যে বনভূমি হত সে বনভূমিতে হাত দেওয়ার প্রযোজনই পড়ত না। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রসারণের কারণে এই ভিলেজ কমন ফরেষ্ট যেমন হারিয়ে যাচ্ছে তেমনি প্রাকৃতিক বনভূমি ও জীববৈচিত্র্যও হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে মনোকালচার বা শুধু একই ধরনের বৃক্ষরোপণের কারণে এ এলাকার জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। আগে জুমের কারণে সৃষ্ট হওয়া বনে অনেক ধরনের বৃক্ষ ছিল, আর এ বৃক্ষরাই পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের বিশুদ্ধ অক্সিজেনের উৎস।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জীবনের সাথে জুম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জুম নিয়ে অনেক গান, কবিতা ও নাটক আছে। আবার কিছু সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানও আছে যেমন– থানমানা, মালেইয়া, গঙ্গাপূজা ও হাল পালনি ইত্যাদি। এসব আচার-অনুষ্ঠান মূলত জুম ও প্রকৃতি নিয়ে। জুমচাষের জ্ঞান কিন্তু পাহাড়ি নারীদের দ্বারা বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে। তাই জুমের গান ও নাটকে নারীর প্রাধান্য দেখা যায়। যতদিন পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজে জুম নির্ভর অর্থনীতি ছিল, ততদিন কিন্তু সমাজে নারীর সমাজে মর্যাদা ভার ছিল। একসময় চাকমা সমাজে কন্যার পিতাকে 'দাভা' বা যৌতুক দিতে হতো। সময়ের আবর্তে এখন এ বিষয়টি শুধু ইতিহাস। এখন এ প্রথাও নেই, নারীদের সে মর্যাদাও নেই। এখন আরো ফিরে আসি জুমের আরও অন্যান্য বিষয়ে। জুমের সাথে সামাজিক সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ প্রথা

www.pathagar.com

পাহাড়ি সমাজে এক কথায় 'মালেইয়া' নামে পরিচিত। মালেইয়া মানে হচ্ছে সবাই মিলে কাউকে সহযোগিতা করা। এ শব্দটির ভিতরে সামাজিক সহমর্মিতার বাণী মানে ধনি গরিব ভেদাভেদের মর্মার্থ লুকিয়ে আছে। ধরা যাক কোন এক গরিব চাষী অনেকদূরের পাহাড়ে জুম কেটেছে। এখন আর তারপক্ষে একা ফসল তোলা সম্ভব নয়। আবার দিনে দিনে ফসল না তুলতে পারলে বন্য শুকর খেয়ে ফেলতে পারে সবকিছু। তাই একদিন দিনক্ষণ দেখে পাড়াবাসীদের সবাইকে দাওয়াত দিয়ে আসে। পাড়াবাসীরা সবাই সে নির্দিষ্ট দিনে জুমের কাছে 'ভাত মজা' মানে গরমভাত কলাপাতায় পুটলী বেঁধে নিয়ে আসে। সকলের মিলিত প্রয়াসে জুম কাটা হয়, ফসল তোলা হয় ও দুপুরে জুমের সব্জি ও কাছের ছড়া থেকে মাছ ধরে সবাই মিলে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করে। এ পুরো প্রক্রিয়াটা মালেইয়া নামে পরিচিত। পাহাড়ি সমাজে এ মালেইয়া প্রথা হারিয়ে যাচ্ছে জুম ভূমি কমে যাওয়া এবং সমতল থেকে মানুষ নিয়ে এসে এ এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ানোর কারণে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা এক ভয়াবহ বিষয়। এই বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষমতাধর রাষ্ট্র বিভিন্ন সমাধানের বিষয় তুলে ধরছে। যেমন– উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন প্রক্রিয়া জোরকরা ও বৃক্ষরোপণ করা। এখন সময় এসেছে এই প্রাকৃতিক চাষাবাদ পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখা ও এ প্রাকৃতিক জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সেই সাথে এ পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বৃহত্তর আগ্রাসন থেকে টিকিয়ে রাখা।

সাগা

কোনো অনাবাদী খাস জমি জুম চাষের জন্য নির্বাচন করে বাঁশের চেলি/চেরাই অংশ আড়াআড়িভাবে বাঁশের আগায় স্থাপন করে সেই বাঁশ মাটিতে পুঁতে যে চিহ্ন দেয়া হয়, তাকে চাকমা ভাষায় 'সাগা' বলে। কোনো পাহাড়ের অনাবাদী অংশে এরূপ 'সাগা' দেখে পাড়ার সবাই বুঝতে পারে যে, কেউ একজন জুম চাষের জন্য এ জমি নির্বাচন করেছে। 'সাগা' বা চিহ্ন দেয়ার ফলে ঐ পাহাড়ের নির্ধারিত অংশে জুম চাষ করার অধিকার (অন্তত সেই বছর) একমাত্র সেই ব্যক্তি অর্জন করে। অন্য কোনো ব্যক্তি সেই জমিতে ঐ বছর জুম চাষ করতে পারবে না। এটা ভূমির উপর চাকমাদের একটি ঐতিহ্যগত অধিকার।

ব্যাখ্যা : কোনো অনাবাদী পাহাড়ের খাস অংশে এরূপ কোনো 'সাগা' পাওয়া গেলে বুঝে নিতে হবে যে, চিহ্নিত ঐ জমি বা জমি খণ্ডে জুম চাষ বা অন্য কোনো ফসল উৎপাদনের নিমিত্তে কোনো এক ব্যক্তি নির্বাচন করেছে। তাই সেই জমি ভোগ বা ব্যবহারের অগ্রাধিকার ঐ ব্যক্তিরই প্রাপ্য। অন্য কোনো ব্যক্তি তার এই অধিকার খর্ব করতে পারবে না। স্মরণাতীত কাল থেকেই পাহাড়ি বাসিন্দারা বিশেষত জুমিয়ারা এই ঐতিহ্যগত অধিকার মেনে আসছে। সাগার এই গুরুত্ব প্রধানত জুম চাষের বেলায় প্রযোজ্য হলেও সেই নির্বাচিত জমিতে স্থিত প্রাকৃতিক সম্পদ যথা : গৃহ নির্মাণের গাছ, বাঁশ, শন, বেত, মৌচাক (প্রাকৃতিক), দুর্লভ পাখির ছানা ইত্যাদির উপরও সেই সাগাদার ব্যক্তির দাবি অগ্রগণ্য।

ক. 'সাগা' খাস ও বিরোধমুক্ত জমিতে হতে হবে। কারো বন্দোবস্ত জমিতে 'সাগা' দিলে তাতে সাগাদারের অধিকার বর্তাবে না।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : 'সাগা' বাস্তবে খাস জমিতে দেয়া হয়। কারণ যখন জুম চাষই পাহাড়ি আদিবাসীদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ছিল, তখন জুম চাষের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেয়া বা নেয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং জমির উপর মালিকানা নিয়ে বিরোধের কোনো সুযোগ ছিল না।

খ. 'সাগা' (স্থাপন) লোকের দৃষ্টির সীমানার মধ্যে হতে হবে। পাহাড়ে উঠার জন্য লোকজন সাধারণত পাহাড়ের যে ঢাল বা অংশ বেয়ে আরোহণ করবে পাহাড়ের সেই অংশের পাদদেশে 'সাগা' দিতে হবে। মনোনীত পাহাড়ের দুই-তিন দিক থেকে লোকজন উঠার সুযোগ থাকলে সেই দুই-তিন স্থানে পাহাড়ের পাদদেশে 'সাগা' দিয়ে রাখতে হবে।

গ. প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমির জন্য 'সাগা' দেয়া চলবে না। জুমচাষের জন্য পাহাড়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির জন্য 'সাগা' দিতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি 'সাগা' দিয়ে দখলে রাখা যাবে না।

ঘ. 'সাগা' এক মৌসুমের জন্য কার্যকর থাকবে। একটি নির্দিষ্ট বছর বা 'সাগা' চিহ্ন দেবার বছরে জুমচাষের/ভোগদখলের জন্য কার্যকরও বলবৎ থাকবে। যেই বছর জমিতে 'সাগা' দেয়া হবে সে বছর জুম চাষ করতে না পারলে পরের বছর জুম চাষ করতে চাইলে তাকে সেই বছর আবার 'সাগা' দিতে হবে। তবে তার আগে অন্য কেউ 'সাগা' দিলে তার দাবি অগ্রাধিকার পাবে।

ঙ. একাধিক ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট জমি/পাহাড়ে একই সময়ে 'সাগা' দিলে প্রথম ব্যক্তির (সাগাদার) দাবি অগ্রাধিকার লাভ করবে।

চ. 'সাগা' দেয়া জমিতে (জুম) চাষ করতে না পারলে 'সাগা' প্রত্যাহার করে নিতে হবে। সাগাদার যদি 'সাগা' দেয়া জমিতে সেই বছর জুম চাষ করতে না পারে বা ঐ জমিতে জুমচাষ করার ইচ্ছা পরিবর্তন করে, তাহলে পাড়ার কার্বারীকে জানিয়ে বা কোনো প্রতিবেশীর অনুকূলে তা ছেড়ে দিয়ে 'সাগা' প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

রান্যার উপর (ভূমি) অধিকার : পাহাড়ে কিংবা পাহাড়ের একটা খণ্ডে একবার জুমচাষ করলে পরবর্তী ৮/১০ বছর পর্যন্ত সেখানে আর জুমচাষ করা যায় না। একবার জুমচাষ করার পর সেই পাহাড়ি জমি পরবর্তী ৮/১০ বছর পর্যন্ত পতিত থাকে। জুমের ফসল তোলা শেষ হয়ে গেলে জমিটি খালি পড়ে থাকে। এই খালি বা পরিত্যক্ত জমিকে চাকমা ভাষায় 'রান্যা' বলা হয়। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই জমিতে জুমচাষ করেছে পরবর্তী কালেও সেখানে জুম চাষ করার অধিকার সেই ব্যক্তির উপর বর্তায়। এরূপ কোনো জমি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির রান্যা বলে প্রমাণিত হলে তার অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কেউ সেখানে জুমচাষ করতে কিংবা জুম চাষ করার অধিকার দাবি করতে পারে না। এটাও এক প্রকার ভূমি অধিকার।

ব্যাখ্যা : প্রথম জুম আবাদকারী হিসেবে যে ব্যক্তির রান্যার উপর পরবর্তীকালেও জুমচাষ করার অধিকার জন্মে সে প্রথম আবাদ করার সময় অবশ্যই অহল্যা ভূমি (Virgin Land) হতে হবে। কারণ প্রথম আবাদকারীর (জুম চাষকারীর) অনুমতি নিয়ে কোনো রান্যায় অন্য কোনো ব্যক্তি একবার জুম চাষ করলে সেই জমির (রান্যার) উপর তার অধিকার সৃষ্টি হয় না। সেখানে পূর্বের মালিকের রান্যা অধিকার বহাল থাকবে।

www.pathagar.com

জুম

জুম চাষের পাশে সংগ্রাহক তুষার শুভ্র তালুকদার

www.pathagar.com

জুম

তথ্যসহায়ক

১. কৃপা সিন্ধু চাকমা, বাঘাছোলা, বরকল, রাঙ্গামাটি
২. বিলেত্যে চাকমা, সিমুত্যাছড়া, রাঙ্গামাটি
৩. মিজ, নুকু চাকমা, প্রোগ্রাম অফিসার, এআরএ ডি প্রজেক্ট, সিআইপিডি, রাঙ্গামাটি
৪. ধনবী চাকমা, রূপকারী, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
৫. সম্ভু লাল চাকমা, তুলাবান, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
৬. সুর রঞ্জন চাকমা, জুরাছড়ি সদর, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি

www.pathagar.com